সোনার খাঁচায় রইল না

অধীর ঘটক

অভিযাত্রী

১১৬/৪জি, মেঘনাদ সাহা সরণী

কলকাতা—৭০০০২৯

পরিবেশক :

প্রকাশক

৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

পরবাসী—অধীর ঘটক

প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৬৯

১১৬/৪জি, মেঘনাদ সাহা সরণী, কলকাতা-২৯ থেকে অভিযাত্রীর পক্ষে অরণ্য ঘটক প্রকাশ করেছেন এবং নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস ১৬ মার্কাস লেন থেকে মধুমঙ্গল পাঁজা ছেপেছেন।

প্রচ্ছদ শিল্পী—তুষার সান্যাল।

মালতীকে

॥ এক ॥

ভোর হতে আর একটু বাকি। পুবের আকাশে হয়তো খানিক বাদেই লালের ছিটে পড়বে। এখনও চর্তুদিকে ময়লা অন্ধকার। গাছপালা, মাঠঘাট চোখের সামনে অদৃশ্য না হলেও অস্পষ্ট বলা যায়।

মেল ট্রেনটা দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে এক লাইন থেকে আর এক লাইনে যাওয়ার সময় যেন এক দুর্বোধ্য ভাষায় ঘটাং ঘটাং ধ্বনি তুলছে। রাতের অন্ধকারে কখনও দু-একটা স্টেশনের আলো চকিতে দেখা দিয়ে ফের পেছনে মিলিয়ে গেল।

বগীর মধ্যে যাত্রীরা এখনও ঘুমে অচেতন। দু-একজন হয়তো বাথরুমে যাওয়ার জন্য রাত্তিরে একবার উঠেছিল। সকাল হতে ঢের দেরি বুঝতে পেরে আবার শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে।

ট্রেনের দুলুনিতে দীপ্তেন্দুর অনেক আগেই ঘুম ভেঙেছিল। আড়মোড়া দিয়ে একবার ওঠার চেষ্টা করে সে আবার হাওয়া-ভরা বালিশে মাথা রাখল। রেলগাড়িতে

উঠে অন্তত দুটো কারণে তার কিছুতেই ঘুম হয় না। এক তো গাড়ির দুলুনি। মাঝে মাঝে তা রীতিমত নাড়া দিয়ে যায়। আর দ্বিতীয়টি হল—হাওয়া দিয়ে ফোলানো বালিশে মাথা রেখে ঘুমোনোর অসুবিধে। প্রায় পিছলে আসে। আর মাথা ঠিক মতো রাখতে না পারলে ঘুমেরই বা দোষ কী? ট্রেনের কামরায় স্লিপার-কোচে শুয়ে তাকে পোষ মানানো শুধু কষ্টসাধ্য নয়, রীতিমত কঠিন।

কী একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। অন্ধকার সরিয়ে পাতলা আলো ফুটতে শুরু করেছে। কাচের জানালার ফাঁক দিয়ে দীপ্তেন্দু লক্ষ করল, বেশ বড় স্টেশন। ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে প্ল্যাটফর্মে। ওদিকে আর একটা প্যাসেঞ্জার-ট্রেন লাইনে দাঁড়িয়ে। বিছানা থেকে উঠে জানালা দিয়ে ঈষৎ মুখ বাড়িয়ে স্টেশনের নামটা পড়ার চেষ্টা করল দীপ্তেন্দু। শয্যা ছেড়ে এবার সে এগিয়ে এলো গাড়ির দরজার সামনে। বাইরে এক নজর বুলিয়েই সে আন্দাজ করল এটা জংশন স্টেশন। তার মানে গাড়ি অন্তত দশ-পনের মিনিট দাঁড়াবে। প্ল্যাটফর্মের ওপর একটা কলের মুখ দিয়ে তোড়ে জল পড়ছে। নিজের ব্যাগ থেকে টুথব্রাশ আর পেস্ট বের করে দীপ্তেন্দু মুখ ধোয়ার জন্য তৈরি হল। আসলে বগীর মধ্যে যে ট্যাপ ওয়াটার আছে সেই জলে মুখ ধুতে দীপ্তেন্দুর ইচ্ছে করে না। বরং প্ল্যাটফর্মের কলে তোড়ে জল পড়ছে দেখে সে মুখ ধুয়ে নেবে ভাবল। তাই কাঁধে একটা তোয়ালে ফেলে ব্রাশ করতে করতে কলের দিকে এগিয়ে গেল।

ব্রাশ করা শেষ হলে মুখ ধুয়ে ফেলল দীপ্তেন্দু। তারপর আঁজলা আঁজলা জল দুই চোখে ছিটিয়ে দিল। একবার দুবার এবং তিনবার। কাঁধের তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে বেশ স্বস্তি বোধ করল সে। এটা কী স্টেশন জানবার জন্য এবার সে কৌতূহলী হল। পাশ দিয়ে কুলি গোছের একটা লোককে সে জিজ্ঞেস করল, —'এটা কী স্টেশন?'

লোকটা মুখ তুলে তার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল, 'রুড়কেল্লা বটে।'

পিছন ফিরে একবার আকাশের দিকে লক্ষ করে তার মনে আর কোনো সংশয় রইল না। দূর গগনে কুণ্ডলীকৃত ব্লাস্ট ফার্নেসের ধোঁয়া রূপকথার রাজকন্যার আলুলায়িত কেশদামের মতো শূন্যে ছড়ানো।

গাড়ির ভিতর নিজের সীটের কাছে আসতেই দীপ্তেন্দু দেখল, মিডল বার্থে যে-ভদ্রলোক শুয়েছিলেন তিনিও উঠে বসেছেন। শেকল খুলে বার্থটা নামিয়ে দিতে বেশ আরাম করে বসা গেল। গতকাল রায়পুর স্টেশনে দীপ্তেন্দু ট্রেনে উঠেছে। তখন প্রায় চারটে বাজে। এই ভদ্রলোক তখনও গাড়িতে ওঠেন নি। বিলাসপুর স্টেশনে আর একজন নেমে যেতেই ইনি এসে তার সীটটায় বসলেন। পরে অবশ্য টিকিট চেকার এসে একপ্রস্থ চেকিং করে গেছে।

দীপ্তেন্দু সীটে এসে বসতেই সহযাত্রী একগাল হেসে বললেন, —'কেয়া বাবুজী? রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল?'

এমন ঝকঝকে বাংলা শুনে দীপ্তেন্দু অবাক হল। বলল,—'আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন। দেখে কিন্তু বাঙালী বলে মনে হয় না।'

'সে ঠিক। চেহারা দেখলে হয়তো বাঙ্গালী বলে মনে হবে না। কিন্তু এক হিসেবে আমাকে নিশ্চয় বাঙ্গালী বলতে পারেন।'

'কী রকম?'

'আমার তো ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে কলকাতায় জন্ম।'

'তাই নাকি? তাহলে তো আপনি জন্মসূত্রে নিশ্চয় বাঙালী।'

'শুধু আমি নই। আমার পূর্বপুরুষ মানে বাবা-কাকা এরাও কেউ কেউ কলকাতায় জন্মেছেন।'

'কলকাতায় কোথায থাকেন?'

'হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীটে। ওই বাড়িতেই আমরা তিন পুরুষ ধরে আছি।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আপনার পূর্বপুরুষ নিশ্চয় রাজস্থান থেকে এদেশে এসেছিলেন?'

'ঠিকই আন্দাজ করেছেন। শুনেছি আমার দাদু তার বাবার সঙ্গে প্রথম কলকাতায় আসেন। সে ধরুন নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি। তখন কলকাতায় ঘোড়ায়-টানা ট্রাম চলত। ভোরবেলা চাপাকলের জল দিয়ে রাস্তা ধোয়া হত। সাতসকালে টাটকা মাখন ফিরি করে যেত মাখনওয়ালা। বিকেলে সদ্য-তৈরি ছানার সন্দেশ। বাবা বলতেন, মিঠাইয়ের অমন স্বাদ তিনি আর পান নি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'পুরনো সেই কলকাতার কথা আমিও দু-একজনের কাছে শুনেছি। রাজাবাজারের কাছে যে-মজা খালটা রয়েছে ওটাতেই নাকি তখন ভোঁ বাজিয়ে স্টীমার চলত। বড় বড় নৌকো আসত দূর দূর থেকে। এক বালতি জিওল মাছ বিক্রি হত মাত্র এক আনায়। আর বরিশালের চাল মিলত বাজারে। সুন্দর চাল। ধবধবে সাদা ভাত।'

তার কথা শুনে ভদ্রলোক বললেন,—'দিনগুলো সব হারিয়ে গেল বাবুজী। কোথায় যে মিলিয়ে গেল! আমার বয়স তো প্রায় পঞ্চাশ হতে চলল। স্কুলে পড়ার সময় কংগ্রেসের আন্দোলন দেখেছি। গান্ধী মহারাজের ডাকে কত লোক পড়াশুনো এমন কি নিজের প্রফেশন ছেড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তো একদিন স্বাধীনতা এল। ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কী পেলেন বলুন তো? এত মূল্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হল; তার সুখ তো ভোগ করা গেল না।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আপনার নাম কী?'

'মহাবীর,—মহাবীরপ্রসাদ আগরওয়াল।'

দীপ্তেন্দু ভ্রু কুঁচকে কী যেন ভাবছিল। মহাবীরপ্রসাদ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'কী ভাবছেন বাবুজী? আগরওয়াল মানে জৈন কী না? আরে না-না। আমরা জৈন কেন হতে যাব? আমরা হিন্দু—।'

মহাবীরপ্রসাদ মুচকি হেসে শুধোলেন,—'আপনার শুভনাম বাবুজী?'

'আমি দীপ্তেন্দু—দীপ্তেন্দু চট্টোপাধ্যায়।'

'কলকাতায় বাড়ি?'

'না-না!' দীপ্তেন্দু মাথা নেড়ে জবাব দিল, —'আমাদের বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়। একটা গ্রামে।'

'বাঁকুড়া?' মহাবীরপ্রসাদ একটু চিন্তা করে জানালেন, —'হ্যাঁ, ওখানকার কিছু কাস্টমার আমাদের গদিতে আসে। মালপত্র খরিদ করে নিয়ে যায়।'

'কিসের ব্যবসা আপনাদের?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

'জামাকাপড়। রেডিমেড গারমেন্টসের।'

মহাবীরপ্রসাদ তার মুখের দিকে তাকালেন। বোধহয় বিশদভাবে দীপ্তেন্দুর পরিচয় জানার জন্য শুধোলেন,—'বাবুজী কী করেন? চাকরি-বাকরি?'

'না-না।' দীপ্তেন্দু নেতিবাচক জবাব দিল। বলল, —'আপাতত কিছুই করছি না। এখন মধ্যপ্রদেশ থেকে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।'

'মধ্যপ্রদেশে কোথায় এসেছিলেন বাবুজী?' মহাবীরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন।

'সে এক জায়গায় নাকি? তিন বছর ধরে নানা জায়গায় ঘুরলাম। যখন যেমন নির্দেশ এসেছে তেমন গেছি।'

মহাবীরপ্রসাদ কী যেন বুঝলেন। প্রায় মিনিটখানেক চিন্তা করে বললেন,—'মধ্যপ্রদেশে তিন বছর ধরে আছেন শুনে কৌতূহল বাড়ল বাবুজী। নইলে প্রথমে তো মনে হয়েছিল আপনি একজন টুরিস্ট। বেড়াতে ভালবাসেন বলেই মধ্যপ্রদেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু আপনার এই শেষের কথাটা শুনেই কেমন যেন খটকা লাগল।'

'শেষের কথাটা মানে?'

'ওই যে বললেন, যখন যেমন নির্দেশ এসেছে তেমন গেছি। তার মানে এই তিন বছর ধরে আপনি কারো নির্দেশ মতো মধ্যপ্রদেশের এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'হ্যাঁ। সেটা ঠিক।'

মহাবীরপ্রসাদ বললেন,—'একটা কথা শুধোব বাবুজী? আপনি কি পলিটিক্স মানে রাজনীতি করেন?'

দীপ্তেন্দু সোজা হয়ে বসল। বলল,—'এখন রাজনীতির যা মানে দাঁড়িয়েছে, আমি ঠিক সেই অর্থে রাজনীতি করি না।'

'তবে?'

'কলকাতা থেকে এখানে এসেছিলাম এক ভদ্রলোকের কথায়। তার নাম বিনোদ মিশ্র। এখানকার খনি-শ্রমিকদের মধ্যে উনি দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। কলকাতায় জেলে থাকতে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।'

মহাবীরপ্রদাদ ভুরু তুলে তাকালেন। অবাক হয়ে বললেন,—'আপনার জেল হয়েছিল বাবুজী?'

'হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু বিষণ্ণ হাসল। বলল,—'জেলখাটা আসামী শুনে আপনার নিশ্চয় খারাপ লাগছে মহাবীরপ্রসাদজী।' এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল সে। ফের বলল,—'ওটা পাকেচক্রে ঘটে গেল। নইলে, সত্যি বলতে, আমি নির্দোষ ছিলাম।'

'কী হয়েছিল বাবুজী?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'খাদ্য আন্দোলনের সময় একটা মিছিলের সঙ্গে আমি যাচ্ছিলাম। বৌবাজার ক্রশিঙ-এর কাছে উল্টোদিক থেকে একটা সরকারি বাস আসছিল। সেটা শ্যামবাজার যাবে। মিছিল তার গতিরোধ করতেই সামান্য বচসা। তারপর কারা যেন যাত্রীদের নামিয়ে পেট্রল ঢেলে বাসটায় আগুন ধরিয়ে দিল। আমি বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। ওদের বোঝাতে গেলাম, ট্রাম-বাস পুড়িয়ে আখেরে কোনো লাভ হবে না। আর ঠিক তখনই একটা পুলিশের গাড়ি এসে সেখানে দাঁড়াল। আমাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে জিপে তুলল। একজন ফটোগ্রাফার কোথা থেকে এসে পটাপট ছবি তুলছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কী? যা হয়। কোর্টে মামলা উঠল। ফটোগ্রাফারের তোলা কয়েকটা ছবি পুলিশ আদালতে দাখিল করল। দাউ দাউ করে একটা সরকারি বাসে আগুন জ্বলছে। পেট্রলের টিন হাতে এক দুষ্কৃতী দাঁড়িয়ে। আমি ঠিক তার পাশেই।'

'ম্যাজিস্ট্রেট বোধহয় আপনাকে সাজা দিলেন বাবুজী?'

'হ্যাঁ। তবে কলেজে পড়াই শুনে ম্যাজিস্ট্রেট আর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন নি। শুধু তিন মাস সিম্পল ইমপ্রিজনমেন্ট।'

'তা জেল থেকে বেরিয়েই কি মধ্যপ্রদেশে চলে এলেন?'

'হ্যাঁ। তার কারণ কলকাতায় আর এক মুহূর্তও ভালো লাগছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল দূরে কোথাও পালিয়ে যাই।'

মহাবীরপ্রসাদ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন,—'আপনার সেই কলেজের চাকরিটা কি ছেড়ে দিয়ে এলেন?'

'হ্যাঁ। চাকরিটা মফঃস্বলের কলেজে। আমার এই সাজা হবার বৃত্তান্তটা আইন-আদালতের পাতায় ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। কলেজের ছেলে, অধ্যাপক এবং অভিভাবকদেরও নিশ্চয় তা নজর এড়ায় নি। জেল খেটে বেরিয়ে আসার পর আবার ছাত্রদের সামনে গিয়ে শিক্ষকের আসনটায় বসতে ইচ্ছে করল না।'

মহাবীরপ্রসাদ বললেন,—'অল্পবয়সে আপনার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে বাবুজী। তা এখানে এসে আপনি কী কাজ আরম্ভ করলেন?'

'মধ্যপ্রদেশে এসেছিলাম এখানকার অসংগঠিত বঞ্চিত শ্রমিকদের জন্য কিছু করবার ইচ্ছে নিয়ে।'

মহাবীরপ্রসাদ বাঁকা হেসে বললেন,—'কিন্তু শেষপর্যন্ত পাততাড়ি গুটিয়ে হতাশ হয়ে ফের কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন, এই তো?'

'হ্যাঁ। সে-রকমই বলতে পারেন।'

মহাবীরপ্রসাদ হাসলেন। বললেন,—'একজন বাইরের লোক এসে এখানে রাজনীতির আসর জমিয়ে বসবে, সেটা এলাকার লোকেই বরদাস্ত করবে না। তা ছাড়া বিহার, মধ্যপ্রদেশ—দু'জায়গাতেই জাতপাতের রাজনীতি।'

দীপ্তেন্দু বলল, 'আমার কাজ ছিল আলাদা। একটু অন্য ধরনের। আমি কাজ করেছি খনির শ্রমিকদের মধ্যে। চেষ্টা করেছি ওদের শিক্ষা দিতে। ওদের কী দায়িত্ব সেটা বুঝিয়ে বলতে চেয়েছি নানা ভাবে। আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মদের নেশায় সর্বস্বান্ত হবার আগে ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে।'

'কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা পারেন নি, তাই না?'

'হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু করুণ হাসল।

'তার জন্য দুঃখ করবেন না বাবুজী। ও তো একটা অসাধ্য কাজ।'

'অসাধ্য কাজ?'

'নয়তো কী? আসলে আপনি Vested interest এর সঙ্গে একটা মোকাবিলা করতে গিয়েছিলেন বাবুজী। কিন্তু তাদের সঙ্গে পারবেন কেন?'

'Vested interest?'

'হ্যাঁ। যাকে বলে স্বার্থের মৌরসিপাট্টা। সেটা কেউ নড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলে, যার স্বার্থে ঘা লাগছে সে কি ছেড়ে কথা কইবে?'

'আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন মহাবীরপ্রসাদজী।'

'হয়তো নয়। আমি হানড্রেড পারসেন্ট রাইট বাবুজী। আর এজন্যই তো বলেছি এটা আপনার অসাধ্য কাজ। একবার ভেবে দেখেছেন এইসব অশিক্ষিত গরিব শ্রমিকেরা যদি মদের নেশা ত্যাগ করে তাহলে মধ্যপ্রদেশের লিকার ব্যারনদের কী অবস্থা হবে? মদ আর বিক্রি হবে না। ব্যবসা লাটে উঠবে। বলুন বাবুজী, সেটা কি মেনে নেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব?'

দীপ্তেন্দু চুপ করে রইল। কোনো জবাব দিল না।

মহাবীরপ্রসাদ আবার বললেন,—'কলকাতায় ফিরে গিয়ে এক হিসেবে আপনি বোধহয় ভালোই করলেন।'

'এ-কথা কেন বলছেন?' দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে তাকাল।

মহাবীরপ্রসাদ বললেন,—'মাসখানেক আগে যেন কাগজে দেখলাম, জব্বলপুরের কোন্ এক বস্তিতে বোধহয় আপনাদের দলেরই এক নেতা অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর গুলিতে খুন হয়েছেন।'

দীপ্তেন্দু মুখ নামিয়ে জানাল,—'হ্যাঁ, ওঁর নাম শিবপ্রসাদ দত্ত। উনি অনেকদিন ধরেই মধ্যপ্রদেশে ছিলেন। এখানকার অসংগঠিত খনি-শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন

করেছেন। ওদের দাবিদাওয়া পেশ করেছেন authority-র কাছে। এবং ওঁর এই প্রচেষ্টার ফলে খনি-শ্রমিকদের অবস্থাও ফিরতে শুরু করেছিল। তারপর এই মদের নেশার বিরুদ্ধে উনি নতুন আন্দোলন শুরু করলেন। খনি শ্রমিকরাও ওর কথা শুনত। ওকে মান্য করত। ফলে মধ্যপ্রদেশে মদ বিক্রি কমতে শুরু করল।'

দীপ্তেন্দুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মহাবীরপ্রসাদ বললেন,—'আর সেজন্যই বোধহয় শিবপ্রসাদবাবুকে রিভলবারের গুলিতে প্রাণ হারাতে হ'ল। কারণ এখানকার লিকার ব্যারনরা বুঝতে পেরেছিল এই লোকটা খনি শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিলে তাদের ব্যবসায় লালবাতি জ্বলতে বেশি দেরি হবে না।'

দীপ্তেন্দু কোনো মন্তব্য করবার আগেই মহাবীরপ্রসাদ আবার বললেন,—'তবে শুধু মদ বিক্রি হ্রাস পাওয়ার জন্যই যে শিবপ্রসাদবাবুকে প্রাণ দিতে হ'ল, তাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আসলে এর মধ্যে রাজনীতিও ঢুকেছে বাবুজী। খনি শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করতে নেমে শিবপ্রসাদবাবুর জনপ্রিয়তা যে তুঙ্গে উঠেছিল তা এখানকার অন্য রাজনৈতিক দলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বুঝতে দেরি হয়নি। ফলে মদ নিয়ে আন্দোলন দানা বাঁধতেই তারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিলম্ব করল না। এমনও অসম্ভব নয় যে ওই লিকার ব্যারনদের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের কিছু জঙ্গি নেতার একটা অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছিল।'

দীপ্তেন্দু এসব চিন্তা করছিল।

মহাবীরপ্রসাদ বললেন,—'মনে হয় আপনাকে ওরা কৌশলে মধ্যপ্রদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে।'

'খানিকটা হয়তো তাই। আসলে রাজনীতির মধ্যেও একটা প্রাদেশিকতার গন্ধ বয়ে গেছে। শিবপ্রসাদবাবু থাকতে আমি যে আন্দোলন শুরু করেছিলাম তাঁর অবর্তমানে অনেকেই সেটা ভালো চোখে দেখে নি। দু-একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে গোপনে জানাল, আমার পক্ষে এখন মধ্যপ্রদেশ ছেড়ে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নইলে, বলা যায় না, আমার কপালেও হয়তো শিবপ্রসাদবাবুর মতো দুর্ভাগ্য নেমে আসতে পারে।'

মহাবীরপ্রসাদ মৃদু হাসছিলেন। কয়েক মুহূর্তে পরে বললেন,—'আপনার এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ভালো বাবুজী। এই বিদেশ বিভুঁয়ে আপনি একা দলের মতের বিরুদ্ধে কী নিয়ে লড়বেন ওদের সঙ্গে? আপনি হয় তো জানেন না এখানকার লিকার-ব্যারনরা কত Powerful। ভোপাল তো তুচ্ছ, দিল্লীর তখত্ পর্যন্ত তাদের অনায়াস গতিবিধি। তারপর অন্য সব রাজনৈতিক দল তো রয়েছে। প্রতিযোগিতায় আপনি এগিয়ে গেলে অন্য রাজনৈতিক দলের ট্রেড ইউনিয়ন কি তা বরদাস্ত করবে বাবুজী?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কলকাতায় যখন ফিরেই যাচ্ছি তখন এখনকার কথা ভেবে আর কী লাভ?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবুজী?'

'কী কথা? জিজ্ঞেস করুন না! এতে সঙ্কোচের কী আছে?'

মহাবীরপ্রসাদ বললেন,—'এটা অবশ্যই আমার অনুমান বাবুজী। তবে ভুল হয়ে থাকলে নিশ্চয় শুধরে দেবেন। ক্ষমা করবেন।'

'কিন্তু প্রশ্নটা কী, তাই তো এখনও জানলাম না।'

মহাবীরপ্রসাদ একটু ইতস্তত করে বললেন,—'শুধু তিনমাস জেল হয়েছিল বলেই কি আপনি কলকাতা ছেড়ে এতদূরে খনি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবার জন্য চলে এসেছিলেন?'

দীপ্তেন্দু কোনো জবাব দিল না। তার মনে হল মহাবীরপ্রসাদ বোধহয় কোন এক জাদুমন্ত্রে তার ফেলে আসা অতীতটাকে দেখতে পেয়েছে। দ্রুতগতি ধাবমান ট্রেনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দীপ্তেন্দুর মনটা যেন পিছনে বকের মতো আলতো পা ফেলে আর-এক জগতের নরম মাটিতে গিয়ে দাঁড়াল। সেই কলকাতা। তিন-চার বছর আগের দিনগুলো। আরপুলি লেনের বাড়িটায় দীপ্তেন্দু যেদিন প্রথম গিয়েছিল সেদিন মাধুরী কাকীমাকে এক নজর দেখেই রীতিমত মুগ্ধ হয়েছিল সে। কী ফর্সা রঙ! বয়স বড় জোর তিরিশ হবে। চোখ দুটি ডাগর কিংবা আয়ত নয়, তবু সুন্দর। মুখের চেহারায় শান্ত গৃহিণীর ছাপ নেই। বরং কী যেন একটা আকর্ষক শক্তি আছে। শরীরটা স্থূল অথবা রোগা কোনোটাই নয়। বরং মাঝারি বলা চলে,—যেমনটি হলে মেয়েদের মানায়, ঠিক তাই।

তারপর অবশ্য মাধুরী কাকীমাই একদিন বলেছিল,—'জানো দীপ্তেন্দু, আমার কী ইচ্ছে করে?'

'কী?' সে শুধোল।

মাধুরী কাকীমা বলেছিল,—'আমাকে কাকীমা না বলে বৌদি বলে ডাকতে পার না?'

তারপর থেকে দীপ্তেন্দু অবশ্য বৌদি বলেই ডেকেছে তাকে। মধ্যপ্রদেশে থাকতে এক-একসময় তার মনে হত মাধুরীবৌদি বেঁচে থাকলে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে তাকে কি আসতে দিত? রাজনীতির স্রোতে গা ডুবিয়ে নিজের জীবনটাকেই যে দীপ্তেন্দু নষ্ট করতে বসেছে, এ-কথা জানলে মাধুরীবৌদি তাকে এমন কড়া শাসন করত যে দীপ্তেন্দু মধ্যপ্রদেশের মাটিতে এসে দাঁড়াতে সাহসই পেত না। কিন্তু মাধুরীবৌদি তো এখন আর বেঁচে নেই। হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার ঘটল—দীপ্তেন্দুই তাকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিল। অগ্নিবীণা এবং তার ক্রীশ্চান কলেজের সহপাঠিনী কণা দত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করল। তারপর কল পাঠাতেই রেসিডেন্ট সার্জেন এসে রোগিণীকে পরীক্ষা করে সেই কথা বললেন,—টিউবাল প্রেগন্যান্সী। এখনই অপারেশন করা ছাড়া উপায় নেই।

শেষ পর্যন্ত মাধুরীবৌদি আর বাঁচে নি। কণা দত্ত বলেছিল, সম্ভবত টিউব rupture

করেছে। তাই প্রচণ্ড শকে মৃত্যু ঘটতে দেরি হয়নি।

মাধুরীবৌদির মৃত্যুর পর কলকাতাটা কেমন যেন ফাঁকা লাগল তার কাছে। তখনও অগ্নিবীণার সঙ্গে তার সম্পর্কের ছেদ ঘটেনি। মাধুরীবৌদির শূন্যতাটুকু অগ্নিবীণা অনেকখানি পূর্ণ করে রেখেছিল। এম. এ. তে ভালো রেজাল্ট করতে পারলে হয়তো অগ্নিবীণার সঙ্গেই তার বিয়ে হ'ত। কিন্তু শুকনো কাগজে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি পড়ার মতো তার তিন মাসের জেল হবার খবরটা ডাফ স্ট্রীটের এক তলার ভাড়াটে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটুকু সম্পূর্ণ ছাই করে দিল।

জেল থেকে বেরিয়েই সে ব্রজবিলাস সরকারকে দেখতে পেয়েছিল। পরনে সাদা ধুতি, খদ্দরের শুভ্র পাঞ্জাবি। একদা-বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, ইংরেজের জেলের অতিথি ব্রজবিলাস সরকার দাঁড়িয়ে।

দু-চার কথার পরই ব্রজবিলাস তাকে আসল কথাটা জানিয়ে দিলেন। বৌমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তার সঙ্গে মহারানীর বিয়ে দিতে তিনি পারতেন না। দীপ্তেন্দু তবু বলল,—অগ্নিবীণা যে তাকে বলেছিল, এ-বিয়েতে দাদু কখনও অমত করবেন না। ব্রজবিলাস পরিষ্কার বললেন, দীপ্তেন্দুর জেল হবার খবর আসতেই বাড়িতে একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটল। বৌমা প্রায় অন্নজল ত্যাগ করলেন। তাই অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মহারাণীকে তিনি মা-বাবার পছন্দ-করা পাত্রের সঙ্গে বিয়েতে রাজী করিয়েছেন।

এরপর আর কলকাতায় থাকার কোনো আকর্ষণই ছিল না দীপ্তেন্দুর। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরদিনই শিপ্রা এক্সপ্রেসে উঠে বসেছিল সে। দুপুর বারোটা নাগাদ গাড়ি সাতনায় পৌছল। সেখানকারই একটা ঠিকানা তাকে দিয়েছিলেন বিনোদ মিশ্র। বাসে গিয়ে সন্ধ্যের মুখে দীপ্তেন্দু গিয়ে নামল এক খনি-এলাকায়। সেখানেই পরিচয় হল শিবপ্রসাদ দত্তের সঙ্গে। প্রায় ছ-সাত বছর ধরে মধ্যপ্রদেশের মাটিতে অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে এক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করে আছেন।

পরিচয় হবার পরই শিবপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কলকাতা ছেড়ে এসে এই সব কুলি-মজুরদের মধ্যে কাজ করতে মন বসবে তো আপনার?'

সোজাসুজি এমন একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি দীপ্তেন্দু। অনেকক্ষণ পরে শুধু বলল,—'এই মুহূর্তে এ-কথার জবাব দেওয়া বেশ কঠিন। দু-এক মাস যাক। তারপর না হয়—।'

শিবপ্রসাদ হেসে বলেছিলেন,—'এসব কাজে সাধারণত দু-ধরনের মানুষ আসে। এক নম্বর, যারা আদর্শের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারে।'

দীপ্তেন্দু তার মুখের দিতে তাকিয়ে বাকিটুকু শোনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছে বুঝতে পেরে শিবপ্রসাদ ফের বললেন,—'দু-নম্বরে কারা, জানেন?'

'কারা?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

শিবপ্রসাদ হেসে বললেন,—'যে কোনো কারণেই হোক যারা অভিমান করে বাড়ি থেকে চলে আসে। তা সে মনে গভীর দুঃখ পেলেও হতে পারে। কিংবা হঠাৎ যদি কোনো আশ্রয় হারিয়ে বসে, তাহলেও সেটা সম্ভব।'

দীপ্তেন্দু কোনো মন্তব্য করল না দেখে শিবপ্রসাদ আবার বললেন,—'মুস্কিল হয় এই মানুষগুলোকে নিয়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা এই নতুন জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। যত দিন যায়, ওল্ড নস্টালজিয়াটা এদের বুকের ওপর পাথরের মতো চেপে বসতে থাকে। ফলে, এক সময় ফেরার আহ্বানটাকে এরা আর উপেক্ষা করতে পারে না। তারপর একদিন এই জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ওরা আবার পুরনো পরিবেশে ফিরে যায়।'

মধ্যপ্রদেশে থাকতে মাধুরীবৌদি আর অগ্নিবীণা কাউকেই ভুলতে পারেনি সে। শিবপ্রসাদ দত্ত বোধহয় তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, সে এই দু-নম্বর শ্রেণীতে পড়ে। একটা বড়-সড় ধাক্কা খেয়ে দীপ্তেন্দু এই নতুন জীবনে ছিটকিয়ে পড়েছে। অনেক রাত্তিরে কুলি ধাওড়ার একটা অপরিসর ঘরে সাধারণ একটা বিছানায় শুয়ে সে মাধুরীবৌদির কথা চিন্তা করত। আচ্ছা, মাধুরীবৌদির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ছিল? প্রচলিত অর্থে প্রেম কিংবা ভালবাসা বলতে যা বোঝায় নিশ্চয় তা নয়। তবু মাধুরীবৌদিকে কেন যে তার এত ভালো লাগত তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি। সত্যি বলতে, মাধুরীবৌদির কাছে প্রায় কিছুই সে গোপন রাখেনি। অগ্নিবীণার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা, তার বাড়ির অবস্থা, এখনকার জীবনযাত্রা—সবিস্তারে সব বলেছিল। সেই হিসেবে মাধুরীবৌদি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এমন একজন যার সঙ্গে ছিল এক দেহাতীত প্রেম। যার সান্নিধ্যে এলে মনটা ভরে উঠত এক অনাবিল আনন্দে। মাধুরীবৌদি মারা যাবার পর দীপ্তেন্দু তাই লুকিয়ে একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে হাউহাউ করে কেঁদেছিল। সেই বুক ঠেলে বেরিয়ে-আসা চোখের জলের কথা জীবনে সে কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

আর অগ্নিবীণা? জেল থেকে বেরিয়ে ব্রজবিলাস সরকারের সঙ্গে দেখা হবার পর সমস্ত কিছু শুনে সে গুম্ হয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত ব্রজবিলাস সরকারই নাকি অগ্নিবীণাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, মা-বাবার পছন্দ-করা পাত্রকেই বিয়ে করতে রাজী করিয়েছিলেন। আশ্চর্য! তাহলে অগ্নিবীণার নিজস্ব মত বলতে কি কিছুই নেই? একটা ডাক্তারি পাশ করা মেয়ে। দীপ্তেন্দুর সঙ্গে তার দীর্ঘ কয়েক বছরের বন্ধুত্ব আর ভালবাসার সম্পর্ককে বেমালুম উপেক্ষা করে দিব্যি আর একজনের গলায় মালা পরিয়ে দিতে রাজী হয়ে গেল? কোনোদিন দেখা হলে অগ্নিবীণাকে এই কথাটাই জিজ্ঞেস করবে সে? কিংবা দেখা হওয়া মাত্র ঘৃণায় মুখ কুঁচকে তাকে চেনার কোনো সুযোগ না দিয়ে দীপ্তেন্দুই অন্য দিকে চলে যাবে? তবে, অগ্নিবীণার সঙ্গে তার কি আর কোনোদিন দেখা হবে? ইচ্ছে করলে সে অবশ্য একদিন ব্রজবিলাস সরকারের সঙ্গে দেখা করার অছিলায় ডাফ্ স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হতে পারে। কিন্তু

অগ্নিবীণা? তার তো কবে বিয়ে হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় বহাল তবিয়েতে স্বামীর ঘর-সংসার করছে। দীপ্তেন্দুর কথা হয়তো বা তার দিনান্তে একবারও মনে পড়ে না।

মহাবীরপ্রসাদ তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝল সেই জানে। হঠাৎ কেমন অদ্ভুত হেসে বলল,—'যাক বাবুজী ওসব কথা। বরং এবার একটু নাস্তা করে নিন।'

'নাস্তা?' দীপ্তেন্দু অবাক হয়ে শুধোল।

'বাইরে তাকিয়ে দেখুন, গাড়ি জামসেদপুর স্টেশনে ঢুকছে। ইচ্ছে করলে এখানে চা-বিস্কুট, টোস্ট-ওমলেট খেতে পারেন। আর চার-পাঁচ ঘন্টার মধ্যে ট্রেন নিশ্চয় কলকাতায় পৌঁছবে।'

দীপ্তেন্দু উঠে দাঁড়াল। আড়ামোড়া ভেঙে একবার শরীরটাকে চাঙা করে নিল। এতক্ষণ আনাই-ধানাই কত কিছু ভাবছিল সে। ভাগ্যিস দুর্বলতার বশে তার মনের দুঃখের কথা মহাবীরপ্রসাদকে বলে বসে নি। আর জীবনের এসব ঘটনা কেনই বা সে মহাবীরপ্রসাদকে জানাতে যাবে? ট্রেনের আলাপ বই তো নয়। প্ল্যাটফর্মে নামলেই যার যেদিকে গন্তব্য সেদিকেই রওনা হবে।

গাড়ি জামসেদপুর স্টেশনে দাঁড়াতেই ডেলি-প্যাসেঞ্জার গোছের অন্তত দশজন যাত্রী হৈ-হৈ করে রিজার্ভড্ কম্পার্টমেন্টে উঠে বসল। কপাল ভালো। ওরা কম্পার্টমেন্টের পিছন দিকে দীপ্তেন্দুর সীটের ধারে কাছেও ঘেঁষল না। তারপরই নীল-কুর্তা-পরা রেলের ওয়েটার-গোছের এক ছোকরা ট্রেতে সাজিয়ে টোস্ট-ওমলেট আরো সব খাবার নিয়ে কামরায় ঢুকল।

মহাবীরপ্রসাদ তাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন।

বললেন,—'বাবুজীকে একঠো নন-ভেজ প্যাকেট দেও। টোস্ট-ওমলেট ঔর যো ভি হ্যায়।'

ছোকরা দীপ্তেন্দুর দিকে খাবার এগিয়ে দিয়ে সবিনয়ে মহাবীরপ্রসাদকে শুধোল,—'আপকো কেয়া দেঙ্গে?'

'মুঝে? দেও একঠো ভেজ প্যাকেট। আউর চায়ে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'টোস্ট-ওমলেট তো খাচ্ছি। কিন্তু আপনি যেন আবার এর দাম দিয়ে বসবেন না।'

মহাবীরপ্রসাদ হাসতে লাগলেন। বললেন,—'সে পিছে হোবে। এখন পেটপূজা তো সেরে নিন।' তারপর মুখ তুলে সেই ওয়েটার ছোকরাকে ডেকে বললেন,—'যাও, চায়ে লে আও।'

জামসেদপুর ছাড়তেই গাড়ি ঝড়ের বেগে ছুটতে শুরু করল। এত প্রচণ্ড গতি যে দীপ্তেন্দু স্টেশনের নামও পড়তে পারছিল না। অনেক কসরত করে সে একটা নাম পড়ল,—চাকুলিয়া। তার কিছুক্ষণ বাদেই গাড়ি ব্রেক কষতে কষতে এসে দাঁড়াল খড়গপুর স্টেশনে।

মহাবীরপ্রসাদ বললেন,—'নিন, এখন পশ্চিম বাংলায় এসে গিয়েছেন।'

তা, জায়গাটা যে পশ্চিম বাংলা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমান কত যে যাত্রী! সম্ভবত লোক্যাল ট্রেনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যপ্রদেশ থেকে এতটা পথ আসার সময় কোথাও জনসংখ্যার এমন বিস্ফোরণ তার চোখে পড়ে নি। এমন ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ভারতের আর কোথাও কি রয়েছে? খড়গপুর থেকে হাওড়া—স্টেশন আর প্ল্যাটফর্মের সেই একই চেহারা।

মহাবীরপ্রসাদ ঠিকই বলেছিলেন। সাড়ে চার ঘন্টার আগেই গাড়ি সর্পিল গতিতে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকল।

গাড়ি থেকে নামার জন্য দীপ্তেন্দু আগেই সুটকেস গুছিয়ে তৈরি হয়েছিল। মহাবীরপ্রসাদ তার দিকে তাকিয়ে শুধোলেন,—'কলকাতায় কোথায় উঠবেন বাবুজী? কিছু ঠিক করেছেন?'

দীপ্তেন্দু চিন্তা না করেই জবাব দিল,—'পাথুরিয়াঘাটার একটা মেসে আমি বেশ কয়েক বছর ছিলাম। আপাতত সেখানেই উঠব ভেবেছি। দু-চারদিন পরে কোথাও একটা জায়গা দেখে নিলেই হবে।'

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মহাবীরপ্রসাদ বললেন,—'একদিন বেড়াতে বেড়াতে আমাদের হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীটের গদিতে চলে আসুন বাবুজী। উনিশ নম্বর কথাটা মনে রাখবেন। তিনতলায় গদি,—ফার্মের নাম মডার্ন গারমেন্টস্। বেলা বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত গদিতেই থাকি।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'বেশ তো। যাব একদিন। নিশ্চয় যাব।'

মহাবীরপ্রসাদ একগাল হেসে বললেন—'হাঁ-হাঁ। জরুর আসবেন। আসলে ব্যাপারটা কী হল জানেন?'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'কী?'

মহাবীরপ্রসাদ বললেন,—'আপনাকে দেখে আমার ভালো লেগেছে বাবুজী। মনে হচ্ছে আপনি খুব upright. ঔর জিদ্দি ভি। ঈশ্বর আপনাকে বড়ো করুন বাবুজী।'

সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে দীপ্তেন্দু হাঁটতে হাঁটতেই প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলো। জেটি থেকে লঞ্চ ধরলে বাগবাজারের ঘাটে গিয়ে পৌছান যায়। সেখান থেকে পাথুরিয়াঘাটার মেসবাড়িটা খুব দূরে নয়। দুপুরবেলা সে মেসে ঢুকতেই রান্নার ঠাকুর তাকে চিনতে পারল।

মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল করে বলল,—'দীপ্তেন্দুবাবু না? এখন কোথা থেকে আসছেন গো?'

সুটকেসটা একপাশে নামিয়ে রেখে দীপ্তেন্দু জবাব দিল,—'মধ্যপ্রদেশ।'

'ওমা। সে তো অনেক দূর। তা এখন বুঝি সেখানেই আছেন? চাকরি করছেন তো?'

ইচ্ছে করেই দীপ্তেন্দু এর বিস্তারিত জবাব দিল না। ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে

নরম গলায় শুধোল,—'মেসে খালি সীট আছে নাকি ঠাকুর?'

'বোধহয় আছে একটা।' ঠাকুর মাথা চুলকোল।

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'বোধহয মানে? সীটটা কি কাউকে দেওয়া হয়েছে?'

'জানি না। সন্ধ্যেবেলা রতনবাবু ফিরলে আপনি একবার কথা বলুন না। এখন তো উনিই মেসের সেক্রেটারি।'

'তাহলে সুটকেসটা এখন ওই ঘরেই রাখি। চান-টান সেরে আমি একবার বিকেলের দিকে বেরুব ভাবছি।'

'এখানে খাবেন না বাবু?' ঠাকুর তার মুখের দিকে তাকাল।

'মিল থাকলে কেন খাব না?' দীপ্তেন্দু হাসল। বলল,—'আমার তো খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছে। কিন্তু তোমার এখানে বাড়তি মিল কি হবে ঠাকুর?'

'হযে যাবে একরকম।' ঠাকুর তাকে আশ্বাস দিল। বলল,—'বেলা আটটার পর সত্যবাবু হঠাৎ না খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় আমাকে ডেকে বললেন,—'আজ দুপুরে আর খেতে আসতে পারব না ঠাকুর। ও মিল তুমি বাড়ি নিয়ে যেও।'

'তাহলে সেই মিল খাওয়া কি আমার উচিত হবে ঠাকুর? আমি বরং কোনো হোটেলে গিয়ে না হয়—'

'কী যে বলেন বাবু! ও মিল আমি কখনও বাড়ি নিয়ে যেতে পারি? আপনি পুরনো বোর্ডার। হঠাৎ এসে পড়েছেন।' তারপর মুখে গামছা চাপা দিয়ে সে বলল,—'বরং হোটেলে খেলে আপনার যা খরচ হত সেটাই আমাকে দেবেন।'

স্নান-আহারের পর কখন যে দুই চোখ জড়িয়ে এলো দীপ্তেন্দু টের পায়নি। যখন ঘুম ভাঙল তখন চারটে বাজে। চৌবাচ্চা থেকে এক বালতি জল নিয়ে ভালো করে মুখ হাত ধুয়ে ফেলল দীপ্তেন্দু। তারপর একটা কাচা ধুতি আর জামা পরে মেস বাড়ি থেকে বেরুল। কোথায় যাবে তাই সে ভাবছিল। আগে হলে সে কোনো চিন্তা না করেই আরপুলি লেনে মাধুরীবৌদির বাড়িতে কিংবা ডাফ স্ট্রীটে অগ্নিবীণার কাছে গিয়ে হাজির হ'ত। কিন্তু কলকাতা তার কাছে এখন এক অপরিচিত জনপদ। এই মহানগরীতে বেশ চেনা জানা আছে এমন কারো কথাই তার মনে পড়ল না। তারপর হঠাৎ ভাবল, সন্দীপের সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়? তার মেসের ঠিকানাটা সে জানে। কিন্তু এই অবেলায় সন্দীপ কি মেসে আছে? বরং কাল সকালে একবার বেরিয়ে ওর কাছে গেলেই হবে।

হাঁটতে হাঁটতে সে কলেজ স্ট্রীটে গোলদীঘির ভিতরে এসে ঢুকল। তার চোখের সামনে কলকাতা ইউনির্ভাসিটির বিশাল বিল্ডিংস ভেসে উঠল। এম, এ. ক্লাস করার সময় এই বিল্ডিঙটায় সে যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। সন্দীপ আর অংশুলার পাল্লায় পড়ে ছাত্র-রাজনীতিতে নেমে বক্তৃতা দিয়েছে। তখন সবাই তাকে ব্রিলিয়্যান্ট স্টুডেন্ট বলে জানত। তারপর কী যে হ'ল! পরীক্ষা দিয়েই সে অবশ্য বুঝতে পেরেছিল রেজাল্ট ভালো হবে না। কিন্তু তাই বলে সেকেণ্ড ক্লাসে এত নীচের

দিকে নাম? পরীক্ষার ফল যে এমন খারাপ হবে দীপ্তেন্দু কোনোদিন ভাবে নি।

গোলদীঘি থেকে বেরিয়ে সে কফিহাউসের সিঁড়ির মুখে চলে এলো। একবার ভাবল দোতলায় গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসবে নাকি? কতদিন তো কফি খায় নি।

মধ্যপ্রদেশে থাকতে মাটির ভাঁড়ে চা ছাড়া আর কিছুই জোটে নি। কিন্তু এখানে কফিহাউসের হলঘরে একা বসে থাকতে কি তার ভালো লাগবে?

এমন সময় আরো তিন-চারজন ছেলের সঙ্গে সন্দীপ সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। তাকে দেখেই রীতিমত আশ্চর্য হয়ে বলল,—'আরে দীপ্তেন্দুবাবু না? কলকাতায় কবে এলেন?'

'এই তো আজই, সকালের ট্রেনে।'

'এখানে উঠেছেন কোথায়?' সন্দীপ পরমাত্মীয়ের মতো তার খোঁজখবর নিতে শুরু করল।

'পাথুরিয়াঘাটার মেসে। যেখানে আগে থাকতাম।'

সন্দীপ তার হাত ধরে বলল,—'বুঝতে পেরেছি। চলুন আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

তারপর সঙ্গীদের ইঙ্গিত করে সে বলল—'এই, তোমরা যাও এখন। দীপ্তেন্দুবাবুর সঙ্গে প্রায় তিন বছর বাদে দেখা। ওর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করি।'

তাকে টানতে টানতে সন্দীপ কফিহাউসের হলঘরে নিয়ে এল। চেয়ারে মুখোমুখি বসে বলল,—'আপনি মধ্যপ্রদেশে আছেন সে খবর আমি পেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ। জেল থেকে বেরিয়ে আর কিছু ভালো লাগছিল না। তাই কলকাতা থেকে দূরে কোথাও।' ম্লান হেসে দীপ্তেন্দু আবার বলল,—'মানে পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অন্য কোনোখানে—'

'তারপর ওখানেও আর ভালো লাগল না, এই তো? আমি জানি আপনি বিনোদ মিশ্রের পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ওখানকার খনি-শ্রমিকদের নিয়ে একটা অর্গানাইজেশন তৈরি করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।'

'হ্যাঁ প্রায় তিন বছর ধরে তো তাই করলাম।'

সন্দীপ মুচকি হেসে বলল,—'দীপ্তেন্দুবাবু, আপনি রাজনীতির লোক নন। আপনাকে স্টুডেন্ট পলিটিক্সে টেনে আনাই আমার ভুল হয়েছিল। আর সেজন্যই বোধহয় আপনার জীবনটা এমন ছন্নছাড়া হয়ে গেল। আমি নিজেকেই সেজন্য অপরাধী মনে করি।'

'না-না। আপনার অপরাধ কিসের? এর জন্য অ্যাপলজি চাইতে হবে না।'

বয়কে ডেকে বলতেই সে দু-কাপ কফি এনে টেবিলে রাখল।

সন্দীপ শুধোল,—'এখন কী করবেন, কিছু ভেবেছেন?'

'কী আবার করব? কলকাতায় থাকতে হলে একটা চাকরি চাই। দেখি চেষ্টা

করে—।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে সন্দীপ জিজ্ঞাসা করল,

—'কী চাকরি? অধ্যাপনা, মানে কলেজের লেকচারার।'

'না-না। কলেজে আমার আর চাকরি হবে না। তিন বছরের গ্যাপটাই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। নতুন সিলেবাস, পাঠ্যবই—এ-সবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতদিন আগেই চুকে গেছে।'

সন্দীপ কফির কাপটা নামিয়ে বলল,—'একটা অন্য চাকরির খোঁজ অবশ্য আছে। আপনি নিতে চাইলে আমি যোগাযোগ করতে পারি।'

'কী চাকরি?'

'জার্নালিস্ট। মানে সাংবাদিক—'

'ধুর! ও চাকরি কেন হবে আমার? আমি সাংবাদিকতার কী জানি?'

'জানবার দরকার নেই। ওরা আপনাকে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে নেবে। মাসখানেক ছুটোছুটি করলেই আপনি কাজে দিব্যি রপ্ত হয়ে যাবেন।'

'কোন্ কাগজের সাংবাদিক?'

'কাগজটা অবশ্য নতুন। মানে গতমাস থেকেই বেরুতে শুরু করেছে।'

'কী নাম?'

'বঙ্গভূমি।' সন্দীপ হেসে বলল,—'বুঝতে পারছেন না? নির্বাচন এগিয়ে আসছে। এসব ভুঁইফোড় কাগজ ইলেকশনের আগে অমন বেরোয়। তারপর টিকে থাকলে ভালো। নইলে উঠে যাবে।'

'কাগজটা কোন্ পার্টির? মানে, এর পেছনে কোনো দল রয়েছে?'

সন্দীপ মাথা নাড়ল। বলল,—'না-না। এটা কোনো পার্টি-পেপার নয়। এক ভদ্রলোক এর জন্য ফাইনান্স করছেন। তার কী সব ব্যবসা-ট্যাবসা আছে। ওর কাগজের নীতি অবশ্য বামঘেঁষা, মানে বামপন্থীদের সমর্থন করা হয় ওঁর পেপারে।'

'তাই নাকি?' দীপ্তেন্দু মৃদু হাসল।

সন্দীপ বলল,—'এসব লোক গভীর জলের মাছ। কী উদ্দেশ্যে কাগজটার পিছনে যে টাকা ঢালছে আপনি সেটা বুঝতেও পারবেন না। এমনও অসম্ভব নয়, উনি হয়তো পরে নির্দল প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভায় যেতে চান। তার জন্য এই কাগজটাকে মই বা ladder হিসেবে ব্যবহার করবেন।'

তার কাঁধের ব্যাগ থেকে সন্দীপ একটা কাগজ বের করে দীপ্তেন্দুকে দেখাল। বলল,—'আজকের পেপার। একবার চোখ বুলিয়ে নিন। তারপর ইচ্ছে থাকলে বলুন, এখানে সাংবাদিক হিসেবে আপনাকে ঢোকাবার চেষ্টা করি।'

দীপ্তেন্দু উল্টোপাল্টে কাগজটা দেখল। রাজনীতির নানা খবর তো আছেই। কলকাতা এবং সুদূর মফঃস্বলও তাতে বাদ পড়ে নি। এক জায়গায় বিহারে নেহেরুজীর এক জনসভাকে কটাক্ষ করে একটা ব্যঙ্গকবিতাও বেরিয়েছে। দীপ্তেন্দু

কৌতূহল সহকারে কবিতাটা আগাগোড়া পড়ল।

এ যজ্ঞ কি মোদের যজ্ঞ?
যজ্ঞ বক্তৃতার।
যাগ-যজ্ঞ যাঁর জন্য
বিহার সেই নেহেরুধন্য,
ভারত রাষ্ট্রের বহু পুণ্য
এসেছেন হেথায়।
বিহারেতে যজ্ঞ পণ্ড
সকল কার্য লণ্ডভণ্ড
সভার স্থান আকীর্ণ যে
ত্যক্ত পাদুকায়।

॥ দুই ॥

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে সন্দীপ বলল,—'দেখুন, যদি রাজী থাকেন তাহলে কালই আপনাকে এডিটরের কাছে নিয়ে যেতে পারি?'

'কালই?'

'হ্যাঁ। শুভস্য শীঘ্রম্। এডিটরের যদি আপনাকে পছন্দ হয়, তাহলে চাকরিটা পেতে অসুবিধে হবে না। আর তেমন হ'লে সামনের সোমবার থেকেই কাজে যোগ দিতে পারবেন।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আপনি কী বলেন?'

'আমার তো মনে হয়, এই ব্যাপারে আদৌ বিলম্ব করা ঠিক হবে না। বোঝেন তো, চাকরির বাজার কী রকম। আর ইতিমধ্যে যদি এডিটর কাউকে কথা দিয়ে ফেলেন, তাহলে আপনার কেস ভেস্তে যাবে।'

দীপ্তেন্দুকে নীরব দেখে সন্দীপ আবার বলল,—'আপনি তো এখন বেকার মানুষ। মধ্যপ্রদেশে তিন বছর ছিলেন। এই ক'বছরে কলকাতার হালচালই বদলে গেছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলোতে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা উথলে-ওঠা দুধের মতো উপচে পড়ছে। আর কলকাতায় পা দিয়েই আপনি একটা চাকরির অফার পেলেন, এমন ভাগ্য ক'জনের হয়?'

চিন্তা না করেই দীপ্তেন্দু এবার বলল,—'ঠিক আছে। আমি রাজী। আপনি কালই ইন্টারভ্যুর ব্যবস্থা করুন।'

সন্দীপ হেসে বললেন—'That's like a good boy. তাহলে কাল আপনি চলে আসুন।'

'আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?' দীপ্তেন্দু শুধোল। ফের জিজ্ঞেস করল,—'বঙ্গভূমি কাগজের অফিসটা কোথায়?'

সন্দীপ তার শেষ প্রশ্নটার আগে জবাব দিল। বলল,—'কাগজের অফিসটা কাছেই। মীর্জাপুর স্ট্রীটে। তবে আপনি কাল তিনটে নাগাদ এখানে চলে আসুন। কফি হাউসের গেটে এসে দাঁড়াবেন। এখান থেকেই আপনাকে নিয়ে যাব। আমি বরং আজই এডিটরের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখছি।'

দীপ্তেন্দু একটু অবাক হয়ে বলল,—'তিনটের সময় নিয়ে যাবেন বলছেন?'

সন্দীপ হেসে জবাব দিল,—'এর আগে গিয়ে কোনো লাভ নেই। তিনটে নাগাদ সম্পাদক মশায় হয়তো অফিসে আসবেন।'

'এত বেলায়?'

'বেলা-অবেলা বাছলে কি কাগজের অফিসে চলে? তাছাড়া আসল কাজটা তো সেই রাত্তিরে। বেলা তিনটেয় এলেও যেতে তেমনি রাত্তির নটা-দশটা হয়। কখনও বারোটা কিংবা দুটো বেজে যায়।'

কফিহাউস থেকে বেরিয়ে সন্দীপ বলল,—'আমি আসি। মৌলালীর কাছে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাহলে ওই কথা রইল। আগামীকাল বেলা তিনটেয় এখানে এসে দাঁড়াবেন। আপনাকে সঙ্গে করে কাগজের অফিসে নিয়ে যাব।'

সন্দীপ চলে যাবার পরও দীপ্তেন্দু কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নভেম্বর মাস। তবু কলকাতায় এখনও শীত পড়ে নি। গরম সোয়েটার দূরে থাক, পথচারী কারো গায়ে একটা ফুলহাতা জামাও তার চোখে পড়ল না। আকাশটা পরিষ্কার। যেন ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে কেউ ডাস্টার ঘষে দিয়ে গেছে। তাই খড়ির একটু আঁচড়ও সেখানে লেগে নেই। হঠাৎ তার মনে হ'ল, কটা বেজেছে? এখন তার হাতে ঘড়ি নেই। মধ্যপ্রদেশে থাকতে রিস্টওয়াচটা একদিন হাত থেকে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছিল। আর সারানো হয় নি। শেয়ালদার কাছে একটা ঘড়ির দোকানে তার সামান্য পরিচয় আছে। ঘড়িটা এবার সেখান থেকে সারিয়ে নিলেই হবে। পাশে দিয়ে এক সুবেশ ভদ্রলোক প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। দীপ্তেন্দু একটু ঝুঁকে তাকে সময় জিজ্ঞেস করতেই তিনি একনজর তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন,—'সাড়ে সাতটা।' দীপ্তেন্দুর একবার ইচ্ছে করল, আরপুলি লেনে মাধুরী-বৌদির বাড়িটা দেখে আসে। পরক্ষণেই তার মনের ভেতর থেকে কেউ যেন বলে উঠল,—কী হবে সেখানে গিয়ে? মাধুরী বৌদি যখন বেঁচে নেই। বাড়িটা অবশ্য মাধুরী বৌদির নামে। সেখানে গেলে বড়জোর প্রদোষকাকার সঙ্গে দেখা হতে পারে। কিন্তু প্রদোষকাকা কি এখন ওই বাড়িতে থাকেন? আর চাষীদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে কাকদ্বীপের গ্রামেগঞ্জেই যখন তার কাজকর্ম।

দীপ্তেন্দুর আবার মনে হ'ল, একবার ডাফ স্ট্রীটে ব্রজবিলাস সরকারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেও হয়। দাদু নিশ্চয় তাকে দেখে খুব খুশি হবেন। আর অগ্নিবীণার

এখন সেখানে থাকার কথা নয়। বিয়ের পর সে শ্বশুরবাড়িতে চলে গেছে। ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে হয়তো কদাচিৎ বছরে এক-আধবার আসে।

তবু আজই মধ্যপ্রদেশ থেকে কলকাতায় পা দিয়ে ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে যেতে তার মন চাইল না। বলতে গেলে এখনও সে বেকার। সন্দীপ অবশ্য তাকে একটা চাকরির খোঁজ দিয়েছে। কাজটা যাতে হয় সেজন্য সে চেষ্টাও করবে। তবু ব্রজবিলাস সরকার নিশ্চয় বুঝতে পারবেন, দীপ্তেন্দু কলকাতায় এসে চাকরি খুঁজছে। তখন হয়তো তার জন্য একটু সহানুভূতি কিংবা করুণাও তাঁর কথায় প্রকাশ পেতে পারে। দীপ্তেন্দু যে কোনোভাবেই তার মহারানীর উপযুক্ত হতে পারে নি, ব্রজবিলাস সরকারের নিশ্চয় এখন সেটা মনে হবে।

আটটা নাগাদ দীপ্তেন্দু পাথুরিয়াঘাটার মেসে ফিরে এল। এখন মেসবাড়িটায় আবার কলরব। অফিস ছুটির পর প্রায় সবাই চলে এসেছে। দীপ্তেন্দু ঢুকতেই ঠাকুর এগিয়ে এসে বলল,—'রতনবাবু ফিরেছেন গো। আপনি আজ সকালে এসেছেন সে-কথাও তাকে জানিয়ে দিয়েছি।'

কী মনে হতে দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল,—'রতনবাবুর ঘর কোনটা?'

'কেন? আপনার মনে নেই বাবু?' ঠাকুর একগাল হাসল। বলল,—'দোতলায় ডানদিকের শেষ ঘরটা। ওই ঘরেই তো বরাবর আছেন।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। মনে পড়েছে।' দীপ্তেন্দু সায় দিল।

ঠাকুর বলল,—'আপনি বরং এখনই একবার রতনবাবুর সঙ্গে দেখাটা সেরে আসুন। সীট খালি আছে কি না উনিই বলতে পারবেন।'

দীপ্তেন্দুও সে-কথা ভাবছিল। রতন দত্তর সঙ্গে নিশ্চয় একবার দেখা করা প্রয়োজন। পাকাপাকি না হোক এই মেসে অন্তত কিছুদিনের জন্য তার জায়গা হবে কি না সেটা একমাত্র সেক্রেটারি বলতে পারবেন।

দীপ্তেন্দু দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই ঠাকুর শুধোল,—'রাত্তিরে এখানেই খাবেন তো বাবু? আমি কিন্তু মিল নিয়েছি।'

'দাঁড়াও। আগে রতনবাবুর সঙ্গে কথা বলে আসি। মেসের বোর্ডার না হলে কি এখানে খেতে বসা ঠিক হবে?'

'বেশ তো, যান। তবে আমি জানি, আপনি থাকতে চাইলে উনি কখনও আপত্তি করবেন না।'

দীপ্তেন্দু দরজার কাছে যেতেই রতন দত্ত তাকে সমাদর করে ভিতরে ডাকল। বলল,—'আসুন, আসুন। অফিস থেকে ফিরেই ঠাকুরের কাছে শুনলাম, আপনি সকালেই মধ্যপ্রদেশ থেকে ফিরেছেন।'

'হ্যাঁ। প্রায় বছর তিনেক ওখানে কাটিয়ে এলাম।' দীপ্তেন্দু সংক্ষেপে জানাল। শেষে বলল,—'মধ্যপ্রদেশ আর ভালো লাগছিল না, এখন কলকাতাতেই থাকার ইচ্ছে। তাই বলছিলাম, মেসে যদি একটা সীট পাওয়া যায়, তাহলে সুবিধে হয় আমার।'

রতন দত্ত দ্বিধার সঙ্গে জানাল,—'আপনি পুরানো বোর্ডার। এখানে একটা সীট দিতে পারলে খুবই আনন্দ পেতাম। কিন্তু—'

'কিন্তু কী? সীট নেই?' দীপ্তেন্দু একটা হতাশ ভঙ্গি করল। নরম গলায় শুধোল,—'অন্তত কিছুদিনের জন্য—।'

'সেটা হয়তো হতে পারে।' রতন দত্ত তাকে আশ্বাস দিল। তারপর দীপ্তেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে জানাল,—'তাহলে আপনাকে খুলে বলি। একতলার মাঝখানের ঘরটায় একটা সীট অবশ্য খালি আছে। কিন্তু কয়েকদিন আগে আমাদের মেসের প্রতীপবাবুর জানাশুনো এক ভদ্রলোক ওটা বুক করে গেছেন। তবে এখনই উনি আসছেন না। আগামী মাসের পনের-ষোল তারিখ নাগাদ আসতে পারেন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আগামী মাসের পনের-ষোল তারিখ হতে এখনও প্রায় আঠার দিন দেরি।'

রতন দত্ত বলল,—হ্যাঁ, উনি না আসা পর্যন্ত আপনি ওই সীটটায় থাকতে পারেন। তবে উনি এলে অবশ্য—'

দীপ্তেন্দু তার কথা শেষ না হতেই জানাল,—'সে-কথা আবার বলতে! পনের তারিখের আগেই আমি অন্যত্র একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব।'

রতন দত্ত বলল,—'তাহলে এই কটা দিন আপনি ওই সীটেই থাকবেন। আর মেসের নিয়ম-টিয়ম, এসব তো আপনার জানাই আছে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'হ্যাঁ-হ্যাঁ। এই নিয়ে আপনার কোনো চিন্তার কারণ নেই। অ্যাডভান্সের টাকাটা কাল সকালেই আপনাকে দিয়ে যাব।'

রতন দত্ত প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল,—'এখানে কোনো চাকরি-বাকরি পেলেন?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'চাকরি এখনও পাইনি। তবে একটা খোঁজ পেয়েছি। মনে হয় ওটা লেগে যাবে।'

'বাঃ! বাঃ! আপনি তো ভাগ্যবান লোক মশায়। কলকাতায় এসেই মাথা গোঁজার একটা জায়গা, রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তা, চাকরিটা কোথায়?'

দীপ্তেন্দ বলল,—'একটা খবরের কাগজের অফিসে।'

'খবরের কাগজ? মানে নিউজ পেপার। কোন্ কাগজ বলুন তো?'

'বঙ্গভূমি।'

'ও হ্যাঁ। দেখেছি কাগজটা। বেশ ঝরঝরে ছাপা। খেলার পাতায় ডিটেলড্ নিউজ দিচ্ছে। দেখুন যদি টিকে যায়।'

দীপ্তেন্দু হেসে জিজ্ঞেস করল,—'মোহনবাগানের কী খবর বলুন। আমি তো অনেকদিন দেশ ছাড়া।'

রতন দত্ত গর্বের সঙ্গে জানাল,—'এবার বেশ ভালো টিম। সামনে ডুরাণ্ড আর রোভার্সের খেলা। মনে হয় ট্রফি জিতবে।'

রতন দত্তের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল দীপ্তেন্দু। একতলার যে—

ঘরটায় তার সীট, তার সামনে এসে দাঁড়াতেই মেসের কাজের লোক শ্রীমন্ত এসে বলল,—'চলুন বাবু। আপনার বিছানাটা পেতে দিই।'

ঘরে দুটো সীট। তার রুম-মেট ভদ্রলোক বিছানায় শুয়ে একটা ছোট্ট বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে দিয়ে মনোযোগ সহকারে কী যেন দেখছিল। দীপ্তেন্দুকে দেখেই বইটা বালিশের নীচে চালান করে দিয়ে উঠে বসল। ভুরু তুলে শুধোল,—'আপনিই কি নিরাপদ হালদার? এই সীটে থাকবেন?'

তার হয়ে শ্রীকান্ত জবাব দিল,—'না বাবু। উনি কেন নিরাপদ হতে যাবেন? ওঁর নাম দীপ্তেন্দুবাবু। এই মেসে বছর তিন-চার আগে ছিলেন। তারপর একটা চাকরি নিয়ে বাইরে গেলেন। সেখান থেকে আজই ফিরেছেন। আপাতত এখানেই থাকবেন।'

দীপ্তেন্দু নিজেও ভদ্রলোকের ভুল শুধরে দেবার চেষ্টা করল। বলল,—'না-না। আমি এখানে পার্মানেন্টলি থাকছি না। যিনি এই সীটটা বুক করেছেন, তিনি সামনের মাসের পনের-ষোল তারিখ নাগাদ আসবেন। রতনবাবু মানে এই মেসের সেক্রেটারি আমাক সেই কটা দিন পর্যন্ত এখানেই থাকতে বলেছেন।'

রুম-মেটের চেহারার দিকে একনজর তাকাল দীপ্তেন্দু। পরনে একটা লুঙ্গি। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। রোদেপোড়া তামাটে গায়ের রঙ। কপালের কাছে একটা কাটা দাগ। মনে হয় ছেলেবেলার দুর্ঘটনা। কিন্তু দাগটা এখনও মিলিয়ে যায় নি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে।

লোকটা নিজের পরিচয় দিল। বলল,—'আমার নাম তিনকড়ি হাজরা। হুগলী জেলার বেগুনিয়াতে বাড়ি। ছ-শরিকের বাড়ি। ভাগভুতোর পর দুখানা ঘর আর একটা রান্নাঘর আমার ভাগে পড়েছে। এখন আমার স্ত্রী, ছেলে আর মেয়ে নিয়ে বেগুনিয়াতেই থাকে। শনিবার ধরে কিংবা ছুটিছাটা হলে আমিও খেপ মেরে আসি।'

শ্রীকান্ত তার বিছানাটা চৌকির ওপর যত্ন করে পেতে দিল। সুটকেসটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল,—'বাবু, আমি তাহলে আসি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এসো।'

যাবার সময় শ্রীকান্ত বলল,—'রান্না প্রায় হয়ে এসেছে। নটা বাজলেই চলে আসুন। ততক্ষণে মিল রেডি হয়ে যাবে।'

বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে একটু আরাম করবার চেষ্টা করল দীপ্তেন্দু। তিনকড়ি আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল,—'আপনি কি এখন কলকাতায় বদলি হয়ে এলেন?'

'বদলি?' দীপ্তেন্দু হাসল। বলল,—'কোথায় ট্রান্সফার হবো? আমি কি চাকরি করি?'

'তার মানে?' লোকটা খুব অবাক হয়ে শুধোল,—'আপনি চাকরি-বাকরি করেন না? বেকার?'

'এখন তাই বলতে পারেন। কাজকর্ম যখন নেই, তখন বেকার ছাড়া আবার কী?' দীপ্তেন্দু অপাঙ্গে তার রুম-মেটের মুখের দিকে তাকাল। তারপর সহাস্যে বলল,—'তবে সামনের মাস থেকেই আমি একটা কাজে যোগ দিতে পারি।'

'তাই বলুন।' তিনকড়িকে আশ্বস্ত মনে হ'ল। সে বলল,—'চাকরি নইলে কলকাতায় থাকার খরচ, মেস চার্জ—এসব আপনি দেবেন কোথা থেকে?'

দীপ্তেন্দু জামাকাপড় ছেড়ে একটা পাতলুন পরল। মধ্যপ্রদেশে থাকতে এগুলো ভালো করে কাচাও হয় নি। তাছাড়া সে যেসব জায়গায় কাটিয়েছে, সেখানে কলের জল দূরে থাক, পানীয় জলই খুব সুলভ ছিল না। কুয়ো কিংবা পুকুরই ভরসা। তাই জামাকাপড়ের রঙ তার শুভ্রতা হারিয়ে কেমন যেন লালচে হয়ে গেছে।

তিনকড়ি শুধোল—'আপনার বাড়ি কোথায় দীপ্তেন্দুবাবু?'

দীপ্তেন্দু জবাব দিল,—'বাঁকুড়া জেলায়'।

'সেখানে কে থাকেন?'

'আমার মা আর বাবা।'

'এখনও বিয়ে-থা করেন নি?

'নাহ।' দীপ্তেন্দু ছোট জবাব দিল।

'ভালো করেছেন মশায়।' তিনকড়ি অনায়াসে তার অযাচিতভাবে মন্তব্য ঘোষণা করল। বলল,—'বিয়ে মানেই পায়ে বেড়ি। তা সাধ করে যদি কেউ সে-বেড়ি পরে তাকে সারাজীবন পস্তাতে হবে।'

দীপ্তেন্দু তার প্রতিক্রিয়া জানাবার আগেই তিনকড়ি শুধোল,—'এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'মধ্যপ্রদেশে।'

'সেখানে কি চাকরি করতেন?'

'নাহ্, অন্য কাজ ছিল।'

তিনকড়ি শুধোল,—'মধ্যপ্রদেশে যাবার আগে আপনি তো এই মেসেই থাকতেন?'

'নাহ্, ঠিক তা নয়। আসলে নর্থ বেঙ্গলে একটা কলেজে প্রফেসরি পেয়ে আমি এই মেস ছেড়ে চলে যাই। তারপর মধ্যপ্রদেশে গিয়েছি।'

তার কারাবাসের কথাটা সে ইচ্ছে করেই তিনকড়ির কাছে ভাঙল না। এই তো কয়েক ঘণ্টার পরিচয়। কী হবে এখনই এসব কথা বলে? সে একটা জেলখাটা আসামী—শুনলে তিনকড়ি হাজরা হয়তো তার সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা করে বসবে।

রাত্তিরে আহারের পর সে হাতমুখ ধুয়ে একটু পায়চারি করবার জন্যই মেসবাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামল। হাঁটতে হাঁটতে সে লক্ষ করল এই ক'বছরে রাস্তার দু-ধারে ঘরবাড়িগুলো যেন অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। মেসবাড়িতেও পুরনো বোর্ডাররা এখন অনেকেই নেই। তাদের জায়গায় নতুন লোক এসেছে। ওই রতন

দত্তর মতো দু-চারজন এখনও রয়ে গেছে। বাকিদের বেশিরভাগই রিটায়ার করে দেশে ফিরেছে। অন্যরা কলকাতার কাছেই বাসা ভাড়া করে দেশ থেকে স্ত্রী-পুত্রকে এনে এখানেই সংসার পেতেছে।

হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা যেতেই তার হঠাৎ একজন চেনামুখ চোখে পড়ল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে নামটা। জীবন চক্রবর্তী। রেলে কাজ করে ভদ্রলোক। বুকিং ক্লার্ক। এক-একদিন রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি থাকে। মেসে ফিরতে নটা, কোনোদিন দশটা বেজে যায়।

জীবন চক্রবর্তী তাকে দেখেই চিনতে পারল। বলল,—'দীপ্তেন্দুবাবু না?'

'হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু ঈষৎ হাসল। নিজেই বলল,—'আজই এসেছি।'

'বেশ বেশ।' জীবন চক্রবর্তী খুশি হয়ে বলল,—'তা রতনবাবু আপনাকে কোন্ ঘরটায় থাকতে বলেছেন?'

'ওই যে, একতলার মাঝখানের ঘরটা। ওখানেই তো একটা সীট খালি আছে। তবে সেটা স্থায়ী নয়। এক ভদ্রলোক নাকি আগেই সীটটা বুক করে গেছেন। সামনের মাসের পনের-ষোল তারিখ নাগাদ আসবেন।'

জীবন চক্রবর্তী খুঁতখুঁত করে বলল,—'ওই ঘরে আপনার রুম-মেট তো তিনকড়ি হাজরা মানে রেসুড়ে তিনকড়ি—।' দীপ্তেন্দু ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,—'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। তবে আজই ওর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল। হুগলী জেলার বেগুনিয়াতে বাড়ি। সেখানেই স্ত্রী-পুত্র থাকে। উনি শনিবারে কিংবা ছুটিছাটায় বাড়ি যান।'

'আজ্ঞে না।' জীবন চক্রবর্তী সজোরে মাথা নাড়ল। বলল,—'শনিবারে উনি মোটেই দেশে যান না। আপনাকে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছেন। শনিবারে ওকে পাওয়া যাবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে।'

'ঘোড়দৌড়ের মাঠে? সে কী?'

'হ্যাঁ, রেসকোর্সে।' জীবন চক্রবর্তী রসিকতা করে বলল,—'আরে মশায় ও হ'ল একটি রেসুড়ে।' ফের তির্যক দৃষ্টিতে দীপ্তেন্দুকে এক পলক দেখে বলল,—'সাবধানে থাকবেন মশায়। আপনাকে না আবার রেসের মাঠে ফাঁসিয়ে দেয়।'

দীপ্তেন্দু হাসতে লাগল। বলল,—'যান আপনি। সারাদিন খাটাখাটুনি করে এসেছেন। আগে জামাকাপড় পাল্টে মুখহাত ধুয়ে খেয়ে নিন। ঠাকুর তো মিল নিয়ে বসে আছে।'

পরদিন দুপুরে কফিহাউসের গেটে পৌঁছেই দীপ্তেন্দু দেখল সন্দীপ দত্ত তার জন্য অপেক্ষা করছে। হাতে ঘড়ি ছিল না। তবু দীপ্তেন্দু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানাল,—'এখনও কিন্তু তিনটে বাজেনি।'

'জানি।' সন্দীপ হেসে জবাব দিল। বলল,—'সম্পাদক মশায় আপনাকে তিনটের আগেই নিয়ে যেতে বলেছেন। চারটে নাগাদ উনি একটা মিটিঙে যাবেন।'

দীপ্তেন্দুর পরনে একটা ধুতি আর হলুদ রঙের পাঞ্জাবি। পায়ে চটি। মধ্যপ্রদেশে থাকতে অনেকদিন চুলে তেল পড়েনি। তাই মুখখানা ঈষৎ উস্কোখুস্কো অবিন্যস্ত দেখাচ্ছিল।

সন্দীপ এক নজর তার বেশবাসের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। দীপ্তেন্দুর মনে হ'ল ইন্টারভ্যু দিতে যাবার সাজপোশাকটা সন্দীপের যেন পছন্দ হয় নি। সে যদি ধোপদুরস্ত এক প্রস্ত জামাকাপড় পরে আসত তাহলে হয়তো সন্দীপ দত্তর আত্মবিশ্বাস আর একটু বাড়ত। কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই। তার যা ছিল তাই পরেই ইন্টারভ্যু দিতে যাবে।

সন্দীপ শুধু বলল,—'আপনার সব কথাই আমি সম্পাদক মশায়কে জানিয়ে রেখেছি। ম্যাট্রিকুলেশনে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ। তারপর আই.এস.সি. তে দু-দুটো লেটার। হিস্ট্রি অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড। তারপর অবশ্য আপনাকে ছাত্র-রাজনীতিতে টেনে এনেছিলাম বলেই এম.এ. পরীক্ষার ফলটা আশানুরূপ হয় নি। তাছাড়া কলকাতায় পড়াশুনো চালিয়ে যেতে কী কঠিন স্ট্রাগলই না আপনাকে করতে হয়েছে। শেষে মিথ্যে অভিযোগে কারাবাস,—একটি বর্ণও গোপন করিনি। কেবল একটা কথা ওকে বলা হয় নি। মানে ইচ্ছে করেই বলিনি। পারলে আপনিও ওটা চেপে যাবেন।'

'কী কথা?' দীপ্তেন্দু অবাক হয়ে শুধোল।

'মধ্যপ্রদেশে গিয়ে আপনি বিনোদ মিশ্রর দলে যোগ দিয়েছিলেন।'

'কেন? সেটা কি দোষের হয়েছে?' দীপ্তেন্দু ভুরু কোঁচকাল।

'ঠিক দোষের হয়েছে তা অবশ্য বলা যায় না, তবে কি জানেন? খবরের কাগজের একটা নিজস্ব নীতি বা Principle থাকে। তারা কাকে সমর্থন করবে কোন রাজনৈতিক দলকে প্রাধান্য দেবে সেটা কাগজের মালিক আর সম্পাদক মিলে ঠিক করেন। ফলে তাদের মতে যারা বিশ্বাসী তেমন লোককেই কাজের জন্য তারা বেছে নেবেন।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'কিন্তু বিনোদ মিশ্রকে কি আপনি বামপন্থী বলে স্বীকার করেন না?'

'কেন করব না?' সন্দীপ হেসে কথা কইল। বলল,—'তবে প্রথাগত বা ট্র্যাডিশনাল বামপন্থী মতবাদের সঙ্গে বিনোদ মিশ্রর বেশ খানিকটা তফাৎ রয়ে গেছে। আর আপত্তিটা উঠবে সেখানেই।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কিন্তু উনি যদি জানতে চান, এই তিন বছর আমি মধ্যপ্রদেশে কোথায় ছিলাম, কী করতাম তাহলে তার বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাখ্যা তো আমাকে দিতে হবে'

'নিশ্চয়।' সন্দীপ ঈষৎ হাসল। বলল,—'আবার এমনও তো হতে পারে উনি এসব কথা কিছু জিজ্ঞাসাই করলেন না। শুধু আগ বাড়িয়ে আপনার মধ্যপ্রদেশ জীবনের অধ্যায়টা ওকে জানাতে যাবেন না।'

দীপ্তেন্দু রাজী হ'ল। বলল,—'বেশ তো। উনি না জিজ্ঞেস করলে আমিই বা কেন এসব কথা ওকে জানাতে যাব?'

বঙ্গভূমি কাগজের অফিসে ঢুকতেই দীপ্তেন্দুর মনটা কেমন খিচড়ে গেল। নীচের তলাটা বেশ নোংরা। একপাশে মেশিন ঘর। কালি মাখা ছেঁড়া কাগজ। একদিকে ডাঁই করে রাখা নিউজপ্রিন্ট। বিচিত্র শব্দ করে মেশিন চলছে। সম্ভবত এই মেশিনেই বঙ্গভূমি কাগজ ছাপা হয়। মেশিন ঘরে না ঢুকেই বাঁদিকের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল সন্দীপ। পিছনে দীপ্তেন্দু। দোতলায় আসতে পোশাক-পরা তক্‌মা আঁটা সিকিওরিটি স্টাফ তাদের পথ আটকাল। সন্দীপ তার নাম বলতেই সিকিওরিটি তাকে তেতলায় সম্পাদকের ঘরে যাবার পারমিশন দিল।

চকচকে সানমাইকা-বসানো কাঠের পার্টিশন দেওয়া সম্পাদকের বসবার ঘরের সামনে একজন পিওন বসে। বাঁদিকে নেম প্লেটে সম্পাদক মশায়ের নাম লেখা,—রতিকান্ত বসু। তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে সন্দীপ বলল,—'এর আগে উনি আরো দুটি কাগজের সম্পাদনা করেছেন। তার মধ্যে একটা উঠে গেছে। অন্যটি নাম-কা-ওয়াস্তে এখনও টিকে আছে।'

'বলেন কী?' দীপ্তেন্দু রসিকতা করল। বলল,—'এটার ভাগ্যেও তেমন হবে নাকি? তাহলে কিন্তু চাকরিটা যাবে।'

সন্দীপ তার নাম বলতেই বেয়ারা ভেতরে গিয়ে খবর দিল। পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এসে সে জানাল,—'আপনাদের মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হবে।' অগত্যা সন্দীপ আর সে অপেক্ষা করবার জন্যই নির্দিষ্ট একটা সোফায় গিয়ে বসে পড়ল।

ঘরে বোধহয় লোক ছিল। মিনিট দশ বাদে সে বেরিয়ে যেতেই বেয়ারা তাদের দুজনকে ভেতরে যেতে বলল। ঘরে পা দিয়েই দীপ্তেন্দু এক নজর দেখল সম্পাদককে। বেশ ফর্সা রঙ, যাকে গৌরবর্ণ বলা চলে। সুদর্শন চেহারা। মাথার চুল এখনও কাঁচা মনে হয়। কিন্তু ভালো করে তাকালেই দু-চারটে পাকা চুলের রুপোলি ঝিলিক চোখে পড়বে।

সন্দীপকে দেখেই ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন,—'আসুন, আসুন। আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।'

কোনোরকম ভনিতা না করেই সন্দীপ বলল,—'এই আমার বন্ধু দীপ্তেন্দু চট্টোপাধ্যায়। এর সম্বন্ধে সব কথাই তো আপনাকে জানিয়েছি।'

ভদ্রলোক তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনার সব কথাই আমি শুনেছি। আরে মশায় আপনি তো একজন মেধাবী ছাত্র। তবে আপনাকে আর angel বলছি না। আসলে আপনি একটি fallen cherub। এই সামান্য চাকরিটা

আপনাকে অফার করতে বরং আমিই কুণ্ঠা বোধ করছি।'

সন্দীপ তার সপক্ষে বলল,—'সামান্য কেন বলছেন? রিপোর্টারের কাজ কি হেলাফেলা করার মতো? কত দায়িত্ব আছে এই কাজের, তাই না?'

সম্পাদক অবশ্য কোনোরকম রাখঢাক না করেই বললেন,—'চাকরির নিয়োগপত্র দেবার আগে আমাকে একবার মালিকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আসলে উনিই তো এই কাগজের ফাইনান্সিয়ার। তাই কোনোরকম financial liability নেবার আগে ওকে জানানো এখানকার নিয়ম। তবে এসব ব্যাপারে উনি বড় একটা interfere করেন না। আর আমাদের কাগজে আরো দুজন সাংবাদিক যে নিতান্ত দরকার সে কথা ওকে আগেই জানানো হয়েছে।'

সন্দীপ শুধোল,—'তাহলে দীপ্তেন্দুবাবু কি সামনের মাস থেকেই এখানে জয়েন করবেন?

'হ্যাঁ। সে রকমই তো ইচ্ছে আমার। তবে তার আগে কাগজের মালিকের সঙ্গে আমি কথা বলে নেব'। তারপর সম্পাদক মশায় ভুরু তুলে দীপ্তেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন,—'আচ্ছা, আপনি কি কোনো application সঙ্গে এনেছেন?'

দীপ্তেন্দু কেমন একটা অপ্রস্তুত ভাব করে জানাল,—'না মানে আমি ভেবেছিলাম।'

সম্পাদক সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—'তাতে কী হয়েছে?' আপনি বরং এখনই একটা দরখাস্ত লিখে আমার পিওনের কাছে রেখে যান। মিটিঙ থেকে ফিরে এসেই আমি ওটা চেয়ে নেব।'

সন্দীপ বলল,—'বেশ তো, দীপ্তেন্দু এখনই দরখাস্তটা লিখে আপনার ওই লোকটির কাছে রেখে যাবে।'

সম্পাদক হঠাৎ সলজ্জ হেসে বললেন,—'একটা কথা কিন্তু বলা হয় নি দীপ্তেন্দুবাবু। আর সেটা নিশ্চয় আপনার জানা দরকার।'

'কী কথা বলুন তো?' দীপ্তেন্দু সাগ্রহে তাকাল।

রতিকান্তবাবু বললেন,—'আপনার salary মানে মাইনেটা কী হবে সেটাই তো বলা হয় নি।'

সন্দীপ হেসে জবাব দিল,—'অন্য রিপোর্টাররা যা পাচ্ছেন ওকেও নিশ্চয় তাই দেবেন।'

'অবশ্য'। রতিকান্তবাবু স্বীকার করে নিলেন। বললেন,—'তবু টাকার অঙ্কটা জানানো দরকার। পরে অবশ্য appointment letter এ সবই লেখা থাকবে।'

দীপ্তেন্দু আর সন্দীপ দুজনেই অঙ্কটা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

সম্পাদক মশায় একটু ভনিতা করে বললেন,—'আমাদের নতুন কাগজ। এখন বিজ্ঞাপন নেই বললেই চলে। কটা কলাম আর বিজ্ঞাপন পাচ্ছি? তবে বছরখানেক বাদে অবস্থা পাল্টাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তারপর জার্নালিস্ট ওয়েজেস বোর্ডের রেকমেণ্ডেশন আসছে। তখন একটা revision of pay scales নিশ্চয় করব।

কিন্তু আপাতত একজন জুনিয়র রিপোর্টারকে সওয়া'শ টাকার বেশি দিতে পারছি না। তার সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা conveyance allowance। অবশ্য এটা শুধু করপোরেশন এলাকার জন্য। বাইরে গেলে নিয়ম মেনে T.A. বিল করতে পারবেন।'

রতিকান্তবাবু বেরিয়ে যেতেই সন্দীপ শুধোল,—'কি? সওয়া 'শ টাকার মাস মাইনের এই চাকরিটা করবেন?'

'হ্যাঁ। আপাতত যখন হাতে কিছু নেই তখন এটা ছাড়ব কেন? তবে কাজটা বেশ ineresting হবে বলে আমার মনে হচ্ছে। সেটাই এর বড় আকর্ষণ।'

দরখাস্তটা লিখে পিওনের কাছে রেখে দুজনে কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে এলো।

সন্দীপ শুধোল,—'এখন যাবেন কোথায়? হাতে কোনো কাজ আছে?'

'কাজ কোথায়?' দীপ্তেন্দু হেসে জবাব দিল। বলল,—'আমি পুরোপুরি বেকার।'

'তবে চলুন কফি হাউসে গিয়ে বসি। তাছাড়া আপনি একজন রিপোর্টার। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা হতে পারে।'

দীপ্তেন্দু আগের মতো হাসল। বলল,—'আমি কিন্তু, এখনও রিপোর্টার নই। আগে appointment letter পাই।'

সন্দীপ গর্বের সঙ্গে জানাল,—'আপনাকে যখন সঙ্গে করে নিয়ে গেছি তখন ধরে নিন ও চাকরি আপনার হয়েই গেছে।'

দীপ্তেন্দু সংশয়ের সুরে বলল,—'কিন্তু মালিক মানে financier যদি আপত্তি করে বসে? তাহলে তো কেসটা কেঁচে যাবে।'

'আশ্চর্য!' সন্দীপ ভুরু তুলে তাকাল। বলল,—'আপনি অবাক করলেন মশায়। কাগজের মালিক আপনার দরখাস্তটা খারিজ করে দিতে পারে জানলে রতিকান্ত বোস কখনও ওটা আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিত না। আমার ধারণা নতুন রিপোর্টার নেওয়ার ব্যাপারে মালিকের সঙ্গে ওর আগেই কথা হয়ে গেছে। এখন শুধু আপনার দরখাস্তটা মালিককে দিয়ে approve করিয়ে নেবে।'

কফিহাউসে ঢুকেই সন্দীপ একটা টেবিল দখল করে বসল। তার সামনের চেয়ারে দীপ্তেন্দু। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরাল। দীপ্তেন্দুকে অফার করতে গিয়ে নিজেই হেসে বলল,—'আপনার তো আবার এসব চলে না।'

'নাহ্। আসলে। 'get no pleasure in smoking.'

বেশ আয়েস করে খানিকটা ধূমপান করে সন্দীপ বলল,—'ইলেকশন তো দোরগোড়ায় এসে পড়ল। আপনার কি মনে হয় পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস ফের ক্ষমতায় আসবে?'

'বলা শক্ত। আর আপনি তো জানেন গ্রাম বাংলায় বিশেষ করে জেলা স্তরে কংগ্রেসের আধিপত্য এখনও টলানো যায় নি। মনে আছে নিশ্চয় উনিশ'শ সাতান্ন

ানের নির্বাচনে বাঁকুড়ার তেরটা সীটই কংগ্রেস পেয়েছিল।'

'হ্যাঁ। সেটাই একটা বড় বাধা। তবে দেখবেন একদিন গ্রাম বাংলাও আমাদের মানে বামপন্থীদের দখলে আসবে। হয়তো সেদিন বাঁকুড়ার তেরটা সীটে কংগ্রেস সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে ক্ষমতা থেকে দূরে সরে যাবে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'শহরাঞ্চলে বিশেষ করে কলকাতায় কংগ্রেসের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেছে। চারটে লোকসভা আসনের মধ্যে একমাত্র উত্তর-পশ্চিম লোকসভা আসনটি কংগ্রেস পেয়েছিল। লড়াই হয়েছিল আইনমন্ত্রী অশোক সেনের সঙ্গে ময়মনসিংয়ের জমিদার পরিবারের উত্তরাধিকারী স্নেহাংশুকুমার আচার্যের।'

'শুধু লোকসভা আসনের কথা বলছেন কেন?'

সন্দীপ প্রতিবাদ জানাল। বলল,—'এখন বিধানসভাতেও আমাদের আধিপত্য কম নয়। কলকাতার ছাব্বিশটা আসনের মধ্যে আঠারটা সীটই আমাদের দখলে গেছে।' দীপ্তেন্দু বলল,—'আজকের কাগজে দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বৌবাজার আসন থেকে আর দাঁড়াতে চাইছেন না। তার পরিবর্তে তিনি অপেক্ষাকৃত সহজ একটি সীট,—চৌরঙ্গী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ঠিক করেছেন।'

সন্দীপ হেসে বলল,—'গত নির্বাচনে বৌবাজার আসনটি রক্ষা করতে ডাঃ রায়কে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। তার বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন স্বল্প-পরিচিত ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা মহম্মদ ইসমাইল। কিন্তু নির্বাচকদের রায়ে মুখ্যমন্ত্রীর মতো এক প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রতি জনগণের আস্থার কোনো উজ্জ্বল প্রতিফলন হয়নি। সেজন্যই হয়তো ডাঃ রায় বৌবাজার কেন্দ্র ছেড়ে এবার চৌরঙ্গী থেকে দাঁড়াতে চেয়েছেন। তবে শোনা যাচ্ছে শুধু চৌরঙ্গী নয়। গ্রামাঞ্চলের আরো একটি আসন থেকেও তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।'

'বলেন কী?' দীপ্তেন্দু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। 'ডাঃ রায় পশ্চিম বাংলা বিধানসভা নির্বাচনে দুটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন?'

'ঠিক তাই। আসলে কলকাতার নির্বাচকদের ওপর ডাঃ রায়ের তেমন ভরসা নেই। তাই আরো একটি নিশ্চিত আসন থেকে তিনি দাঁড়াতে চাইছেন। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে সেই আসনটি বাঁকুড়া জেলার একটি অনগ্রসর অঞ্চল,—শালতোড়া।'

দীপ্তেন্দু কোনো মন্তব্য করবার আগেই সন্দীপ ফের বলল,—ডাঃ রায়ের দুটি আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার এই সাবধানী মনোবৃত্তিটা কংগ্রেসের অনেকেই ভালো চোখে দেখছে না। তবে মুখ্যমন্ত্রীকে সমীহ করে এই নিয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খোলে নি। আর শুধু ডাঃ রায়কেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি? কংগ্রেসের অনেক নির্বাচিত সদস্যেরই তো এখন এই দশা।'

'তার মানে?' দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে তাকাল। সন্দীপ বলল,—'মানেটা খুবই সহজ। ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভার কোনো মন্ত্রীই আগামী নির্বাচনে কলকাতা থেকে দাঁড়াতে চাইছেন না। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া। তিনিও দু-নৌকোতে পা রেখে কলকাতার

চৌরঙ্গী কেন্দ্রের সঙ্গে বাঁকুড়ার শালতোড়া কেন্দ্রটি জুড়ে দিয়েছেন।'

বেয়ারা এসে টেবিলে দু-কাপ কফি রেখে গেল। পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সন্দীপ বলল,—'এরপর তো ইলেকশন সম্বন্ধে আপনিই লেখালেখি করবেন। কোন প্রার্থীর কেমন অবস্থা, কোন পার্টি কোন জেলা থেকে কটা সীট জিতবে নির্বাচন যুদ্ধের এইসব আগাম ভবিষ্যদ্বাণী একমাত্র সাংবাদিকরাই করতে পারবেন।'

পাথুরিয়াঘাটার মেসবাড়িতে ফিরে দীপ্তেন্দু লক্ষ করল তার রুম-মেট তিনকড়ি হাজরা একটা ছোট বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে মনোযোগ সহকারে কী যেন দেখছে। দীপ্তেন্দু বুঝতে পারল ওটা রেসের বই। আর তিনকড়ি হাজরা এমন তন্ময় হয়ে বইয়ের পাতায় চোখ রেখেছে যে ঘরে দীপ্তেন্দুর উপস্থিতিও সে টের পায় নি।

গলা খাকারি দিয়ে দীপ্তেন্দু তার আগমনবার্তা জানাতেই তিনকড়ি বইটা একপাশে রেখে বিছানায় উঠে বসল।

ভনিতা না করেই দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল,—'ওটা কী বই?'

তিনকড়ি সলজ্জ হেসে জবাব দিল—'রেসের বই।' তারপর বইটা হাতে তুলে নিয়ে বলল,—'ঘোড় দৌড়ের মাঠের সব খবরই এতে পাবেন।'

দীপ্তেন্দু মুচকি হেসে বলল,—'আপনি রেসের মাঠে যান?'

'হ্যাঁ। যাই মানে ওই শনিবার দিনটা একবার ঘুরে আমি। কখনও বুকির কাছেও টাকা দিয়ে খেলি। জিতলে পেমেন্ট করে আর হারলে বুঝতেই পারছেন টাকাটা জলে গেল।'

রেসের ব্যাপারে দীপ্তেন্দুর আগ্রহ দেখে তিনকড়ি বলল,—'এই যে চার নম্বর ইভেন্টটা দেখছেন, সামনের শনিবার এই খেলাটা দারুণ ইনটারেস্টিং। প্রচুর লোক এতে বাজী ধরবে। দুটো ঘোড়া যাকে বলে টপ ফেভারিট। একটার নাম Ocean way আর একটা হ'ল Selector.' তারপর রেসের বইটা দীপ্তেন্দুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,—'এটা ছুঁয়ে বলুন না, এই দুটোর মধ্যে কোন ঘোড়াটা বাজী জিতবে।'

দীপ্তেন্দু একটা অপ্রস্তুত ভঙ্গি করে জানাল,—'কী যে বলেন? আমি সেটা কেমন করে জানব?'

'আহা! জানবার কী আছে? আপনার যা মনে আসবে তাই বলবেন।' তিনকড়ি জিদ করল। ফের বইটা তার দিকে ধরে বলল,—'এটা ছুঁয়ে বলুন না। আপনার যা মনে আসে তাই। Ocean way না selector কোন ঘোড়াটা কাল বাজী জিতবে?'

দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল। বলল,—'আরে না-না। সে কেমন করে হবে? আমি কি রেসকোর্সের কোনো খবর রাখি? কোন ঘোড়াটা বাজী জিতবে আমি কেমন করে তা বলব?'

তিনকড়ি বলল,—'ইয়ে মানে আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনার যেটা প্রথম মনে আসবে আপনি সেই নামটাই বলবেন।' বাঁ চোখটা ঈষৎ টিপে সে

ফের বলল,—'আরে মশায় এ লাইনের এটাই টোটকা। রেসের মাঠের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই কিংবা হয়তো এই প্রথমবার খেলতে এলো, সে যা বলবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেটাই লেগে যায়। যেমন আপনি আজ যে ঘোড়াটার নাম বলবেন শনিবার সকালে আমি ওই ইভেন্টে ওই ঘোড়ার ওপর win খেলব।'

'Win মানে?' দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল।

তিনকড়ি বলল—'Win মানে ফার্স্ট। ঘোড়াটা যদি ফার্স্ট হয় তাহলেই আমার win, যাকে বলে বাজীমাৎ। তারপর ধরুন আমার মতো আরো যারা win খেলেছে, বাজীর টাকাটা তাদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।'

'আর যদি ফার্স্ট হতে না পারে?'

'তাহলে টাকাটাই বরবাদ। এমন কি সেকেণ্ড, কিংবা থার্ড প্লেস পেলেও তার কোনো মূল্য নেই।'

'Win ছাড়া আর কোনো খেলা নেই?'

'কেন থাকবে না? যেমন ধরুন প্লেস। ওই ঘোড়াটার ওপর যদি প্লেস খেলি তাহলে ওই ঘোড়াটা ফার্স্ট, সেকেণ্ড কিংবা থার্ড প্লেস যাই পাক, তাহলেও আমার কিছু পেমেন্ট হবে। তবে সেটা যৎকিঞ্চিৎ। Win এর সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না। তারপর আছে ধরুন Jackpot। সে অনেক ব্যাপার,—পরে আপনাকে শিখিয়ে দেব।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'শুনুন স্কুলে পড়ার সময় আমি একটা গল্প পড়েছিলাম। ইংরাজী গল্প,—নামটা যতদূর মনে পড়ছে—The rocking horse winner। আপনার মতো এক ভদ্রলোক রেস খেলতেন। তার ছেলে একটা খেলনা কাঠের ঘোড়ায় বসে দুলতে দুলতে বলতে পারত, কোন ঘোড়াটা সামনের দিনের রেসের বাজী জিতবে। এক-একদিন রাত্রে তার কাঠের ঘোড়ায় চেপে সে প্রচণ্ড বেগে দুলতে দুলতে চেঁচিয়ে উঠত,—ইয়েস ফাদার। ইট ইজ মালাবার, মালাবার কামিং। আর তার বাবা পরদিন ওই মালাবার ঘোড়াটার ওপর বাজী ধরে একরাশ টাকা জিতে বাড়ি ফিরত।'

'কী দারুণ ব্যাপার!' তিনকড়ির চোখ দুটো খুশিতে ঝিকমিক করে উঠল। সে বলল,—'আমার ছেলেটাকে একটা কাঠের ঘোড়া কিনে দিয়ে দেখব নাকি মশায়? যদি কোন ঘোড়াটার ওপর বাজী ধরলে win হবে সেটা বলে দিতে পারে?

দীপ্তেন্দু ম্লান হাসল। বলল,—'গল্পটার পরিণতি কিন্তু খুব দুঃখের, শুনবেন?'

তিনকড়ি গল্পের পরিসমাপ্তির প্রতি কোনোরকম আগ্রহ না দেখিয়ে বলল,—'ও সব ছাড়ুন। এখন এই রেসের বইটা ছুঁয়ে বলুন—Ocean way না Selector কোন ঘোড়াটা কাল বাজী জিতবে?'

'তারপর? আমি যেটা বলব সেটা যদি win না করে তাহলে আমাকেই দুষবেন তো?'

'ধুর মশায়। দুটোর মধ্যে একটা ঘোড়া তো বাজী জিতবেই। তাতে আপনার

দোষ হতে যাবে কেন?' আবার রেসের বইটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনকড়ি বলল,—'নিন নিন। দেরি করবেন না। এটা ছুঁয়ে চটপট বলে ফেলুন। কোন ঘোড়াটা বাজী জিতবে?' খানিকটা মজা করবার জন্যই দীপ্তেন্দু রেসের বইটা স্পর্শ করে বলল,—'Ocean way. কাল Ocean way বাজী জিতবে।'

নামটা শুনেই তিনকড়ি লাফিয়ে উঠল। বলল,—'আমিও তাই ভেবেছি। ঠিক আছে, শনিবার এই ঘোড়াটার ওপরই বাজী ধরব। কত টাকা জানেন?'

'কত টাকা?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

'তিরিশ টাকা।'

'অত টাকা?' দীপ্তেন্দু সংশয়ের চোখে তাকাল।

তিনকড়ি হেসে বলল—'তেমনি জিতলে কর করে আড়াই'শ টাকা পকেটে চলে আসবে।'

'আর ঘোড়া যদি না জিততে পারে?'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে তিনকড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একদিন পরেই শনিবার। দুপুরে ভোজনের মাত্রাটা একটু বেশি হয়েছিল। তাই শোবার পরই ঘুম এলো চোখে। হঠাৎ বাইরে তার নাম ধরে কেউ ডাকাডাকি করছে শুনে সে ধড়মড় করে উঠে বসল। পাথুরিয়াঘাটা মেসের এই ঠিকানাটা তার বন্ধুবান্ধব কাউকে সে দেয়নি। কলকাতায় এসে তেমন কার সঙ্গেই বা দেখা হয়েছে তার? একমাত্র সন্দীপ ছাড়া। আর এমন অসময়ে সন্দীপই বা কেন এখানে আসবে? তাছাড়া পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের মেসের ঠিকানা সন্দীপও তো জানে না।

খাট থেকে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে গেল দীপ্তেন্দু। মেসবাড়িটা এখন ফাঁকা। অফিস ছুটির পর অনেকেই শনিবার ধরে বাড়ি চলে যায়। দু-চারজন অবশ্য থাকে। তার রুমমেট তিনকড়ি হাজরা নিশ্চয় এখন রেসের মাঠে।

সদর দরজা খুলে বাইরে এসে দীপ্তেন্দু দেখল সাইকেল নিয়ে একটা আধবুড়ো লোক দাঁড়িয়ে। তার পরনে খাকি সার্ট আর প্যান্ট। জামার একপাশে 'বঙ্গভূমি' কথাটি লেখা। তাকে দেখেই সে শুধোল,—'আপনি কি দীপ্তেন্দুবাবু? দীপ্তেন্দু চ্যাটার্জী?'

'হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু ছোট্ট জবাব দিল।

সে বলল,—'আমি বঙ্গভূমি কাগজের অফিস থেকে আসছি। চিঠি আছে আপনার নামে।'

পিওন বইটা তার সামনে খুলতেই দীপ্তেন্দু খসখস করে নিজের নামটা লিখে চিঠিটা নিল।

লোকটি বলল,—'বঙ্গভূমি কাগজের অফিসে আপনার চাকরি হয়েছে, তাই না বাবু?'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'তুমি কেমন করে জানলে?'

'আমি শুনেছি। এটা অ্যাপয়েন্টমেন্টো চিঠি।' সে একগাল হাসল।

দীপ্তেন্দু বলল,—'তাহলে তো তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

'হ্যাঁ বাবু।' বলেই সে আর কথা না বাড়িয়ে সাইকেলে চেপে দ্রুত অদৃশ্য হ'ল।

ঘরে ঢুকে দীপ্তেন্দু খামটা ছিঁড়ে তার নিয়োগপত্রটি দেখল। রতিকান্ত বসু যা বলেছিলেন তাই। মাসে সওয়া'শ টাকা মাইনে আর রাহা খরচ বাবদ পঞ্চাশ টাকা। চিঠিতে তাকে অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। দীপ্তেন্দু স্থির করল আগামী সোমবার অর্থাৎ পয়লা তারিখেই সে কাজে যোগ দিতে পারে।

চিঠিটা বাক্সে রেখে দীপ্তেন্দু ভাবল এখনই একবার খবরটা সন্দীপকে জানিয়ে আসে। তার রেকমেণ্ডশনেই যখন চাকরি। তখন খবরটা সর্বাগ্রে তাকেই দেওয়া উচিত। এখন কটা বাজল কে জানে? দীপ্তেন্দুর কাছে ঘড়ি নেই। তবে রাস্তায় বেরিয়ে একটা দোকানের ঘড়ি থেকে কটা বাজল সেটা জেনে নিতে পারে। আর দেরি না করে জামাকাপড় পাল্টে দীপ্তেন্দু কলেজস্ট্রীটের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল। কফিহাউসে গেলে নিশ্চয় সন্দীপের দেখা পাওয়া যাবে। এই সময়টা সাধারণত সে কফিহাউসেই কাটায়। ছাত্র-রাজনীতির নানারকম কাজের সঙ্গে তার যোগাযোগ তো এখনও কমে নি।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে সে কলেজ স্ট্রীটে পৌছে গেল। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে রাস্তাটা পেরোবে বলে সে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। কলেজ স্ট্রীট আর মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়টা উত্তর-দক্ষিণে খোলা বলেই তার চোখের সামনে দিয়ে এক সার গাড়ি দ্রুত যাতায়াত করছিল। হঠাৎ একটা ধাবমান গাড়ির ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কে যেন বলল,—'আরে, দীপ্তেন্দু না?'

সে খুব অবাক হয়ে গাড়িটার দিকে তাকাল। কিন্তু ভেতর থেকে কে তার নাম ধরে ডাকল সেটা কিছুতেই বুঝতে পারল না। খানিকটা পথ গিয়েই গাড়িটা অবশ্য রাস্তার একপাশে থামল। পরক্ষণেরই এক সুবেশ যুবা গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুটে তার কাছে চলে এলো। হাত দুটো আলতো করে ধরে বলল,— 'চিনেছি ঠিকই। কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় দীপ্তেন্দু ছাড়া আর কাকে দেখতে পাব?'

দীপ্তেন্দু খুব অবাক হয়ে দেখল তার সামনে হরিদাস দাঁড়িয়ে। বাঁকুড়া কলেজের রোনাল্ডসে হস্টেলে তারা দুজনেই থাকত। এই তো ক'বছর আগে কী যেন একটা ছবিতে অভিনয় করেছিল। তখন নামটা বেমালুম বদলে নতুন কী যেন নাম নিয়েছিল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে তার—তমাল কুমার।

কিন্তু হরিদাস মানে তমাল কুমারের চেহারাটাই যেন পাল্টে গেছে। সদ্য ইস্ত্রি ভাঙা চকচকে প্যান্ট আর সার্ট পবনে। এক মাথা কোঁকড়া চুল। সুন্দর একটা সেন্টের মিষ্টি সৌরভ ওর গা থেকে ছড়াচ্ছে।

হরিদাস বলল,—'তোকে দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন, কলকাতায় ছিলি না। চেহারাটা খুব শুকনো লাগছে।'

'ঠিক ধরেছিস। আমি প্রায় তিন বছর মধ্যপ্রদেশে ছিলাম। নানা জায়গায় ঘুরেছি।'

'বলিস কী?' হরিদাস রহস্য করে শুধোল,—'মধ্যপ্রদেশেও রাজনীতি করতিস নাকি?'

'না-না। তেমন কিছু নয়।' দীপ্তেন্দু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল।

হরিদাস শুধোল—'তাহলে এখন কী করছিস? মানে কলকাতায় কোনো চাকরি পেলি?'

'হ্যাঁ। আপাতত একটা কাগজের অফিসে জয়েন করছি। জার্নালিস্ট হিসেবে।'

'কোন কাগজ?'

'বঙ্গভূমি।' দীপ্তেন্দু পত্রিকার নামটা উল্লেখ করল।

হরিদাস বলল,—'নতুন কাগজ। তবে দাঁড়িয়ে যাবে মনে হয়। ওদের সিনেমার পাতাটা দেখিস, মাঝেমাঝেই আমার সম্বন্ধে নানারকম খবর ছাপে।'

'তুই এখন কোন ছবিতে অভিনয় করছিস?'

'সে একটা নাকি? পরে বলব'খন। আয় না একদিন বাড়িতে।' বলেই পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,—'অবশ্য টেলিফোন করে। নইলে গিয়ে দেখবি আমি শুটিঙে বেরিয়ে গেছি।'

হরিদাস আর দাঁড়াল না। বলল,—'এ জায়গাটা নো পার্কিং এরিয়া। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করার দায়ে ফিল্ম-স্টারকে জড়িয়ে দিতে পারলে তোদের কাগজের একটা নিউজ হয়ে যাবে।'

পেট্রলের ধোঁয়া উড়িয়ে হরিদাসের গাড়িটা মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধী রোড পেরিয়ে দ্রুত মিলিয়ে গেল।

কফিহাউসে সন্দীপের দেখা পাওয়া গেল না। সেদিন একটি ছেলের সঙ্গে সন্দীপ কথা বলছিল। তার কাছে খোঁজ করতেই জানতে পারল সন্দীপ কেষ্টনগরে গেছে। ফিরতে রাত্তির হবে। আগামীকাল রবিবার। বেলা এগারোটার আগে কফিহাউসে তার দেখা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

মেসে ফিরতেই তিনকড়ি হাজরা উল্লাসে তার হাত দুটো শক্ত করে ধরে বলল, 'দেখলেন তো, যা বলেছিলাম। টোটকা ফলে গেছে।'

দীপ্তেন্দু অবাক চোখে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল Ocean way বাজীমাত করেছে। রেসে দিতেছি মশায়। করকরে আড়াই'শ টাকার মতো পেয়েছি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'খুব ভালো খবর। একদিন খাইয়ে দেবেন।'

তিনকড়ি হাজরা বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে বলল,—'সেটা আজই হতে পারে।' মুচকি হেসে ফের যোগ করল,—'পকেট গরম। একটু বসবেন নাকি? কাছেই একটা ভালো বার রয়েছে।'

বার মানে মদের দোকান বা পানশালা। দীপ্তেন্দু প্রায় আঁতকে উঠল। প্রতিবাদের ঢঙে বলল,—'ছি-ছি! আপনি এইসব ছাই ভস্ম খান নাকি?'

'খাই নাকি মানে?' তিনকড়ি হাজরা থিয়েটারের অভিনেতার মতো রঙ্গ করে হাসল। বলল,—'এই শহরে কে মদ খায় না বলতে পারেন? আপনার কথা শুনলে মাইরি মনে হয় কলকাতাটা বুঝি বামুনের বিধবা হয়ে গেছে।' তারপর দীপ্তেন্দুর বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলল,—'আপনি তো দেখছি একটি দুগ্ধপোষ্য নাবালাক।'

সকালে দীপ্তেন্দু ডাফ স্ট্রীটে ব্রজবিলাস সরকারের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে বেরোল। শীতের দিন। গতকাল রাত থেকে ঠাণ্ডা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। দীপ্তেন্দুর গায়ে একটা পাতলা সোয়েটার। আর কোনো শীতবস্ত্র নেই। কলকাতার ঠাণ্ডায় অবশ্য এতেই চলে। কিন্তু শীত বেশি পড়লে কিংবা কনকনে হাওয়া দিলে একটা গরম চাদরের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

ডাফ স্ট্রীটের বাড়িটার কাছে এসে দীপ্তেন্দু থামল। এর আগে এই বাড়িটায় সে আরো কতবার এসেছে। তখন অবশ্য একটা অন্য আকর্ষণ ছিল। একটি মেয়ের হাসি ভরা সুন্দর মুখ। অগ্নিবীণার সঙ্গে দেখা করবার অছিলায় এই বাড়িতে তখন সে বারবার আসত।

ব্রজবিলাস সরকার সামনের ঘরটায় বসেছিলেন। দীপ্তেন্দুকে দেখেই সহাস্যে বললেন,—'আরে দীপ্তেন্দু যে, এসো এসো। সেই তুমি মধ্যপ্রদেশ না কোথায় যেন চলে গেলে আর একটা চিঠি পর্যন্ত দিলে না, এর-ওর কাছে আমি যে কতবার তোমার খোঁজ করেছি।'

দীপ্তেন্দু তার পদধুলি নিতেই ব্রজবিলাস আশীর্বাদ করে বললেন,—'পৃথিবীতে তোমার খ্যাতি হোক।'

তখনই বাড়ির ভেতর থেকে পরিচিত নারীকণ্ঠে কে যেন বলল,—'তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ দাদু? কে এসেছে?'

'একবার বেরিয়ে এসে দেখ না মহারানী। চিনতে পার কিনা।' ব্রজবিলাস সরস সুরে কথা কইলেন। ফের বললেন,—'তিন বছর বাদে এ বাড়িতে কে এসেছে দ্যাখ।'

পর মুহূর্তেই দরজার পর্দা সরিয়ে সে ঘরে পা দিল। দীপ্তেন্দু অবাক হয়ে দেখছিল, এই তিনবছরে অগ্নিবীণার চেহারাটা এত বদলে গেছে। এ তো সেই পাঁচালের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথম পরিচয়ের কিশোরী মেয়েটি নয়। কিংবা বেথুন স্কুল বা আরো একটু পরিণত মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীও নয়। দীপ্তেন্দু দেখছিল তার সামনে দাঁড়িয়ে এক সুন্দরী, যৌবনবতী পূর্ণাঙ্গী নারী। এত সুন্দর লাগছে ওকে। গায়ের রঙটা এখন আরো ফর্সা। টিকালো নাসিকা। আয়ত দুটি চোখ। এক মাথা মেঘবরণ কেশ। পুরন্ত মুখখানি।

অগ্নিবীণা তার দিকে তাকাতেই দীপ্তেন্দু শুধোল,—'ভালো আছ তো বুলু?'

॥ তিন ॥

অগ্নিবীণা কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চিত্রাপির্তের মতো তাকিয়ে রইল। তারপর স্থির দৃষ্টিতে দীপ্তেন্দুর মুখের ওপর চোখ রেখে বলল,—'হ্যাঁ, ভালোই আছি।'

ব্রজবিলাস বুঝতে পারলেন দুজনের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন একটা ছন্দের অভাব রয়েছে। তাই উভয়কে ঈষৎ স্বচ্ছন্দ করবার জন্যই বললেন,—'তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ দীপ্তেন্দু। মহারাণীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল। ক'দিন হ'ল জলপাইগুড়ি থেকে ও এখানে এসেছে।'

অগ্নিবীণা বলল,—'আপনি বসুন দীপ্তেন্দুদা। চলে যাবেন না যেন। আমি রান্নার মেয়েটিকে সব বুঝিয়ে দিয়ে এখুনি আসছি। সেই সঙ্গে আপনার জলখাবাবও দিয়ে আসি।'

রান্নার মেয়েটিকে তার কাজের ফিরিস্তি বুঝিয়ে দিতে অগ্নিবীণাকে যেতে হবে শুনেই দীপ্তেন্দুর কেমন খটকা লাগল। তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল,—'মাসীমা বাড়িতে নেই?'

'নাহ।' বলেই কেমন অদ্ভুত হেসে অগ্নিবীণা পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

ব্রজবিলাস বললেন,—'তুমি স্থির হয়ে ব'স একটু। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। তিন বছর তুমি মধ্যপ্রদেশে গিয়ে রইলে। যোগাযোগও ছিল না, অথচ এই তিন বছরে গঙ্গা দিয়ে কম জল তো বয়ে যায় নি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কলকাতায় ফিরে আসারই আর ইচ্ছে ছিল না আমার। শেষ পর্যন্ত এমন সব ঘটনা হ'ল যে ওখানে আর থাকা চলছিল না।'

ব্রজবিলাস ঈষৎ নরমগলায় বললেন,—'জেল থেকে যেদিন তুমি ছাড়া পেলে, সেই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা। বলেছিলে, কলকাতা থেকে অনেকদূরে মধ্যপ্রদেশ চলে যাবে। জেলে থাকতেই তোমার সঙ্গে বিনোদকান্ত মিশ্র নামের এক ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। মধ্যপ্রদেশের অসংগঠিত খনি শ্রমিকদের নিয়ে তিনি কাজ করেছেন।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'আশ্চর্য! তিন বছর আগের কথা। আপনার তো দেখছি সব মনে আছে দাদু।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'মনে থাকবে না কেন? তুমি তো বললে সেই রাত্তিরেই তুমি মধ্যপ্রদেশ চলে যাবে।'

'হ্যাঁ,' দীপ্তেন্দু স্বীকার করল। তারপর একটা হতাশ ভঙ্গি করে জানাল,—'কিন্তু আবার সেই কলকাতাতেই ফিরে আসতে হ'ল আমাকে।'

ব্রজবিলাস শুধোলেন—'এখানে এসে উঠেছ কোথায়?'

'আমার সেই পুরানো পাথুরিয়া ঘাটার মেসে। তবে বেশিদিন হয়তো ওখানে থাকা হবে না।'

'কেন?'

'কারণ খালি সীট নেই। আপাতত একটা অবশ্য রয়েছে। তবে এক ভদ্রলোক সেটি বুক করে গেছেন। কিন্তু মাসের পনের-ষোল তারিখের আগে তিনি আসতে পারছেন না বলেই মেসের সেক্রেটারী এই কটা দিন আমাকে ওই সীটে থাকতে বলেছেন।'

ব্রজবিলাস আশ্বাস দিলেন, —'একবার যখন এসে পড়েছে তখন কলকাতার কোথাও নিশ্চয় জায়গা হবে।'

দীপ্তেন্দু কোনো উত্তর না দিয়ে ঈষৎ হাসল।

ব্রজবিলাস ফের শুধোলেন,—'এখন কী করবে ঠিক করেছ? কোনো কলেজে প্রফেসরীর চেষ্টা?'

'আজ্ঞে না।' দীপ্তেন্দু বাধা দিয়ে বলল,—'কলেজে আর চাকরি করব না। তাছাড়া এই তিন বছরে পড়াশুনোর জগতের সঙ্গে আমার একটা gap হয়ে গেছে। তবে স্বস্তির কথা এখানে এসে আমি একটা চাকরি পেয়ে গেছি।'

'চাকরি পেয়েছ?' ব্রজবিলাস সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাব মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন,—'কোথায়?'

'একটা কাগজের অফিসে।'

'খবরের কাগজে?'

'হ্যাঁ। জুনিয়র রিপোর্টার।'

'বেশ বেশ।' ব্রজবিলাস খুশি হয়ে বললেন, —'তার মানে জার্নালিস্ট?'

'ওই যা বলেন।' দীপ্তেন্দু ঈষৎ হাসল।

'কোন কাগজ?'

'কাগজটা নতুন। আপনি হয়তো নাম শুনেছেন। বঙ্গভূমি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।' ব্রজবিলাস সহাস্যে জানালেন। 'কাগজটা দেখেছি বৈকি। তবে একটু বাম-ঘেঁষা, তাই না?'

'তা হবে হয়তো।' দীপ্তেন্দু কোনো মন্তব্য না করেই বলল, —'আমি কালই জয়েন করব ভেবেছি।'

'খুব ভালো কথা। It's a new life. আমার তো মনে হয় সাংবাদিকতা তোমার ভালই লাগবে।'

দীপ্তেন্দু আগের কথার জের টেনে বলল, —'আপনার কী কথা ছিল আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। কথা আছে। অনেক কথা আছে দীপ্তেন্দু। একটু আগে তোমাকে বলেছি না তিন বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। হিমালয়ের বরফ-গলা জল। তারপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে দিতে আরো কত জলধারার সঙ্গে মিশে শেষপর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। আসলে নদীর মতো মানুষের জীবনটাও। নানা জলধারার ন্যায় তার জীবনেও কত লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যত এগিয়ে যায়, পরিচয়ের

সেই পরিধি আরো বাড়তে থাকে।'

দীপ্তেন্দু কোনো প্রশ্ন না করেই আরো কিছু শোনার জন্য কৌতূহলী হ'ল।

ব্রজবিলাস নিজেই বললেন, —'বৌমা কোথায় জিজ্ঞেস করছিলে না? মহারানী উত্তরটা না দিয়েই ভেতরে চলে গেল। বোধহয় ভাবল এই দুঃখের কথাটা আমার মুখ থেকেই শুনবে। তা আমি তো এখন বৃদ্ধ, স্থবির। অনুভূতির নার্ভগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। সুখ-দুঃখ কোনো কিছুই বোধহয় এখন আর আমাকে স্পর্শ করে না।'

দীপ্তেন্দু আর অপেক্ষা করতে না পেরে বলল, —'মাসীমা কি তাহলে?'

'হ্যাঁ। বছরখানেক আগে বৌমা হঠাৎ মারা গেল। মাত্র পনের দিন ভুগে।'

'মাসীমার কী হয়েছিল দাদু?'

'ঠিক কী হয়েছিল আমি বলতে পারব না। তবে মহারানী জানে। ও নিশ্চয় তোমাকে বলবে।'

'আর মেসোমশায়?'

'সে তার কাজকর্ম নিয়ে আছে। আগে যতক্ষণ পরিশ্রম করত এখন তার দ্বিগুণ সময় খাটে। সাধারণত সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই বাড়ি ফিরত আগে। আর এখন আটটা-সাড়ে আটটা কোনোদিন নটাও বেজে যায়। তারপর মাঝে মাঝেই অফিসের কাজ নিয়ে বোম্বাই কিংবা দিল্লী যায়। একবার গেলে পাঁচ-ছদিনের ধাক্কা। তার আগে ঘরমুখো হয় না।'

দীপ্তেন্দু বলল, —'শুনে খুব খারাপ লাগছে দাদু। এই বয়সে আপনার ওপর একটা বড়-সড় ধাক্কা।'

ব্রজবিলাস ম্লান হেসে বললেন, —'উপায় কী বলো? I am paying premiums of a long life.'

'না-না, এ কী কথা বলছেন দাদু। আর জীবনে এমন দুর্ঘটনা কত ঘটছে।'

ব্রজবিলাস বললেন, —'দীর্ঘজীবন এক হিসেবে একটা অভিশাপও বলতে পারো। তোমার চেয়ে যারা বয়সে ছোট তারা তোমার আগেই এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যাবে। আর সেই দুঃখ তোমাকে একা সইতে হবে দীপ্তেন্দু।'

ব্রজবিলাস ফের বললেন, —'আর দুঃখ যখন আসে তখন সে ঝোড়ো হাওয়ার মতো ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ে। তোমাকে আড়ালে একটা কথা জানিয়ে রাখি দীপ্তেন্দু। মহারানীর বিয়েটাও সুখের হয় নি। বৌমার মনে তাই নিয়ে একটা চাপা দুঃখ ছিল। আসলে এই বিয়েটা তো বৌমার জিদেই দিতে হ'ল। নইলে এ বাড়িতে আর কারো এতে সায় ছিল না।'

দীপ্তেন্দু বলল, —'এসব কথা থাক দাদু।'

'থাকবে কেন? যা ঘটেছে, যা সত্যি সেটাই তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। মহারানী হয়তো কোনোদিনই এই দুঃখের কথা তোমাকে বলবে না। যা জেদী মেয়ে। ভাঙবে

তবু মচকাবে না। কিন্তু আমি তো জানি দীপ্তেন্দু, কী দুঃখ নিয়ে তুমি মধ্যপ্রদেশে চলে গিয়েছিলে।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আপনার মহারানীর বিয়ে কি জলপাইগুড়িতে হয়েছে?

'ঠিকই, ধরেছ। পাত্রপক্ষ জলপাইগুড়ির লোক। বেশ অবস্থাপন্ন পরিবার। চা-বাগানে ওদের শেয়ার-টেয়ারও আছে। তারপর কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা। ছেলেটি শিবপুর থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ফ্যামিলি বিজনেস দেখাশুনো করত। সেই সুবাদে দার্জিলিং, ভুটান আর সিকিমে যাতায়াত ছিল। আর ঠিকাদারি কাজে যা হয়। সঙ্গদোষে মদে আসক্ত হয়ে পড়ে। আনুষঙ্গিক আরো হয়তো কিছু দোষ ছিল, বৌমার মুখে সেররকম একটা আভাস-ইঙ্গিত যেন আমি পেয়েছি।'

দীপ্তেন্দু শুনল। কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না।

ব্রজবিলাস বললেন, —'কলকাতায় ফিরে তুমি যে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ সেটাই আমাদের কাছে বড়ো আনন্দের দীপ্তেন্দু। আর এখানে যখন চাকরি পেয়েছ তখন মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই দেখা করে যাবে।'

'অবশ্য দাদু, সে কথা আবার বলতে হয়!'

দীপ্তেন্দু কী যেন ভাবল। তারপর বোধহয় প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যই বলল, —'আচ্ছা পরাশরদাদুর খবর কী? কেমন আছেন?'

ব্রজবিলাস সহাস্যে তাকালেন। বললেন, —'সে ভালই আছে। দু-দুবার কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচনে জিতেছে। এবারও সেটাই হবে। কারণ সিটিং মেম্বারদের ডিসটার্ব করা হবে না বলেই পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশ্য যদি অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো কারণে সে আবার প্রার্থী হতে না চায়।'

দরজার পর্দা সরিয়ে অগ্নিবীণা ভিতরে ঢুকল। তার পিছনে কাজের মেয়েটির হাতে একটা ট্রে। তাতে হিসের ওপর সাজালো পাঁচ-ছটা ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা আর দুটি রসগোল্লা।

অগ্নিবীণা ট্রে থেকে ডিশটা নামিয়ে টেবিলে রাখল। কাজের মেয়েটিকে বলল, —ময়না, চা তো চাপিয়ে এসেছি। তুমি এক জোড়া কাপ আর টি-পটটা এবার নিয়ে এসো।'

ব্রজবিলাস বললেন, —'মহারানী, আমিও একটু চা খেতে পারি।'

'তুমি তো সকালে এক কাপ খেয়েছ দাদু। এখনই আবার খাবে?' ঈষৎ হেসে অগ্নিবীণা ফের বলল, —'ঠিক আছে। হাফ-কাপ দিচ্ছি। তার বেশি কিন্তু পাবে না।'

'অগত্যা তাই। দাও হাফ-কাপ।'

দীপ্তেন্দু বলল, —'এত বেলায় পাঁচ-ছটা লুচি খেলে আর ভাত খেতে পারব?'

'খুব পারবেন। আর কটা বেজেছে এখন? বড় জোর দশটা। ছুটির দিনে আপনার খেতে বসতে নির্ঘাত সাড়ে বারোটা বাজবে।'

দীপ্তেন্দু আর কোনো প্রতিবাদ না করে আহারে মনোযোগ দিল।

অগ্নিবীণা বলল, —'দাদুর সঙ্গে গল্প শেষ করে আপনি কি এখন মেসে ফিরে যাবেন দীপ্তেন্দুদা?'

'না-না।' দীপ্তেন্দু, মাথা নাড়ল। বলল, —'এখন একবার কফিহাউসে যাব।

'কফি-হাউসে কেন? আগে যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন তারা কি আর কফি-হাউসে আছে? মৃদু হেসে অগ্নিবীণা ফের মন্তব্য করল, —'কে কোথায় ছিটকে পড়েছে!'

দীপ্তেন্দু বলল, —সবাই আছে কিনা জানিনা। তাবে একজন আছে। তার নাম সন্দীপ। ওর রেকমেণ্ডেশনেই তো বঙ্গভূমি কাগজের অফিসে চাকরিটা পেয়েছি।'

অগ্নিবীণা খুব অবাক হয়ে বলল, —'ওমা! কলকাতায় এসেই আপনি চাকরি পেয়েছেন নাকি?'

ব্রজবিলাস ঠোঁট টিপে যেন রহস্য করে হাসলেন। বললেন,—'তাহলেই বোঝ একবার। পেটে বিদ্যে আছে বলেই না বঙ্গভূমি কাগজের রিপোর্টার হতে পেরেছে।'

অগ্নিবীণা চোখ দুটি বড়ো বড়ো করে বলল, —'কাগজের রিপোর্টার। তাহলে তো আপনাকে রীতিমত সমীহ করে চলতে হবে। নইলে কখন কী লিখে দেবেন আমাদের সম্বন্ধে।'

দীপ্তেন্দু বলল—'আরে ধেৎ! আমাদের কাজটা কী তাই তো এখনও জানলাম না। আগে জয়েন করি। অন্তত একটা সপ্তাহ অফিস গিয়ে কাজের ধরনধারনটা বুঝি। তাছাড়া রিপোর্টার কি এর-ওর সম্বন্ধে যখন ইচ্ছে দু-চার ছত্র লিখে দিচ্ছে। তাই কখনও হয়?'

অগ্নিবীণা বলল, —'আপনি এখন কফিহাউসে যাবেন তো। তাহলে একটু বসুন না। আমাকেও একবার মেডিক্যাল কলেজে যেতে হবে। আমি মিনিট দশ'এর মধ্যেই তৈরি হয়ে আসছি। একসঙ্গে বেরুব।'

'তুমি মেডিক্যাল কলেজে যাবে কেন বুলু? কারো অসুখ-বিমুখ?' দীপ্তেন্দু চিন্তার সুরে শুধোল।

'না-না। ওসব কিছু নয়। চলুন না যেতে যেতে বলব।' কথা শেষ করেই অগ্নিবীণা পর্দা সরিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হ'ল।

ব্রজবিলাস দুঃখের সঙ্গে জানালেন, —'বাড়িটা কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে বুঝলে? মহারানীর বাবা দিন চার আগে বোম্বাই চলে গেল। গতকাল রাত্তিরে ট্রাঙ্ককল এসেছিল তার ফিরতে আরো কয়েকদিন দেরি হবে।'

দীপ্তেন্দু বলল, —'এখন এই বাড়িটায় একা থাকতে আপনার খুব কষ্ট হয়, তাই না দাদু?'

'সে কথা আর বলতে হয়।' ব্রজবিলাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, —'একা একাই পড়ে থাকি। মাঝে মাঝে পরাশর অবশ্য আসে। তবে মাসের বেশির

ভাগ সময়ই তাকে নিজের কনস্টিটুয়েন্সি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। দু-চার দিনের জন্য কলকাতা ঘুরে যায়। তখন সর্বাগ্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে।'

দীপ্তেন্দু বলল, —'আপনি আর বাঁকুড়া যান না দাদু? রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক কি ছিন্ন করে ফেলেছেন?'

'না-না। তোমার দুটো প্রশ্নেরই জবাব নেতিবাচক।' ব্রজবিলাস সহাস্যে কথা কইলেন। বললেন, —'বাঁকুড়া যাই তো মাঝে মাঝে। তবে পাঁচাল আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। ছান্দার থেকে পাঁচাল অব্দি রাস্তাটার যা দশা। রিকশা করে গেলেও গায়ে ব্যথা হয়ে যায়।'

'আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর?'

'বলেছি তো ওটাও নেতিবাচক। তার অর্থ রাজনীতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। তুমি হয়তো জান না আমি এখনও জেলা কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তবে শরীরের যা অবস্থা হচ্ছে দিন দিন তাতে ওটা বেশিদিন আঁকড়ে থাকতে পারব বলে মনে হয় না। ভাবছি এই নির্বাচনের পরই রেজিগনেশান দেব।'

দীপ্তেন্দু শুধোল, —'শেষ বাঁকুড়া গিয়েছিলেন ক'দিন আগে?'

'এই তো গত মাসে। দিন সাতেক ছিলাম এবার।' ব্রজবিলাস একটা হতাশ ভঙ্গি করে বললেন, —'জানো দীপ্তেন্দু, এই বাড়িটায় একা-একা পড়ে থাকতে ভালো লাগে না। অবিনাশের অবশ্য ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই। দুজন সব সময়ের কাজের লোক, এছাড়াও একজন ঠিকের কাজ করে। কিন্তু লোক থাকলেই কি সব? বাড়িতে একটা কথা বলার মানুষ নেই। মহারানী আসতে আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।'

কথার মাঝখানেই পর্দা সরিয়ে অগ্নিবীণা ঘরে ঢুকল। বলল, —'চলুন দীপ্তেন্দু দা। আমি তৈরি।' তারপর ব্রজবিলাসের দিকে তাকিয়ে বলল, —'আমার ফিরতে দেরি হলে তুমি যেন আবার না খেয়ে বসে থেকো না। আমি রান্নার মাসীকে বলে গেছি সাড়ে এগারোটা বাজলেই তোমাকে ভাত বেড়ে দেবে।'

'তোমার ফিরতে কত দেরি হবে মহারানী? তুমি ফিরলে দুজনে টেবিলে বসে একসঙ্গে খেতাম। সেটাই তো ভালো ছিল।'

'নাহ।' অগ্নিবীণা চোখ পাকিয়ে তাকাল। বলল, —'আমার ফিরতে সাড়ে বারোটা হবে। অত বেলা অব্দি তুমি কি না খেয়ে বসে থাকবে দাদু?'

'যদি তাই থাকি তাতে দোষ কি মহারানী? সময়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেই কি শরীরের ধর্ম বজায় থাকবে? তার চেয়ে দুজনের একসঙ্গে বসে খাওয়াটা কম মানসিক তৃপ্তির নাকি?'

অগ্নিবীণা হেসে ফেলল। বলল, —'ঠিক আছে। আমি বারোটার মধ্যেই ফেরার চেষ্টা করছি। তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা কোরো।'

যাবার আগে দীপ্তেন্দু ফের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল মানুষটিকে। ব্রজবিলাস তাড়াতাড়ি বললেন, —'আবার প্রণাম কেন? এই তো খানিক আগেই প্রণাম করেছ।'

দীপ্তেন্দু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, —'আপনার মতো একজন মানুষকে বারবার প্রণাম করলে পুণ্য আরো বাড়ে দাদু।'

'ধুর! এসব কী বলছ তুমি।' ব্রজবিলাস হাত তুলে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, —'আগেই বলেছি পৃথিবীতে তোমার খ্যাতি হোক। এখনও তাই বলছি,' এক মুহূর্ত থামলেন ব্রজবিলাস। তারপর দীপ্তেন্দুর মুখের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে জানালেন, —'সময় পেলেই কাজের ফাঁকে এক-আধবার চলে এসো এখানে। জানোই তো, আমি পথের দিকে চেয়ে বসে থাকি। কেউ এসে খোঁজ নিলে বড়ো আনন্দ হয় ভাই।'

অগ্নিবীণা বলল, —'তাহলে আসি দাদু। যত শীগগীর পারি ফিরে এসে একসঙ্গে খেতে বসব। কেমন?'

দরজা ডিঙিয়ে পথে নেমে দীপ্তেন্দু আর একবার ফিরে তাকাল। ব্রজবিলাস তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। কণ্ঠস্বর ঈষৎ খাটো করে অগ্নিবীণা বলল, —'ফিরে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই। যতক্ষণ না আমরা মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হচ্ছি ততক্ষণ দাদু অমনি দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

দীপ্তেন্দু বলল, —'মানুষটাকে বড়ো নিঃসঙ্গ আর একা মনে হ'ল।'

'হ্যাঁ। বার্ধক্যে এরকমই হয়। আর বুড়ো মানুষদের ওটাই তো সমস্যা। মা বেঁচে থাকতে তবু বাড়িতে একটা কথা বলার লোক ছিল। তাছাড়া তখনও শরীরটা এমন ভেঙে পড়েনি। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতেন। বিকেলে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে গল্পগুজব করতেন। সময়টা কেটে যেত।'

পাশ দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। অগ্নিবীণা হাত বাড়িয়ে সেটাকে থামতে ইঙ্গিত করতেই গাড়িটা প্রায় তার পাশে এসে দাঁড়াল।

দীপ্তেন্দু একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, —'আবার ট্যাক্সি ডাকতে গেলে কেন? কফিহাউস কিংবা মেডিক্যাল কলেজ, দুই-তো ট্রামে যেতে পারতাম।'

চোখ বড়ো বড়ো করে অগ্নিবীণা শুধু বলল, —'গাড়িতে উঠে আসুন।'

দীপ্তেন্দু বাধ্য ছেলের মতো ট্যাক্সিতে উঠে অগ্নিবীণার পাশে বসল।

শিখ ড্রাইভার মিটার ডাউন করে গাড়িতে স্টার্ট দিল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে শুধোল, —'কাঁহা যায়েঙ্গে বহিনজী?'

'বৌবাজার।' অগ্নিবীণা নির্দেশ দিল।

দীপ্তেন্দু শুধোল, —'বৌবাজারে কোথায়? সেখানে কোনো কাজ আছে তোমার?'

'আছে।' অগ্নিবীণা ছোট্ট জবাব দিল।

দীপ্তেন্দু বলল, —'আমি তাহলে প্রেসিডেন্সি কলেজের কাছে নেমে যাব।'

'নাহ্। আপনিও যাবেন সঙ্গে।'

'কিন্তু আমাকে যে সন্দীপের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। এই সময়টা

সে কফিহাউসে থাকে।'

অগ্নিবীণা হাসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, —'বেশিক্ষণ আপনাকে আটকাব না। আধঘন্টার মধ্যে ছেড়ে দেব। ছুটির দিন হলেও সন্দীপবাবু নিশ্চয় বারোটার আগে কফিহাউস ছেড়ে যাবেন না।'

রবিবার। পথঘাট ফাঁকা। শীতের রোদ নরম, নিরুত্তাপ। খোলসখসা সাপের মতো নির্বিষ। ঘন্টা বাজিয়ে একটা ট্রাম ঢিমেতালে উল্টোদিক থেকে আসছিল। গাড়ি প্রায় পাখির মতো ডানা মেলে বৌবাজারে এসে থামল।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল অগ্নিবীণা। দীপ্তেন্দুকে বলল, —'আমার সঙ্গে আসুন।'

রূপম সিনেমার উল্টোদিকে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল দুজনে। প্রায় ফাঁকা ঘরটা। সামনের দিকে জনা তিন-চার ছেলে বসে গল্প জুড়েছে। অগ্নিবীণা তাদের পাশ কাটিয়ে একেবারে পিছনের দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসল।

রেস্তোরাঁটা অপরিচিত নয় দীপ্তেন্দুরও। নামটা মনে পড়ল তার, ইন্দো-বার্মা রেস্টুরেন্ট। একবার বোধহয় রঞ্জনের সঙ্গে এখানে চা খেতে ঢুকেছিল। রঞ্জনই তাকে বলেছিল, এই রেস্তোরাঁর মালিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে বর্মাদেশ থেকে পালিয়ে আসে। কলকাতায় এসে এই রেস্তোরাঁটা চালু করে নাম দিয়েছিল ইন্দো-বার্মা রেস্টুরেন্ট। কত বছর কেটে গেল তারপর। শুধু নামটাই যা রয়ে গেছে। দীপ্তেন্দুর মনে হ'ল এই ক'বছরে রেস্তোরাঁটার যেন আরো হতশ্রী দশা। হয়তো বা এরপর কোনদিন উঠে যাবে।

একটা বুড়োমতন লোক এসে কাছে দাঁড়াতেই অগ্নিবীণা তাকে দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

দীপ্তেন্দু শুধোল, —'কী ব্যাপার বলতো? আমাকে হঠাৎ এখানে নিয়ে এলে কেন?'

'কথা আছে?' অগ্নিবীণা মুখখানা ঈষৎ গম্ভীর করে বলল।

'কী কথা?' দীপ্তেন্দু সাগ্রহে তাকাল।

অগ্নিবীণা দ্রুত তার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, —' এ কী চেহারা হয়েছে আপনার?'

'তার মানে?' দীপ্তেন্দু আরো কিছু শোনার জন্য জিজ্ঞাসু হ'ল।

অগ্নিবীণা খানিকটা সহানুভূতি, খানিকটা দুঃখের সঙ্গে বলল, —'আয়নায় নিজের মুখখানা বোধহয় অনেকদিন দেখেন নি।'

'দেখব না কেন? কী যে বলো। এই তো আজই—' দীপ্তেন্দু সপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে সচেষ্ট হ'ল।

অগ্নিবীণা ভুরু তুলে বলল, —'এই তিন বছর আপনি কোন হতচ্ছাড়া জায়গায় ছিলেন?'

'কেন? মধ্যপ্রদেশে। তবে একটা জায়গায় নয়। যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই গিয়েছি।'

অগ্নিবীণা হঠাৎ বলল, —'আচ্ছা, মাধুরীবৌদি মারা গেলেন বলেই কি আপনি কলকাতা ছাড়লেন?'

'ধুর। তা কেন হবে?' দীপ্তেন্দু কী যেন চিন্তা করল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, —'আসলে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর আর কিছুই ভালো লাগছিল না বুলু। তারপর দাদুর কাছে শুনলাম তোমার নাকি অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে। তাহলে কলকাতার ওপর আর কী আকর্ষণ রইল বলো?'

অগ্নিবীণা যেন দপ করে জ্বলে উঠল। বলল, 'আমি জানতাম এই প্রশ্নটা আপনি নিশ্চয় একদিন আমাকে করবেন।'

দীপ্তেন্দু অনুত্তেজিত কণ্ঠে জানাল, —'যদি করে থাকি তাহলে সেটা কি খুব দোষের হয়েছে বুলু?'

অগ্নিবীণা মাথা নাড়ল। বলল, —'নাহ্। দোষের বলতে পারব না। কিন্তু তখন এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না দীপ্তেন্দুদা। আপনার জেল হবার খবর বাড়িতে আসার পর থেকেই আমার বিয়ের জন্য মা উঠে-পড়ে লাগল। তখনও আমার হাউস-স্টাফ পিরিয়ড কমপ্লিট হয় নি। বছরখানেক কিংবা হয়তো আর কিছুদিন বেশি হয়েছে, নইলে আমার তো ইচ্ছে ছিল তিন বছর হাউস স্টাফ থাকার পর জি. অ্যাণ্ড ও'র জন্য এম.এস. পরীক্ষায় বসব।'

'জি. অ্যাণ্ড ও মানে?'

'গাইনি অ্যাণ্ড অবস্টেরিকস। আমাদের তখন তাই নিয়ম ছিল। তিন বছর হাউস-স্টাফ থাকার পর হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট রেকমেণ্ড করলে পোস্ট-গ্রাজুয়েট পরীক্ষায় বসতে পারি।'

দীপ্তেন্দু কোনো কথা বলছে না দেখে অগ্নিবীণা আবার বলল, —'আমি বিয়ে করতে রাজী নই জেনে মা প্রায়োবেশন শুরু করল। আসলে আমি যে কেন বিয়েতে অমত করছি মা নিশ্চিত সেটা বুঝতে পেরেছিল। কী বিশ্রী অবস্থা তখন বাড়িতে। মা প্রায় অন্নজল ত্যাগ করে বসে আছে। এদিকে বাবার এক বন্ধু জলপাইগুড়ির ওই সম্বন্ধটা বাড়ি বয়ে নিয়ে এলো। ছেলেটি ইঞ্জিনিয়র শুনে বাবাও বোধহয় একটু নরম হ'ল।

'আর দাদু?' দীপেন্দু ওই সৎ নির্লোভ মানুষটির মতামত শোনার জন্য সাগ্রহে তাকাল।

'দাদু কি আপনাকে কিছু বলেন নি?'

'হ্যাঁ। বলেছেন বৈকি। তিনি নাকি মায়ের অমতেই তোমাকে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি করেছিলেন। তারপর মেডিক্যাল কলেজে তোমাকে পড়ানোর ব্যাপারেও তার নাকি ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু ওই দুটি বিষয়ে তোমার মায়ের মতামতকে অগ্রাহ্য

করলেও বিয়ের ব্যাপারে মা বাবার অভিমতকে উড়িয়ে দিয়ে তার মহারানীকে আমার হাতে তুলে দিতে তিনি সম্মত হন নি। তাই নাকি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মা-বাবার পছন্দ-করা পাত্রের গলায় মালা দিতে তোমাকে রাজী করিয়েছেন।'

'হ্যাঁ দীপ্তেন্দুদা, দাদু আমার কাছে একটি কথাও গোপন করেন নি। ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে কারাবাসের আদেশ না দিলে হয়তো এর একটা উপায় হ'ত। কিন্তু জেল-ফেরৎ একটা ছেলের হাতে মা কিছুতেই তার মেয়েকে সর্মপণ করবে না বলে গোঁ ধরে বসে রইল। আপনি হয়তো বলবেন ডাক্তারি পাশ-করা একটি মেয়ের কাছ থেকে আর একটু সাহস কি আশা করা যেত না? কিন্তু বাড়ির পরিস্থিতি তখন যে কী ছিল তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। সত্যি বলতে আমার সামনে তখন দুটো রাস্তা খোলা ছিল। এক মায়ের প্রস্তাবে সায় দেওয়া। নইলে অন্নজল প্রায় ত্যাগ করে মা যে পথে এগোচ্ছিল তাকে আত্মহনন ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।'

'আর তোমার দ্বিতীয় পন্থাটি কী?'

'দ্বিতীয়পন্থা হ'ল মায়ের ইচ্ছেটা নস্যাৎ করে কোথাও চাকরি-বাকরি নিয়ে চলে যাওয়া। কিংবা মনের দুঃখ চাপতে একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু করে বসা। আর সেটা করলে আর একজন মানুষ বোধহয় সাতটা দিনও বাঁচত না। দাদুর কথা ভেবেই আমি আর অমত করতে পারিনি দীপেন্দুদা।'

অগ্নিবীণা চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল, —'মা বোধহয় শেষ পর্যন্ত তার ভুলটা বুঝতে পেরেছিল। জিদের বশে এই বিয়েটা দিলেও দু-পক্ষে যে মিলমিশ হয়নি সেটা একমাস না যেতেই মা টের পেল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই মাকে বলতে শুনেছি, মেয়েটার জীবন নিয়ে আমি বোধহয় ছিনিমিনি খেললাম। বড় ঘরে-বরে বিয়ে দিতে গিয়ে আমার লাভের অঙ্কটা শূন্যে গিয়ে দাঁড়াল।'

দীপ্তেন্দু শুধোল, —'মাসীমার কী হয়েছিল বুলু? হঠাৎ মারা গেলেন।'

অগ্নিবীণা বলল, —'অসুখটা অনেকদিন আগে থেকেই মায়ের শরীরে বাসা বেঁধেছিল। পেটের বাঁ দিকে প্রায় একটা ব্যথা হ'ত। আমাদের মধ্যবিত্তের সংসারে বৌ-ঝিদের অবস্থাটা বোঝেন তো? শরীর খারাপ হলেও তারা মুখ ফুটে একটি কথা বলে না। অসুখ যদি এমনি সেরে যায় তো ভালো নইলে যা হবার সেটা ঘটলেই বা কী করার আছে? মাঝে মাঝে মায়ের পেটের এই যন্ত্রণাটা খুবই বেড়ে যাচ্ছিল। আমি নিজে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী হলেও মাকে একদিনও হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারিনি। মায়ের একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল। বড়ো ডাক্তারকে দেখালেই রোগ আরো বেড়ে যায়। নইলে হাসপাতালে কত বড়-বড় সার্জন। তাদের কাউকে ধরলেই মায়ের চিকিৎসার নিশ্চয় একটা সুরাহা হ'ত।'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত অসুখটা কী ধরা পড়ল?'

'যখন ধরা পড়ল তখন আর কিছুই করবার ছিল না। একদিন বেশ বাড়াবাড়ি

হবার পর জোর করে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যেতেই সার্জন অপারেশান করা ছাড়া অন্য উপায় নেই জানিয়ে দিলেন।'

দীপ্তেন্দু মুখ তুলে তাকাতেই অগ্নিবীণা ফের বলল, —'একটা কথা জানেন দীপ্তেন্দুদা? মা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার কী হয়েছে রে? সব জেনে আমি একটি কথাও মাকে বলতে পারিনি। কোন রোগে মায়ের শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হ'ল এ কথাটা মা কোনোদিন জানতেও পারল না।'

দীপ্তেন্দু নিষ্প্রাণ কণ্ঠে শুধোল, —'অসুখের কথাটা কেন জানাওনি?

'তার কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম মা আর বাঁচবে না।'

'সার্জন কি তোমাকে তাই বলেছিলেন?'

'ধুর! ডাক্তার কি কখনও সে কথা বলে? কথায় আছে না যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। রুগীকে নিয়ে ডাক্তারদের চিন্তাধারা অনেকটা এ রকম। পেশেন্ট বাঁচবে না জেনেও তারা অন্তিম সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন সেটা বুঝতে পেরে বিচারকের রায় দেবার ঢঙে মৃত্যু আসন্ন বলে ঘোষণা করে।'

'তাহলে অপারেশান করেও মাসীমাকে বাঁচান গেল না?'

'নাহ্। হয়তো আর কিছু দিন আগে হ'লে ব্যাপারটা ম্যালিগন্যান্সিতে গড়াত না।'

'ম্যালিগন্যান্সি? কিসের ম্যলিগন্যান্সি?

'বলছি।' অগ্নিবীণা ম্লান হাসল। শান্ত অনুত্তেজিত গলায় জানাল, —'আসলে অনেকদিন আগেই মায়ের বাঁ দিকের ওভারির ওপর দু-ইঞ্চি সিস্ট্ তৈরি হয়েছিল। ক্রমে সেটা বাড়তে বাড়তে দু-ইঞ্চি বাই আড়াই ইঞ্চি সাইজের হয়ে দাঁড়াল। ডাক্তারি মতে যে কোনো গ্রোথ বা টিউমার শরীরের পক্ষে বেশিদিন ভালো নয়। অপারেশান করে তাকে সমূলে বিদায় না করলে একদিন সেটাই ম্যালিগন্যান্ট হয়ে দাঁড়াবে। আর জানেন নিশ্চয়ই ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ্ মানেই ক্যানসার।'

'তাহলে মাসীমা ক্যানসারে মারা গেলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু অসুখটা যে কী একথা মাকে কোনোদিন বলিনি। যেদিন সকালে মা মারা গেল সেদিনও কেউ তাকে রোগেব কথাটা জানায়নি।'

দীপ্তেন্দু নির্বাক বসে ছিল। কোনো মন্তব্য করেনি।

অগ্নিবীণা বলল, —'মেডিক্যাল কলেজের সার্জনের অবশ্য কিছু করার ছিল না। কারণ মাকে যখন হাসপাতালে ট্রান্সফার করা হ'ল তার আগেই মেটাস্থেসিস্ শুরু হয়ে গেছে। এক্স-রে প্লেটে ধরা পড়েছিল ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলো লাংসে হাজির হয়েছে। তাই অপারেশানটা বোধহয় না করলেই ভালো ছিল।'

'এটা কেন বলছ?'

'কারণ ছুরি বসাতেই মৌচাকে খোঁচা দেওয়ার মতো ক্যানসার সেলগুলো চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ল।'

দীপ্তেন্দু হঠাৎ শুধোল, —'তোমার ঘড়িতে কটা বাজল?'

হাতঘড়িটার দিকে একনজর তাকিয়ে অগ্নিবীণা বলল, —'সওয়া এগারোটার মতো। আপনাকে নিশ্চয় এখন কফিহাউসে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ। সন্দীপের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।'

'ঠিক আছে।' অগ্নিবীণা হেসে জানাল, —'তাহলে আজ ওঠা যাক।'

'হ্যাঁ। তুমি এখন আছ তো কলকাতায়?'

'আপাতত বেশিদিন নয়। ধরুন আরো দিন দশ-বারো। তারপর জলপাইগুড়ি ফিরে যেতে হবে।'

দীপ্তেন্দু শুধোল, —'মেডিক্যাল কলেজে যাচ্ছ কেন? সে কথা তো বলনি।'

'বলেছি।' অগ্নিবীণা রহস্য করে কথা কইল।

'কখন বলেছ?'

'বারে! বলিনি আপনাকে যে আমার হাউস স্টাফশিপ কমপ্লিট করা হয় নি।'

'তুমি কি এখন আবার হাউসস্টাফ হতে চাও?'

'হ্যাঁ,' অগ্নিবীণা তার মুখের দিকে তাকাল। বলল, —'তিন বছর হাউস স্টাফশিপ কমপ্লিট না করলে গাইনি আর অবস্টোরিকসের পোস্ট-গ্রাজুয়েট পরীক্ষাটা যে দিতে পারব না।'

'ওহ! বুঝতে পেরেছি' দীপ্তেন্দু ঈষৎ হাসল। বলল, —'তুমি তাহলে গাইনি আর অস্টোরিকসে এম.এস হতে চাইছ?'

'হ্যাঁ দীপ্তেন্দুদা। ডাক্তারি যখন পাশ করেছি তখন যতদূর পারি বিদ্যেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব।'

একটু ভেবে দীপ্তেন্দু প্রশ্ন করল, —'জলপাইগুড়িতে তুমি প্র্যাকটিস কর নাকি?

'না-না। প্র্যাকটিশ করব কেন? তবে কাছাকাছি চা-বাগানের একটা হাসপাতালে আমি ভিজিটিং মেডিক্যাল অফিসার। তার জন্য অবশ্য ওরা আমাকে একটা অ্যালাউন্স দেয়।'

'কিন্তু গাইনি আর অবস্টোরিকসে এম. এস হতে গেলে তোমাকে কলকাতায় অনেকদিন থাকতে হবে বুলু, তাই না?'

'সে তো নিশ্চয়। হাউস-স্টাফশিপটা কমপ্লিট করতেই তো বছর দুই লেগে যাবে। তারপর পরীক্ষায় বসব। এক চান্সে উতরে যাব এমন ভরসা হয় না। তখন আর একটা চান্স নিতে হবে।'

'মেডিক্যাল কলেজে তুমি এর জন্যই যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। আমার এক ব্যাচ-মেট গত বছর গাইনি আর অবস্টোরিকসে এম. এস. করেছে। জলপাইগুড়ি থেকে ওকে চিঠি লিখেছিলাম। তার জবাবে সে জানিয়েছে যে গাইনি ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর-প্রফেসর ইচ্ছে করলেই আমাকে হাউস-স্টাফশিপ কমপ্লিট করবার সুযোগ দিতে পারেন। আর সে জন্যই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

দীপ্তেন্দু বলল, —'কিন্তু এতদিন ধরে তুমি কলকাতায় পড়ে থাকবে, সেটা

তোমার স্বামী কিংবা শ্বশুররবাড়ির লোকেরা পছন্দ করবে তো?'

'না করাই স্বাভাবিক।' অগ্নিবীণা ঈষৎ হাসল। বলল, —'মেয়েদের ওপর পুরুষেরা চিরকালই কর্তৃত্ব করে এসেছে। আর স্বামী মাত্রেই এটাকে তার সহজ অধিকার বলে মনে করে। স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব ফলানোটা যেন স্বামীর একটা brith right. আপনি কি বলেন দীপ্তেন্দুদা?'

'বারে! আমি আবার কী বলব? আর আমি তো এখনও স্বামী হইনি। স্ত্রী কেমন হয়, তার সঙ্গে স্বামীর কী সম্পর্ক এসব তো আমার কাছে এক অজানা জগৎ।'

অগ্নিবীণা অপাঙ্গে একবার দেখল তাকে। কেমন অদ্ভুত হেসে বলল, —'আজ না হোক, একদিন তো স্বামী হবেন।'

দীপ্তেন্দু ঈষৎ রহস্য করে বলল, —'তাও কি জোর করে বলা যায়? হয়তো জীবনে কোনোদিনই স্বামী হবো না।'

অগ্নিবীণার মুখখানা হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। বলল, —'তার মানে? আপনি কী ভেবেছেন বলুন দিকি? কোনোদিন বিয়ে-থা করবেন না।'

দীপ্তেন্দু হেসে ফেলল, একটা হতাশ ভঙ্গি করে জানাল, —'আচ্ছা, কে আমাকে বিয়ে করবে বল দিকি? চাল নেই, চুলো নেই। এখনও বেকার। কাল থেকে অবশ্য একটা চাকরিতে জয়েন করছি। বঙ্গভূমি কাগজের অফিসে মাইনে সওয়া'শ টাকা আর ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স পঞ্চাশ টাকা। ব্যাঙ্কে কিংবা পোস্টঅফিসে একটা কানাকড়ি নেই। তাহলেই আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ তো বুলু? এখন বিয়ে করতে চাই শুনে লোকে বলবে, কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার সাধ হয়েছে।'

অগ্নিবীণার চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। বলল, —'না-না। অমন করে বলবেন না দীপ্তেন্দুদা। আমার কষ্ট হয়। আর দিন কি কখনও একরকম যায়? দাদু বলেন চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি-দুঃখানি চ। আপনার নিশ্চয় সুদিন আসবে। আর একটা কথা জানবেন।'

অগ্নিবীণা সহসা নীরব হয়ে গেল।

'কী কথা?' দীপ্তেন্দু শুধোল, —'থামলে কেন বুলু ব'ল।'

অগ্নিবীণা মুখ নীচু করে বলল, —'আপনি বিয়ে-থা করে জীবনে সুখী না হলে আমি চিরদিন নিজেকে অপরাধী বলে মনে করব। বাউন্ডুলে হয়ে আজ মধ্যপ্রদেশ, কাল কলকাতা, তারপর একদিন অন্য কোনো রাজ্যে দু-মুঠো অন্নের জন্য পড়ে আছেন জানলে আমার মনের মধ্যে একটা পাথর চেপে বসে থাকবে। মরেও শান্তি পাব না।'

'ওসব কথা এখন থাক।' দীপ্তেন্দু হেসে পরিবেশটা লঘু করতে প্রয়াসী হ'ল। বলল, —মেডিক্যাল কলেজ এসে গেছে। যাও ডিরেক্টর-প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলে এস। উনি তোমাকে হাউস স্টাফশিপ দিলে এখন তোমাকে কলকাতাতেই থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ। অবশ্য যদি আমার হাজব্যাণ্ড বা শ্বশুর-বাড়ি প্রবল আপত্তি না তোলে।'

'আপত্তি করবে আগে থেকে তাই বা ধরে নিচ্ছ কেন? সময় ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে বুলু। ভবিষ্যতের কথা কেউ জানে না। None can predict your future. Whatever will be, will be.'

অগ্নিবীণা মেডিক্যাল কলেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, —'সামনের রবিবার আসুন না আমাদের বাড়িতে। দুপুরে খাবেন। বাবার সঙ্গেও হয়তো আপনার দেখা হবে। আর আপনি এলে দাদু খুব খুশি হন জানবেন।'

'জানি।' দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে তাকাল। বলল, 'রবিবার পর্যন্ত তুমি নিশ্চয়ই কলকাতায় আছ?'

'আমি না থাকলে বুঝি ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে আর যাবেন না?' অগ্নিবীণা চোখ নাচিয়ে মুচকি হাসল।

'কেন যাব না? কী যে বল।' দীপ্তেন্দু লজ্জা ঢাকতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

অগ্নিবীণা তার অপ্রস্তুত মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলল, —'ঠিক আছে। তাহলে কথা রইল। রবিবার সকালে আসবেন। আমি আজই বাড়ি ফিরে দাদুকে জানাচ্ছি।'

মেডিক্যাল কলেজ পেরিয়ে ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে কফিহাউসের দিকে হাঁটতে লাগল দীপ্তেন্দু। দোতলায় হল ঘরটার মুখে পৌঁছাতেই সন্দীপ তাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল,' —'হ্যালো রিপোর্টার We are here.'

সন্দীপ একা নয়। দুটো টেবিল জুড়ে প্রায় সাত-আটজন ছেলে চতুর্দিকে বসে। সামনে কফির কাপ। কোনোটা নিঃশেষ, কোনোটার ভিতর এখনও খানিকটা তরল পড়ে আছে।

দীপ্তেন্দু কাছে যেতেই সন্দীপ বলল, —'খবর পেয়ে গেছি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এখন আপনার হাতে।'

দীপ্তেন্দু হাসল শুধু। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সন্দীপের পাশে বসল। বলল, —'ভাবছি, কালই জয়েন করব।'

'নিশ্চয়।' সন্দীপ সোৎসাহে কথা কইল। তারপর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে তাকিয়ে বলল, —'পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি দীপ্তেন্দু চ্যাটার্জী। একসময় ইউনির্ভাসিটি ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বলতে আপত্তি নেই আমাদের নমিনেশনেই ওকে জিতিয়ে এনেছিলাম।'

দীপ্তেন্দু হাত তুলে সকলকে নমস্কার জানাল।

সন্দীপ বলল, —'আপাতত ইনি বঙ্গভূমি কাগজের রিপোর্টার। আপনাদের কোনো খবর-টবর ছাপাবার প্রয়োজন থাকলে সোজা এঁর কাছে চলে যাবেন। ওঁর পক্ষে সম্ভব হলে উনি নিশ্চয়ই সেটা করবেন।'

সন্দীপ কখন ইঙ্গিতে এক কাপ কফির কথা বলে দিয়েছে দীপ্তেন্দু তা বুঝতে পারেনি। মিনিট খানেক বাদেই একজন বেয়ারা এসে তার সামনে ঠক করে একটা

কফির পেয়ালা রেখে গেল। ওটা যে তারই জন্য সেটি বুঝতে পেরে দীপ্তেন্দু পেয়ালায় চুমুক দিল।

সন্দীপ বলল, —'সময় পেলেই এক চটকা ঘুরে যাবেন কফিহাউসে। বিকেলের দিকে কিংবা সন্ধ্যের পর আমাকে নিশ্চয় পাবেন। শুধু রবিবার ছাড়া। ওই দিন সকালের দিকটা অবশ্য থাকি। বেলা একটা নাগাদ কেটে পড়ি।'

আরো আধঘন্টা কফিহাউসে কাটিয়ে দীপ্তেন্দু উঠল। বলল, —'চলি আজ তাহলে, পরে আবার দেখা হবে।'

সন্দীপ বলল, —'প্রয়োজনে আমাকেও বঙ্গভূমি কাগজের অফিসে কখনও যেতে হয়। গেলে নিশ্চয় আপনার খোঁজ করব।'

পাথুরিয়াঘাটার মেসে দীপ্তেন্দু যখন এসে পৌঁছল তখন প্রায় একটা বাজে। ঠাকুর তাকে দেখেই একগাল হেসে বলল, —'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি বাবু। যান, চান-টান সেরে তাড়াতাড়ি বসে পড়ুন। আমি ভাত বেড়ে নিয়ে আসছি।'

মেসবাড়িটা আজ ফাঁকা। রবিবার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোক কাছাকাছি দেশের বাড়িতে চলে যায়। দুটো রাত্তির স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার সকালে ফিরে আসে। এই দুটো দিন সাকুল্যে আট-দশ জন বোর্ডার থাকে। ঠাকুরেরও রান্নার ঝামেলা কম। যে ক'জন বোর্ডার থাকে তাদের খাইয়ে দিতে পারলেই ছুটি।

দীপ্তেন্দু নরম গলায় বলল, —'আমার একটু দেরি হয়ে গেল, তাই না ঠাকুর?' নইলে কখন তুমি হেঁসেল তুলে দিয়ে বাড়ি চলে যেতে পারতে।'

'দেরি কোথায় হ'ল বাবু? এই তো একটা বাজল। আমি ঠিক দুটোর মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব।'

পরদিন বেলা দুটো নাগাদ দীপ্তেন্দু বঙ্গভূমি কাগজের অফিসে গিয়ে পৌঁছল। সম্পাদক রতিকান্ত বসুর চিঠিতে সেরকমই নির্দেশ ছিল। শ্লিপ পাঠাতেই সম্পাদক তাকে তখুনি ডাকলেন। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, —'আরে আসুন আসুন। আমি তো আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি।'

রতিকান্তবাবু কোনো ভনিতা না করেই বললেন, —' আমি চিফ রিপোর্টারের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিযে দিচ্ছি। ওঁর কথা মতো এখন কাজ করবেন। আপাতত দিন পনের ট্রেনিং হোক। তারপর আপনাকে independent কাজ করবার চান্স দেওয়া যাবে।'

সম্পাদক বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে চিফ রিপোর্টারকে তলব করলেন। মিনিট দুই-তিন পরে এক ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকতেই সম্পাদক বললেন, —'সুধাময় বাবু, ইনি আপনার নতুন ছাত্র। দেখুন গড়ে পিটে তৈরি করা যায় কি না।'

চিফ রিপোর্টারের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেশ চড়া কালো রঙ। পরনে সাদা প্যান্ট, সাদা জামা। মাথার চুল ঈষৎ কোঁকড়া।

রতিকান্ত বাবু ফের বললেন, —'দিন পনের কারো সঙ্গে attach করে রাখুন। মোটামুটি রোজই যেখান থেকে খবর সংগ্রহ করা হয়—যেমন রাইটার্স বিল্ডিং, লালবাজার বিট, ভবানী ভবন বিট, করপোরেশন বিট, আরো যে সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে টেলিফোনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শিখুক। তারপর নিজেই সব বুঝে নিতে পারবে। তাহলে দীপ্তেন্দুবাবু, আপনি ওর সঙ্গে যান।'

চিফ রিপোর্টার সুধাময়বাবু বেশ রাশভারী লোক। তার পিছু-পিছু দীপ্তেন্দু রিপোর্টাস রুমে গিয়ে ঢুকল। একপাশে রাখা একটা যন্ত্রে টাইপের মতো খটাখট করে কী যেন লেখা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে একজন লোক খানিকটা লেখা একটানে ছিঁড়ে নিয়ে কাছেই একটা ডেস্কের ভিতর জমা দিচ্ছিল। প্রায় হলঘরের মতো লম্বা ঘরটায় অন্তত বারোজন লোক বসে কাজ করছে। তার মধ্যে দুজন মহিলা।

চিফ রিপোর্টার সুধাময়বাবু একজন ভদ্রমহিলাকে ডেকে বললেন, —নীলিমা, ইনি আজ থেকেই এখানে জয়েন করছেন। আমাদের হাজিরা খাতাটায় ওঁর নাম লিখে নিন। আর আপাতত উনি আপনার কাছেই কাজকর্ম শিখবেন। দু-চারদিন আপনার সঙ্গে নিয়ে বেরোবেন। সম্পাদক বললেন, —দিন পনের পরে ওকে independent কাজ দেওয়া হবে।'

ভদ্রমহিলার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। মিষ্টি হেসে তিনি দীপ্তেন্দুকে সঙ্গে করে তাকে পাশের একটা চেয়ারে বসতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, —'খবরের কাগজের অফিসে এর আগে কাজ করেছেন?'

'নাহ্? দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল।

ভদ্রমহিলা তাকে সাহস দিয়ে বললেন, —'তাতে কিছু যায় আসে না। রিপোর্টারের কাজ আপনি মাসখানেকের মধ্যেই রপ্ত করে ফেলবেন। আমি শুনেছি আপনি ইতিহাসের এম.এ.। কলেজে পড়িয়েছেন। তাহলে আবার চিন্তা কিসের? এসব কাজ শিখতে আপনার পনের দিনও লাগবে না।'

ভদ্রমহিলার নাম নীলিমা দত্ত। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। অনর্গল কথা বলতে পারেন। অফিসের সবাই তাকে নীলিমাদি বলে ডাকছে শুনে দীপ্তেন্দুও তাকে ওই নামে ডাকতে শুরু করল। কাগজের অফিসের কাজকর্ম কীভাবে চলে নীলিমাদি তাকে সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান দিলেন। ওই যে যন্ত্রটায় খটাখট শব্দ করে কী যেন টাইপ হয়ে যাচ্ছে, ওটার নাম টেলিপ্রিন্টার তারপর সংবাদ এলেই সেটা ছিঁড়ে যে বাক্সটায় রাখা হচ্ছে ওটার নাম নিউজ ডেস্ক। ওখান থেকেই সংবাদ বেছে নিয়ে পরদিনের কাগজের জন্য সাজানো হয়।

নীলিমা দত্ত তাকে বললেন, —'এই ঘরটার অর্ধেকটা সাব-এডিটরদের জন্য। বাকি অর্ধেকটায় আমরা মানে রিপোর্টাররা বসি। লোক্যাল নিউজ সাধারণত রিপোর্টাররা তৈরি করে দেন। টেলিপ্রিন্টারে যে সব খবর আসে তার বেশির ভাগই দেশের বাইরে কিংবা সীমান্তের। এই নিউজ বাছার দায়িত্ব চিফ সাব-এডিটরের।

ফরেন নিউজ কিংবা দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে যে খবর আসে সেগুলো পাঠায় P.T.I, U.N.I অথবা রয়টার। আর কাগজে যে সব ছবি ছাপা হয় দেখেছেন ওগুলো বেশির ভাগই আসে কুরিয়ারে P.T.I অফিস থেকে। আর স্থানীয় কোনো ঘটনার ছবি আমাদের ফটোগ্রাফারই তুলে আনে।'

শনিবার আসতেই দীপ্তেন্দুর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। আগামীকাল সকালেই সে অগ্নিবীণাদের বাড়ি যাবে। দুপুরে সেখানে তার খাওয়ার নেমন্তন্ন। এক সময় তার মনে হল, তিন-তিনটে বছর বুলুকে না দেখে এতদিন সে ছিল কেমন করে? আর এখন একবার দেখা হতেই মাত্র সাত দিনের অদর্শনের ব্যথায় সে কী অস্থির না হয়ে উঠেছে।

তাকে আসতে দেখেই ব্রজবিলাস অভ্যর্থনা জানালেন, —'এস. এস. দীপ্তেন্দু। সেদিনই তোমাকে রবিবারে আসতে বলা উচিত ছিল আমার। কেন জানিনা সব গোলমাল হয়ে গেল।'

অগ্নিবীণার বাবা অবিনাশ কাকা তাকে দেখে বললেন, —'তিন-তিনটে বছর কোথায় যে তুমি ডুব দিয়ে রইলে। কত জায়গায় যে তোমার খোঁজ করেছি। এমন কি মধ্যপ্রদেশেও বাকি রাখিনি। কিন্তু কারো কাছেই তোমার ঠিকানা পেলাম না।'

অগ্নিবীণার সঙ্গে দেখা হতেই দীপ্তেন্দু শুধোল, —'কী? তোমার ডিরেক্টর-প্রফেসর শেষপর্যন্ত রাজী হলেন তোমাকে হাউস-স্টাফশিপ দিতে?'

'হ্যাঁ। বললেন, হাউস-স্টাফশিপ তখনই তোমার কমপ্লিট করে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে অনেক আগেই গাইনি অ্যাণ্ড অবস্টোরিকসের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা দিতে পারতে।'

ব্রজবিলাস শুনে বললেন, —'মহারানী তো মঙ্গলবারই জলপাইগুড়ি ফিরে যাচ্ছে দীপ্তেন্দু। এখন ওর স্বামী আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি রাজী হয়, তাহলেই কলকাতায় এসে হাউস স্টাফশিপটা নিতে পারবে।'

দীপ্তেন্দু বলল, —'একটু বুঝিয়ে বললেই নিশ্চয়ই তাঁরা রাজী হবেন। আপনি বরং অগ্নিবীণার স্বামীকে আলাদা করে একটা চিঠি লিখে দিন না দাদু।'

'না ভাই।' ব্রজবিলাস মাথা নাড়লেন। বললেন, —'এসব বিষয়ে তৃতীয়পক্ষের নাক গলানো উচিত হবে না। বরং মহারানী নিজেই বুঝিয়ে বললে হয়তো কাজ হতে পারে।'

অগ্নিবীণাকে আড়ালে পেয়ে দীপ্তেন্দু বলল, —'মঙ্গলবার কখন ট্রেন তোমার?'

'খুব ভোরে। সকাল ছটায় ট্রেন। বিকেল চারটে নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে যাব।'

'তোমাকে কেউ ট্রেনে তুলে দিতে স্টেশনে যাবে?'

'কে আবার যাবে? বাবা তো আগামীকাল দুপুরেই উড়িষ্যা চলে যাচ্ছে। আর ওই বুড়ো মানুষটাকে কি এই কাকডাকা ভোরে স্টেশনে নিয়ে যেতে পারি? যদি ঠাণ্ডা লেগে বুকে কফ জমে যায়?'

দীপ্তেন্দু বলল, —'তোমাকে সী-অফ করতে আমি স্টেশনে যাব।'

'আপনি? ভোরবেলায় অতদুর থেকে আসবেন?'

'হ্যাঁ। যদি কলকাতায় হাউস স্টাফশিপটা নিতে তোমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা আপত্তি করে তাহলে তো আর এখনই দেখা হচ্ছে না বুলু। তাই স্টেশনে একবার তোমাকে দেখে আসব।'

দুপুরে ভুরিভোজনের পর দীপ্তেন্দু বিদায় নিল। অবিনাশ বললেন, —'এ বাড়ির এখন নিঃসঙ্গ দশা। বাবা একাই থাকেন। আমি তো কাজে কর্মে ঘুরে বেড়াই। একটা কথা বলার লোক পর্যন্ত নেই। পারলে তুমি বরং মাঝে মাঝে এস. দীপ্তেন্দু। বাবা খুব আনন্দ পাবেন।'

চোখের ইঙ্গিতে তাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অগ্নিবীণা বলল, —'তাহলে শেয়ালদা স্টেশনে আসছেন তো? মনে রাখবেন, ছটায় ট্রেনে ছেড়ে দেয়।'

'নিশ্চয়। তোমার কি রিজার্ভেশান করা আছে?'

'হ্যাঁ। চেয়ার কারে বাবা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠলেই হ'ল।'

দীপ্তেন্দু বলল, —'আমি তাহলে আসি। মঙ্গলবার দেখা হচ্ছে।'

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বিরাট এক অজগর সাপের মতো ট্রেনটা দাঁড়িয়ে। একটা উইণ্ডো সীটে অগ্নিবীণা বসেছিল। দীপ্তেন্দু প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, —'ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র দশ মিনিট দেরি। টাইমে যে পৌঁছতে পেরেছি, এই ঢের।'

দীপ্তেন্দুর গায়ে একটা পাতলা সোয়েটার। চাদর পর্যন্ত নেই। সে প্রায় কাঁপছিল। তার ওই অবস্থা দেখে অগ্নিবীণা বলল, —'ইস্! ভোর বেলায় বেশ ঠাণ্ডা থাকে। এই পাতলা সোয়েটারটায় কি শীত কাটে?'

'কেন কাটবে না? তুমি বস তো চুপ করে। বরং তোমর সঙ্গে দুটো কথা বলি বুলু।'

'তার আগে আমার একটা কথা শুনবেন।'

'কী?'

'এই মাসের মাইনে পেলেই অন্তত দুখানা জামা আর ধুতি কিনে নেবেন। সম্ভব হলে একজোড়া জুতোও।'

'সব হবে। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বলতো! বরং শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খোসামোদ করে হাউস-স্টাফশিপটা কমপ্লিট করতে কলকাতায় চলে এস।'

অগ্নিবীণা মুখ তুলে একবার তাকাল। ভালো করে দেখল তাকে। অনুচ্চকণ্ঠে শুধোল, —'আমি হাউস স্টাফশিপ নিলে আপনার কী লাভ দীপ্তেন্দুদা?'

দীপ্তেন্দু নীরব রইল। কোনো কথা বলল না।

অগ্নিবীণা ফের বলল, —'আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব দীপ্তেন্দুদা?

'কী কথা?'

'আপনি খুব ভালাবাসেন আমাকে, তাই না?'

'তোমার কী মনে হয় বুলু?' দীপ্তেন্দু গাঢ় কণ্ঠে শুধোল।'

মুখটাা নামিয়ে অগ্নিবীণা বলল, —'পরস্ত্রীকে কিন্তু ভালবাসতে নেই।' তারপরই সে হাত বাড়িয়ে দীপ্তেন্দুর ডানহাতের আঙুলগুলি তার হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিল।

ট্রেনটা হুইসিল দিয়ে ছাড়তেই দীপ্তেন্দু কয়েক পা এগিয়ে গেল। গাড়ি ছাড়ার হ্যাঁচকা টানে অগ্নিবীণার হাতের মুঠিটা শিথিল হয়ে কখন তার হাতের ওপর থেকে সরে গিয়েছে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপসৃয়মাণ ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে দীপ্তেন্দু লক্ষ করল অগ্নিবীণার বড়ো বড়ো দুই চোখে দু-ফোঁটা জল টলমল করছে।

॥ চার ॥

দিন দশ-বারো পরে রতিকান্ত বসু একদিন তাকে ডেকে পাঠালেন। সম্পাদকের তলব শুনেই দীপ্তেন্দুর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। গতকাল থেকে নীলিমাদি আবার অফিসে আসছেন না। এই কদিন সে প্রায় ছায়াসঙ্গীর মতো নীলিমা দত্তকে সর্বত্র অনুসরণ করেছে। খানিকটা পরিচিতিও হয়েছে তার। লালবাজার, ভবানীভবন, কর্পোরেশনের লালবাড়ি, রাইটার্স এমন অনেক জায়গাতেই নীলিমা দত্তর সঙ্গে গিয়ে সে খবর সংগ্রহ করে এনেছে। নীলিমাদির কথামতো দু-একটা রিপোর্টের মুশাবিদাও করল। এবং পরদিন যথারীতি সেই খবর ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেছে।

প্রথম দিন তার লেখা লোক্যাল নিউজের ওপর চোখ বুলিয়ে নীলিমাদি বললেন,—'বাঃ! ভাষার ওপর তোমার তো দেখছি বেশ দখল আছে দীপ্তেন্দু। সাহিত্য-টাহিত্য করার অভ্যেস আছে নাকি?'

শুনে দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল। বলল,—'না- না। ওসব কিছু নয়। তবে—'

'তবে কী?' নীলিমা দত্ত তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

দীপ্তেন্দু একটা ঢোক গিলে জিভটাকে সচল করে নিয়ে বলল,—'এম. এ. পড়ার সময় একজন পাবলিশারের কাছে চাকরি করতাম, তখন—'

নীলিমা দত্ত তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শুধোলেন,—'এম. এ. পড়ার সময়

তুমি চাকরি করতে নাকি দীপ্তেন্দু? তাহলে ক্লাস করতে কখন?'

'কেন?' বিকেল চারটে পর্যন্ত ক্লাস থাকত। তারপর ক্লাস থেকেই পাবলিশারের অফিসে চলে যেতাম। বিকেল চারটের পর রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি। Mainly প্রুফ দেখতাম। তার সঙ্গে অবশ্য বিজ্ঞাপনও লিখতে হয়েছে। নতুন বই প্রকাশিত হবার সময় ম্যাগাজিনে বা কাগজে যা বেরোয়। তখনই নামী-দামী সাহিত্যিকের লেখার প্রুফ দেখে আর বিজ্ঞাপন লিখতে লিখতে বাংলা ভাষাটা বেশ রপ্ত হয়ে গেছল।'

নীলিমা দত্ত বললেন, 'স্টুডেন্ট লাইফে তোমাকে তাহলে হার্ড স্ট্রাগল করতে হয়েছে, কী বল?'

'হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু সলজ্জ হেসে জবাব দিল। 'নইলে কলকাতায় থাকার খরচ জোগাড় হ'ত কেমন করে?'

কিন্তু সম্পাদক তাকে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন কেন দীপ্তেন্দু আকাশ-পাতাল চিন্তা করেও তার সদুত্তর খুঁজে পেল না। তবে কি কাগজে কোনো ভুল সংবাদ বেরিয়েছে? যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদের ঝড় এসে পৌঁছেচে সম্পাদকের টেবিলে। আসলে নীলিমাদি অফিসে থাকলে এই নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। খবরে ভুলচুক যাই বেরিয়ে থাক সম্পাদক নিশ্চয় সেই বিষয়ে খোঁজখবর কিংবা কৈফিয়ত চাইলে তার জন্য সোজাসুজি নীলিমা দত্তকেই ডেকে পাঠাতেন। দীপ্তেন্দুর তাতে কোনো ভূমিকাই ছিল না। আর এর ব্যাখ্যা কিংবা জবাবদিহি যা করবার নীলিমাদি সেটি সুন্দরভাবে সম্পাদককে বুঝিয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন।

কিন্তু নীলিমা দত্ত গতকাল এবং আজও অনুপস্থিত। অথচ পিওন এসে তাকে সম্পাদকের তলব জানাবার পর অন্তত দশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে। দীপ্তেন্দু একবার ভাবল চিফ রিপোর্টারকে সঙ্গে নিয়ে যাবে কি না। লোক্যাল নিউজের ওপর যে কোনো রিপোর্টই তৈরি হোক তা চিফ রিপোর্টারের হাত দিয়ে পাশ হবে। আর শুধু চিফ রিপোর্টারই বা কেন? এই কাগজের অফিসে নিউজ এডিটর বলতে কেউ নেই। ব্যয় সঙ্কোচের জন্যই সম্ভবত বার্তা সম্পাদকের পদটা খালি রাখা হয়েছে। আপাতত নিউজ এডিটরের কাজটা রতিকান্ত বসু অর্থাৎ সম্পাদকের দেখার কথা। তবে কাগজে-কলমে যারই দায়িত্ব থাক, অফিসে চিফ সাব-এডিটর কাগজে খবর সাজানোর কাজটা চালিয়ে আসছেন। খুব একটা প্রয়োজন না থাকলে সম্পাদককে এই নিয়ে মিছিমিছি বিরক্ত করতে নিষেধ আছে।

দ্বিধা কাটিয়ে দীপ্তেন্দু সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠল। কাউকে কিছু না বলে সোজা রতিকান্ত বসুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। এই কদিনেই অফিসের সব কর্মচারী তাকে চিনে গেছে। দীপ্তেন্দু আসতেই সম্পাদকের পিওন দরজা খুলে তাকে ভেতরে যাবার সাদর আমন্ত্রণ জানাল।

দীপ্তেন্দুকে দেখেই সম্পাদক বললেন,—'আসুন আসুন। একটা বিশেষ প্রয়োজন

আছে বলেই আপনাকে ডেকে পাঠাতে হ'ল। নইলে পনের দিনের আগে আপনাকে একা কোথাও পাঠাতে ইচ্ছে ছিল না।'

দীপ্তেন্দু ব্যাপারটা আন্দাজ করে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল।

রতিকান্ত বসু বললেন,—'গতকাল থেকেই নীলিমা দত্ত অ্যাবসেন্ট রয়েছে। আমাকে আজ টেলিফোন করে বলল, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সম্ভবত ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি-কাশি, তার সঙ্গে প্রচণ্ড মাথাব্যথা আর জ্বর। এ সপ্তাহটা আর অফিসে আসতে পারবে না। তাই অগত্যা আপনাকেই ডাকতে হ'ল। নীলিমা দত্ত থাকলে অবশ্য ওর সঙ্গেই আপনাকে পাঠাতাম।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'রিপোর্টিঙের কাজে আমাকে কি কোথাও পাঠাবেন?'

'ঠিক ধরেছেন।' রতিকান্ত বসু হাস্যময় হয়ে উঠলেন। বললেন,—'কাগজে নিশ্চয় দেখেছেন এবার কলকাতার কাছেই কংগ্রেসের অধিবেশন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। নীলিমাদি বলছিলেন আপনি নাকি তাঁকে এই অধিবেশনটা কভার করতে বলেছেন?"

'বলেছিলাম তো। কিন্তু নীলিমা দত্ত যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাই আপনাকেই এ কাজের ভার দিচ্ছি। আগামীকালের কাগজেই প্রথম কিস্তির লেখাটা যেন বের হয়।'

দীপ্তেন্দু সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে স্যর।'

রতিকান্ত বসু নবনিযুক্ত রিপোর্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসলেন। বললেন,—'আপনি Confident তো? মানে যে কাজের দায়িত্ব দিলাম সেটা পালন করতে পারবেন? কোনো অসুবিধে হবে না?'

দীপ্তেন্দু সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল,—'আপনি চিন্তা করবেন না স্যর। আমাকে যখন Trust করেছেন তখন আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা আমি নিশ্চয় রাখব।'

'Thank you young man. আপনার কিছু কিছু লেখা অবশ্য আমার চোখে পড়েছে। সেজন্যই হয়তো আপনার ওপর আমার Confidence দানা বেঁধেছে। যেমন ধরুন Burdwan Roadএর ধনী ব্যবসায়ী গুপ্তদের বাড়ির দুঃসাহসিক ডাকাতি। স্ত্রী এবং মাত্র তিন বছরের ছেলের চোখের সামনে দুষ্কৃতীরা সাতাশ বছর বয়স্ক স্বামীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। এবং তারপর নগদে অলঙ্কারে প্রায় দু-লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে বিনা বাধায় চম্পট দেয়। এই ঘটনাটা আপনি যেমন কাগজে বিশদভাবে লিখেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। এর ওপর আমি একটা সম্পাদকীয় লিখেছিলাম নিশ্চয় দেখেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'এই editorialটা লেখার খুব প্রয়োজন ছিল, বুঝলেন? ঘটনার তিন দিন পরেও পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে যারা ছিল তাদের কাউকে ধরতে পারে নি। এসব কেসে পুলিশ সন্দেহের বশেও কিছু লোককে আটক করে।

পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু Burdwan Road এর খুনের ঘটনায় একমাত্র এক দারোয়ান ছাড়া পুলিশ আর কাউকেই গ্রেপ্তার করেনি। আমার তো মনে হয় শেষপর্যন্ত এই কেসে পুলিশ একটা দায়সারা গোছের Final report দিয়ে কর্তব্য শেষ করবে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'হ্যাঁ স্যর। যতদূর জানি এই কেসে এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোনো breakthrough বা আলোকপাতই করতে পারে নি। শুনেছি কেসটা সি. আই. ডি-র হাতে দেওয়া হয়েছে। নীলিমাদির সঙ্গে ভবানীভবনে ডি. আই. জি. আই. বি-সি. আই. ডি র কাছে আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু তদন্ত চলছে ছাড়া তিনি আর একটি কথাও বলতে চান নি।'

রতিকান্ত বসু বললেন, —'সেজন্যই তো সম্পাদকীয় কলমে লিখলাম পুলিশ তাহলে আছে কিসের জন্য? মাস-মাস সি. আই. ডি'র সিক্রেট সার্ভিস বাবদ যে গোছা গোছা টাকা ব্যয় হয় সেটা তাহলে কোন কাজে লাগছে? পুলিশের Source কি এখন মরা নদীর সোঁতা হয়ে দাঁড়িয়েছে?'

দীপ্তেন্দু প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল,—'আমি তাহলে আসি স্যর।'

'হ্যাঁ, আসুন।' রতিকান্ত বসু তাকে বিদায় জানালেন। বললেন,—'আজ আর কাল বাদেই কংগ্রেসের Open Session অর্থাৎ প্রকাশ্য অধিবেশন। কাগজে পড়েছেন নিশ্চয় ইউ. এন. ধেবর ইতিমধ্যেই বলেছেন, একমাত্র কংগ্রেসই জনগণের উন্নততর জীবনের স্বপ্নকে সফল করতে পারে।'

সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে, দীপ্তেন্দু তার চেয়ারে এসে বসল। জিনিসপত্র গুছিয়ে তার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সে বেরোবার জন্য তৈরি হ'ল। এখন অফিস থেকে বেরোলে বেলা তিনটে নাগাদ সে নিশ্চয় অধিবেশন যেখানে হচ্ছে সেখানে পৌছতে পারবে। নীলিমাদি অফিসে থাকলে দীপ্তেন্দু নিশ্চয় তার সঙ্গেই কংগ্রেস অধিবেশন কভার করতে আসত। কিন্তু কারো সঙ্গে না গিয়ে সম্পূর্ণ একা একটা কাজের দায়িত্ব পেয়ে তার বেশ ভালোই লাগছিল। আর এসব অধিবেশনের কর্মসূচী কী ভাবে কভার করতে হয় দীপ্তেন্দু কয়েকদিনেই তার কলাকৌশলটা মোটামুটি আয়ত্ত করে ফেলেছে। অধিবেশনের শেষে কিংবা মাঝখানে প্রেসকে ব্রিফ করার জন্য Meet The Press গোছের একটা অনুষ্ঠান হয়। সেখানে দলীয় মুখপাত্র বা Party spokesman অধিবেশনে কংগ্রেস কী কী প্রস্তাব আনতে চলেছে তার একটা রূপরেখা সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন। বিস্তারিত কিছু বলার থাকলে কখনও রিপোর্টারদের হাতে একটা Print Out গোছের কিছু দেওয়া হয়ে থাকে। কোনো সাংবাদিক মুখপাত্রকে কোনো প্রশ্ন করলে তিনি তার জবাবও দেন।

প্রায় সাড়ে ছটা পর্যন্ত কংগ্রেস অধিবেশনে থেকে দীপ্তেন্দু যখন অফিসে ফিরল তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। শীতের ছোট বেলা। ছটা না বাজতেই অন্ধকার ঘনাল। দিনটা যেমন হোক কাটলেও রাত্রি নামলেই বেশ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করে।

শীতবস্ত্র বলতে এখনও সেই পাতলা সোয়েটারটাই তার সম্বল। মধ্যপ্রদেশে থাকতে একটা মোটা কম্বল তাকে কিনতে হয়েছিল। এখানকার শীতে সেটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বরং একটা পাতলা লেপ থাকলে রাত্তিরে সেটা গায়ে দিয়ে দিব্যি ঘুমোতে পারত।

টেবিলে বসে দীপ্তেন্দু আগে অধিবেশন নিয়ে তার লেখাটা শেষ করল। তারপর সেটি চিফ্ রিপোর্টারের হাতে দিয়ে জানাল,—'এডিটর বলছিলেন আগামীকালই যেন লেখাটা বেরোয়।

দীপ্তেন্দুর লেখাটার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে চিফ্ রিপোর্টার সুধাময়বাবু মন্তব্য করলেন,—'লেখাটা তো ভালোই হয়েছে। দাঁড়ান, আমি সম্পাদককে দিয়ে এর ওপর একটা দস্তখত করিয়ে আনি। তাহলেই আর কালকের কাগজে ছাপা হতে কোনো বাধা থাকবে না।'

দীপ্তেন্দু এবার মেসে ফেরার উদ্যোগ করল। ব্যাগে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে কংগ্রেস অধিবেশন কভার করতে বেরিয়েছিল। সেগুলি বের করে ড্রয়ারে রাখল। তারপর চাবি ঘুরিয়ে ড্রয়ার বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। চিফ রিপোর্টার সুধাময়বাবু ততক্ষণে লেখাটা নিয়ে সম্পাদকের ঘর থেকে ফিরে এসেছেন। দীপ্তেন্দুকে লক্ষ্য করে বললেন,—'এটা কালকের কাগজেই বেরুবে। রতিকান্তবাবু তাই লিখে দিয়েছেন। আর বাড়ি যাবার আগে তোমাকে আরো একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।'

তার ঝোলাটা কাঁধে ফেলে দীপ্তেন্দু সোজাসুজি সম্পাদকের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাকে দেখে রতিকান্ত বসু বললেন,—'লেখাটা ভালো হয়েছে। তবে আমি সামান্য একটু অদলবদল করে দিয়েছি। কালকের কাগজে ছাপা হ'লে আপনি ওটা দেখে নেবেন।' সম্পাদক এক মুহূর্ত থেমে কী যেন ভাবলেন। ফের দীপ্তেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন,—'আপনি বেরোবার পর আমি ফটোগ্রাফারকে বলেছিলাম আজকের অধিবেশনের দু-চারটে ছবি তুলে আনতে। ছবিটা পেলেই আপনার লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওটা Set করে দেবে।'

দীপ্তেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—'ঠিক আছে স্যার। আমি তাহলে এখন যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, আসুন।' রতিকান্ত বসু তাকে বিদায় জানালেন। তারপর মুখ তুলে বললেন,—'একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখছি। নীলিমা কবে জয়েন করতে পারবে বলেনি। তবে সে কাজে যোগ দিলেও কংগ্রেস সেশনটা আপনিই কভার করবেন। বিশেষ করে Open Session বা প্রকাশ্য অধিবেশন। ওটা বেশ ভালো করে গুছিয়ে লিখবেন কিন্তু।'

দীপ্তেন্দুর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল,—'কিন্তু নীলিমাদি যদি কিছু মনে করেন, মানে কংগ্রেস সেশনটা তো ওকেই কভার করতে বলা হয়েছিল।'

রতিকান্ত বসু ঈষৎ গম্ভীর গলায় বললেন,—'এই নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আর একটা কথা শুনে রাখুন। সম্পাদক হিসেবে কাগজের ইনটারেস্ট দেখা

আমার কর্তব্য। কংগ্রেস অধিবেশনটা আপনি কভার করলে কাগজের বুনিয়াদ আরো শক্ত হবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। ঠিক আছে, আসুন।'

পাথুরিয়াঘাটার মেসে যখন সে ফিরল তখন নটা বেজে গেছে। এদিকটা গঙ্গার ধারে হলেও ঠাণ্ডা কম নয়। শীত এ বছর হয়তো জাঁকিয়ে পড়বে। কিন্তু তাকে এই পাতলা সোয়েটারটা পরেই শীতকালটা কাটাতে হবে। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে সোয়েটার কেনার মতো বিলাসিতা তার সাধ্যে কুলোবে না। আর দ্বিতীয় মাসের মাইনে যখন হাতে আসবে তখন শহরে গরম না পড়লেও দখিনা বাতাস বইতে শুরু করবে। শীতবস্ত্রের আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না।

পথে দোকানপাট প্রায় বন্ধ। এই ঠাণ্ডায় কে আর দোকানের ঝাঁপ খুলে বসে থাকবে? রাস্তায় সে শুধু একটা ওষুধের দোকান খোলা দেখেছে। মেসের বোর্ডারদের অনেকেই ইতিমধ্যে খাওয়া সেরে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। দীপ্তেন্দু ঘরে ঢুকে দেখল তার রুম-মেট তখনও ফেরে নি। এত রাত্তির পর্যন্ত লোকটা কোথায় পড়ে রইল ভেবে তার নিজের মনেই চিন্তা শুরু হল। রেসুড়ে কিংবা যাই হোক লোকটা এই ঘরে তার সঙ্গেই থাকে। সেই হিসেবে তার ভালোমন্দের বিষয়ে দীপ্তেন্দু আর ওই লোকটার মাঝখানে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র তৈরি হয়েছে বৈকি। আজ মেসে ফিরলে তার রুম-মেট তিনকড়ি হাজরার সঙ্গে সে এই নিয়ে কথা বলবে ভাবল। কিন্তু আপাতত এত রাত অব্দি লোকটা কোথায় পড়ে রইল চিন্তা করে তার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির খচখচানি শুরু হ'ল।

হঠাৎ দরজার কাছে একটা পোস্টকার্ড পড়ে থাকতে দেখে দীপ্তেন্দু কৌতূহলী হ'ল। নিশ্চয় বন্ধ দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে মেসেরই কোনো লোক এটা ফেলে দিয়ে গেছে। পোস্টকার্ডটা হাতে তুলে নিয়ে দীপ্তেন্দু দেখল মেয়েলি হাতের কাঁচা লেখা। চিঠিটা তিনকড়ি হাজরার গ্রাম বেগুনিয়া থেকে এসেছে। সম্ভবত তার স্ত্রী লিখেছে। পোস্টকার্ডের খোলা চিঠি। চিঠির ওপর চোখ বুলোতেই দীপ্তেন্দু পড়ল,—

শ্রীচরণেষু,

তিন সপ্তাহ হইল তুমি বেগুনিয়াতে আস নাই। আমার হাতের টাকাকড়ি সব ফুরাইয়া গিয়াছে। ইন্দ্র তামলির দোকান হইতে সামান্য জিনিসপত্র ধারে আনাইয়া কোনোমতে দিন চালাইতেছি। কিন্তু আগেকার টাকা না দিলে সে আর একটি পয়সাও কর্জ দিবে না সাফ বলিয়া দিয়াছে। সামনের শনিবার বেগুনিয়াতে আসিয়া টাকাকড়ি না মিটাইয়া দিলে তোমার ছেলেমেয়ে সহ আমাকে উপবাস করিয়া থাকিতে হইবে। পত্রে সব কথা জানাইলাম। যা হয় একটা বিহিত কর। প্রণাম লইবে।

ইতি
ইন্দুমতী

চিঠিটা পড়েই তিনকড়ির ওপব দীপ্তেন্দু প্রচণ্ড খাপ্পা হয়ে উঠল। পাষণ্ড এই লোকটাকে সে এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছে না। ছেলেমেযে নিয়ে কী নিদারুণ কাযক্লেশেই না ইন্দুমতী সংসাব চালায। অথচ এই লোকটা কলকাতা শহরে দিব্যি খায়-দায়। কাচা জামাকাপড় পরে অফিসে যায়। আর শনিবারে রেসের মাঠে গিয়ে ঘোড়ার পিছনে বাজী ধরে। জিতলে লাভেব টাকার মোটা অংশ মদের দোকানে উড়িয়ে আসে।

তিনকড়ি হাজরা ঘবে ফিরতেই দীপ্তেন্দু তার অবস্থাটা বুঝতে পারল। টলটলায়মান দেহ। কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ কথাবার্তা। কোনোমতে বিছানায গা এলিযে দিয়ে সে প্রায় জড়িত কণ্ঠে শুধোল,—'কখন এলেন ভাই?'

দীপ্তেন্দু মুখখানা শক্ত করে জবাব দিল,—'এসেই শুযে পড়লেন বড়। ঠাকুর আপনার ভাত নিয়ে আর কত রাত্তির অব্দি বসে থাকবে?'

'আজ আর ভাত খাব না।' তিনকড়ি তেমনি জড়িত কণ্ঠে জবাব দিল। বলল,—' 'আপনি ভাই ঠাকুরকে জানিয়ে দেবেন আমার খাবারটা সে যেন বাড়ি নিয়ে যায়।'

'তাই নাকি?' দীপ্তেন্দু ব্যঙ্গ করে তার দিকে তাকাল। বলল,—'তা রাত্তিরের খাওয়াটা কোথায় সেরে এলেন?'

'সে আপনি শুনে কী করবেন?' মুচকি হেসে তিনকড়ি ফের বলল,—'ইয়ে মানে বিডন স্ট্রীটে আমাদের একটা ঠেক্ আছে। সেখানেই ক'জন বসেছিলাম।'

ভনিতা না করে দীপ্তেন্দু এবার বলল,—'বেগুনিয়া থেকে আপনার একটা চিঠি এসেছে। মেঝেতে পড়ে ছিল, তাই আপনার টেবিলে তুলে রেখেছি।'

তিনকড়ি হাত বাড়িয়ে পোস্টকার্ডটা টেনে নিযে দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলল,—'মাগীর ঘ্যানঘ্যানানি আর শেষ হতে চায় না। জানেন বাড়িতে পা দিতে না দিতেই ওর সুমধুর বাক্যবাণ ছাড়তে শুরু করবে। তারপর যতক্ষণ না সদর দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসছি ততক্ষণ ওর কথার কামাই নেই।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'তিন সপ্তাহ আপনি বাড়ি যান নি কেন? টাকাও পাঠান নি।'

'আপনি বুঝি পোস্টকার্ডটায় চোখ বুলিয়েছেন?'

'ইয়ে মানে হ্যাঁ। খোলা চিঠি তাই—।'

'আরে না-না। সেজন্য আমি কিছু মনে করিনি মশায়।' তিনকড়ি একটা হাই তুলে প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করল। বলল,—'পোস্টকার্ডের চিঠি হ'ল বে-আব্রু মেয়েমানুষের মতো। যে কেউ আদেখলের মতো তার দিকে তাকাতেই পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে ওর কথাগুলো আপনি বিশ্বাস করে বসে আছেন।'

'তার মানে? কী বলছেন আপনি?'

তিনকড়ি হাজরা দাঁত বের করে হাসল। আমার বউ মানে ইন্দুমতীকে তাহলে এখনও চিনতে পারেন নি। ওর কাছে টাকাপয়সা নেই ভেবেছেন? তাহলে আমার' ছ-বিঘে জমির ধান, শুনো ফসল, চার-পাঁচটা নারকেল গাছের জমা,—এসব কোথায়

যাচ্ছে বলতে পারেন? তাছাড়া বেগুনিয়াতে ওকে সাহায্য করবার মতো লোকও আছে।'

'তার মানে? আপনার আত্মীয়-স্বজন কারো কথা বলছেন বুঝি?'

'আরে না মশায়। আত্মীয়-টাত্মীয় নয়। তবে গ্রামসুবাদে দেওর বলতে পারেন। বৌদি-বৌদি বলে প্রায় আসে। হাসি-ঠাট্টা করে। কখনও রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত আমার বাড়িতেই পড়ে থাকে।'

'ছেলেটির বয়স কত? চাকরি-বাকরি করে?'

'হ্যাঁ। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। কাছাকাছি একটা গ্রামের প্রাইমারী স্কুলেব টিচার।' বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে তিনকড়ি শুধোল,—'কী মশায়? বুঝতে পারলেন কিছু?'

'না, মানে' দীপ্তেন্দু অনেক ভেবে বলল,—'ছেলেটি বোধহয় প্রয়োজন হলে আপনার স্ত্রীকে সাহায্য করে?'

'ধুর মশায়।' তিনকড়ি জড়িত কণ্ঠে বলল,—'আপনি বড্ড বোকাসোকা। দুজনের সম্পর্কটা বুঝতে পারলেন না? এই নিয়ে গাঁয়ের লোকে কত কথা বলে। আর দুটো বাচ্চার মা হ'লে কী হয়? ইন্দুমতীর শরীর এখনও টান-টান,—সেই যে বলে না, হাসলে পরে মুক্তো ঝরে। ঠিক তাই।'

'ছি-ছি! এসব কি বলছেন আপনি? উনি আপনার স্ত্রী।'

'আশ্চর্য! এ কি আমার কথা নাকি? গাঁ-সুদ্ধ লোক আড়ালে ফিসফাস করে। আমার কানেও কিছু কিছু আসে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। আগামীকাল তো শনিবার। আপনি বেগুনিয়া থেকে ঘুরে আসুন।'

'কী যে বলেন, মাইনের টাকাটা হাতে না পেলে যাই কেমন করে?' তিনকড়ি হাজরা ফের রঙ্গ করে বলল,—'আপনি ব্যাচিলর মানুষ। বে-থা করেন নি। নইলে বুঝতেন খালি হাতে মেয়েমানুষের কাছে যাওয়া চলে না। তা সে বউ কিংবা বাজারের মেয়েমানুষ যেই হোক।'

দীপ্তেন্দু তার রসিকতা গায়ে মাখল না, বলল,—'মাইনে পেতে তো এখনও অনেক দেরি মশায়, আজ তো সবে বারো তারিখ। না—না ওটা কোনো কাজের কথা হ'ল না।' দীপ্তেন্দু প্রায় জোর করল।

তিনকড়ি বলল,—'বেশ। তাহলে আপনি কিছু টাকা ধার দিন। মাসকাবারে পেয়ে যাবেন।'

দীপ্তেন্দু একটু চিন্তা করে শুধোল,—'কত টাকা হ'লে আপনি বেগুনিয়া যেতে পারবেন?'

'তা অন্তত গোটা তিরিশ টাকা তো চাই, আট-দশ টাকা যাতায়াতেই বেরিয়ে যাবে। তারপর গিয়ে ধরুন অন্তত গোটা কুড়ি টাকা হাতে না দিলে মাগী শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসবে না?'

এতগুলো টাকা ধার দেবার সামর্থ্য এখন তার নেই। সাকুল্যে শ'দেড়েক টাকা পুঁজি। মেসে মিল চার্জ বাবদ পনের দিনের টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে রেখেছে। এখন যদি মাসের মাঝখানে মেস ছেড়ে তাকে অন্যত্র যেতে হয় তাহলে তো প্রায় নিরাশ্রয় অবস্থা। কোথাও একটা সীট না যোগাড় হওয়া পর্যন্ত তাকে এই কলকাতায় ভেসে বেড়াতে হবে।

তবু তিনকড়ি হাজরার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের কথা মনে করে সে বাক্স খুলে টাকাটা বের করে দিল। বলল,—'কাল অফিস ছুটি হলেই বেগুনিয়া রওনা হবেন কিন্তু।'

'নিশ্চয়। সে কথা আবার বলতে হয়।' তিনকড়ি হাজরা হঠাৎ গদ্গদ হয়ে উঠল। বলল,—'আপনি মানুষ নন ভাই। দেবতা, দেবতা। নইলে আমার স্ত্রী ছেলেমেয়ে না খেয়ে উপোস করে রইবে শুনে আপনার প্রাণই বা কেন কেঁদে উঠবে?'

দীপ্তেন্দু আর বাক্যব্যয় না করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। তাকে দেখে ঠাকুর বলল,—'খেতে বসে পড়ুন গো বাবু। আমি ভাত-ডাল, মাছের ঝোল তরকারি সব সাজিয়ে দিচ্ছি।'

শ্রীকান্ত রান্নাঘরের দরজার বাইরে থেকে জানাল,—'সেক্রেটারিবাবু একবার আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

মুহূর্তে দীপ্তেন্দুর মনের ভিতর একটা আশঙ্কার ছায়া পড়ল। তবে কি সেই ভদ্রলোক যিনি এই সীটটা বুক করে গেছেন, তিনি দু-একদিনের মধ্যেই মেসে আসছেন? তাহলে তো দীপ্তেন্দুকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে অবিলম্বে অন্যত্র সরে পড়তে হবে। সম্ভবত সেই কথাটা জানাবার জন্যই সেক্রেটারি তাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।

খাওয়া শেষ হলে দীপ্তেন্দু দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

ঘরের ভিতরে রতন দত্ত তার বিছানায় শুয়েছিল। দীপ্তেন্দু দরজার কাছে যেতেই সে উঠে বসল। তাকে উদ্দেশ্য করে বলল,—'আরে আসুন আসুন দীপ্তেন্দুবাবু। আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথা ছিল।'

দীপ্তেন্দু ম্লান হেসে বলল,—'কথাটা কী আমি তা জানি।'

'আপনি সেটা জানবেন কেমন করে?' রতন দত্ত ভুরু কোঁচকাল।

'জানি মানে আন্দাজ করতে পারছি।' দীপ্তেন্দু এক মুহূর্ত থামল। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে জানাল,—'আমার সীটটা যিনি আগেই বুক করে গেছেন তিনি বোধহয় দু-একদিনের মধ্যেই আসছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ তাই।' রতন দত্ত মুচকি হাসল। বলল,—'তাহলে বুঝতেই পারছেন সীটটা আপনাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।'

'নিশ্চয়।' দীপ্তেন্দু প্রায় জোর করে সহজ হবার চেষ্টা করল। বলল,—'দু-একদিনের মধ্যেই আমি মেস ছেড়ে চলে যাব।'

রতন দত্ত এবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে দীপ্তেন্দু বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

রতন দত্ত বলল,—'আপনি যা ভেবে বসে আছেন আমি ঠিক তার উল্টোটা জানাব বলেই আপনাকে একবার আসতে বলেছি।'

রতন দত্ত ঠিক কী বলতে চায় দীপ্তেন্দু তখনও সেটা বুঝতে পারে নি। তার চিন্তাভিভূত মুখের দিকে তাকিয়ে রতন দত্ত জানাল, —'আপনার সীটে যার এখানে আসার কথা ছিল তিনি আর আসবেন না মশায়। তার মানে আপনি পার্মানেণ্টলি ওই সীটেই থেকে যাবেন।'

শুনে দীপ্তেন্দুর বুকের ওপর থেকে যেন একটা বিশ মনী পাথরের ভার সাঁৎ করে কোথায় সরে গেল। রতন দত্ত চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে তাকে বসতে বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল,—'কাগজের অফিসের কাজকর্ম কেমন চলছে আপনার?'

দীপ্তেন্দু সলজ্জ হেসে জবাব দিল,—'এই তো কদিন হ'ল ঢুকেছি। এখনও independently কোনো কাজই করিনি। তবে নীলিমাদি অসুস্থ বলে কংগ্রেসের এই অধিবেশনটা সম্পাদক আমাকেই কভার করতে বলেছেন।'

'তাহলে তো বড় কাজ।' রতন দত্ত সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

দীপ্তেন্দু বলল,—'আগামীকাল বঙ্গভূমি কাগজে কংগ্রেস সেশনের ওপর যে লেখাটা বেরুবে ওটা আমারই প্রতিবেদন।'

'দেখব তাহলে। আমাদেব অফিসে তো বঙ্গভূমি কাগজ নেওয়া হয়।' হঠাৎ কী মনে হতে রতন দত্ত শুধোল,—'আচ্ছা, বঙ্গভূমি কাগজে খেলার পাতাটা কে দেখছেন?'

দীপ্তেন্দু জবাব দিল,—'সোমেশ্বর ব্যানার্জী নামে এক ভদ্রলোক। সাংবাদিকতায় আমার চেয়ে বছর খানেকের সিনিয়র। একসময় রাজস্থান ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলেছে।'

রতন দত্ত বলল,—'মাদ্রাজে ফিফথ্ টেস্ট তো আর কয়েকদিন বাদেই শুরু হচ্ছে। নরীম্যান কন্ট্রাক্টর অধিনায়ক।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমাদের কাগজে ফিফথ্ টেস্ট নিয়ে একটা Supplement মানে ক্রোড়পত্র বেরুবে শুনেছি। সোমেশ্বর বলছিল ফিফথ্ টেস্টে ইণ্ডিয়ার জেতার চান্স খুব বেশি।'

রতন দত্ত বলল,—'সেটা নির্ভর করবে ভারতের ব্যাটিং শক্তির ওপর। পতৌদির নবাব যদি দাঁড়িয়ে যায় তাহলে প্রথম ইনিংসেই ইণ্ডিয়া রানের পাহাড় গড়ে তুলবে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'দেখা যাক, ইণ্ডিয়া কী করে। তবে ভরসাঁর কথা এই যে প্রতিপক্ষ ইংলণ্ড আগের মতো শক্তিশালী দল নয়। সেটাই আমাদের পক্ষে একটা প্লাস-পয়েন্ট।'

রতন দত্তর ঘর থেকে বেরিয়ে দীপ্তেন্দু ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলো। তার রুমমেট তিনকড়ি হাজরা দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। বাসস্থান সমস্যার একটা

সমাধান হতেই দীপ্তেন্দু নিজেকে হাল্কা বোধ করছিল। মাথার বালিশটা ঠিক করে নিয়ে সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল, সারাদিনের খাটাখাটুনির পর চোখ দুটো জড়িয়ে আসতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হ'ল না।

পরদিন কংগ্রেস অধিবেশন কভার করে অফিসে তার লেখাটা জমা দিয়ে দীপ্তেন্দু যখন মেসে ফিরল তখন নটা বেজে গেছে। শনিবার বিকেল থেকেই মেস বাড়িটা ফাঁকা হতে শুরু করে। যাদের কাছাকাছি বাড়ি তারা অফিস থেকেই ইস্টিশানে চলে যায়। খুব প্রয়োজন থাকলে কেউ বা কিছুক্ষণের জন্য মেসে ফিরে আসে। তারপর বাড়ি যাবার ব্যাগ গুছিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে।

তার ঘরের দরজাটা খোলা দেখে দীপ্তেন্দু একটু অবাক হ'ল। আশ্চর্য! ঘরে তো এখন কারো থাকার কথা নয়। তার রুমনেট তিনকড়ি হাজরা নিশ্চয় অনেক আগেই বেগুনিয়ায় তার বাড়ি পৌঁছে গেছে। তাহলে তার ঘরে এখন কে এসে ঢুকেছে? ভুল করে অন্য কোনো বোর্ডার তার ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েনি তো?

দরজাটা হাট করে খুলে সুইচ টিপতেই আলোয় ভরে উঠল ঘর। আর তখনই বিস্ময়বিমূঢ় চোখে দীপ্তেন্দু তাকিয়ে দেখল তিনকড়ি হাজরা বিছানায় দিব্যি শুয়ে আছে। দীপ্তেন্দু শুধোল,—'কী ব্যাপার? আপনি?'

'হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছেন।' লোকটা নির্লজ্জের মতো হাসল।

দীপ্তেন্দু তবু শুধোল,—'বেগুনিয়া যান নি? আপনাকে তো সেজন্যই তিরিশটা টাকা দিলাম।'

'তার জন্য চিন্তা করবেন না। মাসকাবারে পাই-পয়সাটি মিটিয়ে দেব আপনার। শুধু মাইনের টাকাটা হাতে পেলেই হয়।' তিনকড়ি মুচকি হাসল।

'কিন্তু বেগুনিয়া যান নি কেন? সেটা তো বলবেন।'

তিনকড়ি হাজরা অপাঙ্গে একবার দেখল তাকে। তারপর একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ছুড়ে দিয়ে ফের শুয়ে পড়ল।

দীপ্তেন্দু ব্যঙ্গ করে বলল,—'তাহলে হাত খালি। মেয়েমানুষের কাছে যেতে পয়সা লাগে, এসব আনাই-ধানাই বলে মিছিমিছি তিরিশটা টাকা নিলেন কেন?'

'নিয়েছি তো কী হয়েছে? ও টাকা তো আপনি খয়রাতি করেন নি। ধার দিয়েছেন। চাইলে সুদ-সুদ্ধ মিটিয়ে দেব।'

'মিটিয়ে দেবার কথা পরে। কিন্তু বেগুনিয়া গেলেন না কেন সেটা তো বলবেন।'

'যাই নি তো কী হয়েছে? তার কৈফিয়ত কি আপনাকে দিতে হবে? আমার বউয়ের কাছে আমি কখন যাব, সে কি আপনি বলে দেবেন মশায়?' তিনকড়ি হাজরা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গা দুলিয়ে হাসতে লাগল।

দীপ্তেন্দু অবাক হয়ে লোকটাকে দেখছিল। এই তিনকড়ি হাজরাই গতকাল রাত্রে তাকে দেবতা-দেবতা বলে কত কী প্রশংসাই না করল। আর এখন সেই মানুষটারই অন্য মূর্তি, বিশ্রী মুখের ভাষা।

চেঁচামেচি শুনে মেসের ঠাকুর-চাকর দু-একজন বোর্ডার ঘরের দরজার মুখে এসে দাঁড়াল। তিনকড়ি হাজরা চেঁচিয়ে বলল,—'দেখুন না মশায়। গতকাল রাত্রে বাড়ি যাব বলে ওর কাছে তিরিশটা টাকা ধার নিলাম। তা শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে উঠল না। তাই এই ভদ্রলোক রাত্তিরে ফিরে চোটপাট শুরু করেছেন। ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে কেন বেগুনিয়া যাইনি তার কৈফিয়ত দিতে হবে।'

দীপ্তেন্দু সপক্ষে বলার চেষ্টা করল,—'না মানে ওঁর স্ত্রী পোস্টকার্ডে একটা চিঠি লিখেছিলেন। টাকা-পয়সা না দিলে ছেলেমেয়ে নিয়ে তাকে উপোস করে থাকতে হবে। সেজন্যই—।'

তিনকড়ি হাজরা বিশ্রী একটা মুখভঙ্গি করে বলল,—'আমার স্ত্রীর চিঠি পড়েই অমনি ওর প্রাণ কেঁদে উঠল। তবু তো এখনও মাগীকে চোখে দেখেন নি মশায়। আমি শুধু বলেছিলাম, টান-টান চেহারা। হাসলে মুক্তো ঝরে। তাইতেই বুঝলেন কিনা উনি ঢলে পড়েছেন।'

জীবন চক্রবর্তী এগিয়ে এসে একটা ধমক দিয়ে বলল, —'আপনি থামবেন তিনকড়িবাবু? ছি-ছি! এই মেসবাড়িটাকে আপনারা কী করে তুলেছেন বলুন দিকি? এই সব অশ্রাব্য ভাষা।' তারপর দীপ্তেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল,—'আপনিও বেশ লোক মশায়। ধার দিতে আর জায়গা পেলেন না। যান, ঠাকুর আপনার খাবার নিয়ে বসে আছে। খাওয়া হলেই হেঁসেল তুলে দিয়ে বাড়ি যাবে।'

দীপ্তেন্দু আর একটি কথাও বলল না। কোনো মতে রান্নাঘরে ঢুকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচল।

পরদিন কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন। দীপ্তেন্দু বেলা একটা নাগাদ অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। ফটোগ্রাফার সঙ্গে। প্রকাশ্য অধিবেশনের মেজাজই আলাদা। লোকজন, ভলন্টিয়ার, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কংগ্রেস কর্মীদের আসা শুরু হয়েছে কদিন আগে থেকেই। তবে আজকের লোক সমাগম আগের সব সংখ্যাকে ছাপিয়ে গেছে। জনাকীর্ণ সভাস্থল। এত ভিড় দীপ্তেন্দু কল্পনাও করতে পারেনি। ফটোগ্রাফার টপাটপ কয়েকটা ছবি তুলল। অন্য কাগজের একজন সাংবাদিকের সঙ্গে দীপ্তেন্দুর দেখা হতেই সে বলল, —'সাবধানে থাকবেন। পারলে বরং একটা সাইডে গিয়ে দাঁড়ান। ভিড় যে রকম বাড়ছে তাতে না একটা গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। হঠাৎ Stampede হলেও কিছু আশ্চর্য হবার নেই।'

দীপ্তেন্দু ইচ্ছে করেই জনাকীর্ণ সভাস্থলের মাঝখান থেকে সরে গিয়ে একপাশে দাঁড়াল। তবু তার সাংবাদিক বন্ধুটি যা বলেছিল শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস অধিবেশনে তাই ঘটল। হঠাৎ মানুষের প্রবল চাপ এবং হুড়োহুড়িতে সভাস্থলে সে এক তুলকালাম কাণ্ড। দীপ্তেন্দু সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল তার চোখের সামনে প্রচণ্ড চাপে ইতিমধ্যেই দু-একজন এপাশে-ওপাশে ছিটকিয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকজন

পিছনের জনগণের ধাক্কা খেয়ে অনেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ার মতো ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে পড়ল। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড চাপে দীপ্তেন্দু সভাস্থলের কোণের দিকে একটা খুঁটিব ওপর সপাটে আছড়ে পড়ল। খুঁটির গায়ে সম্ভবত বড় পেরেক বা গজাল গোছের কিছু একটা আটকানো ছিল। সেটা দীপ্তেন্দুর মাথার পিছন দিকে খানিকটা ঢুকে যেতেই তার প্রচন্ড রক্তপাত শুরু হল। দীপ্তেন্দু মুখের ওপর একটা হাত রাখতেই টের পেল তাব মাথার চুল রক্তে ভিজে উঠেছে। সেই রক্ত চুল থেকে গড়িয়ে মুখ বেয়ে জামাকাপড়ে লাগতেই তার পরিধেয রক্তে রাঙা হয়ে গেল। দীপ্তেন্দুর মনে নেই কখন সে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে প্রকাশ্য অধিবেশনের এক ছত্রভঙ্গ দশা। পুলিশ প্রাণপাত চেষ্টা করেও অবস্থার সামাল দিতে পারছে না। একজন পুলিশ-অফিসার সংজ্ঞাহীন দীপ্তেন্দুকে একটা অ্যাম্বুলেন্সে তুলে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল।

যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন মাথায় প্রচণ্ড বেদনা। চোখ খুলে তাকাতেই সে রতিকান্তবাবুকে দেখতে পেল। মুখে হাসি নেই তার। চিন্তিত চাউনি। পেছনে চিফ রিপোর্টার সুধাময়বাবু।

রতিকান্তবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—'এখন কেমন বোধ করছেন?'

দীপ্তেন্দু ক্ষীণগলায় জবাব দিল,—'ভালো।'

রতিকান্ত বসু গম্ভীর গলায় জানালেন,—'আর একটি কথাও বলবেন না কিন্তু। চুপ করে শুয়ে থাকুন। মাথায় তিনটে স্টিচ্ দিতে হয়েছে। নইলে রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না।'

দীপ্তেন্দু বেডে শুয়ে সব শুনল। কিন্তু কোনো জবাব দিল না।

রতিকান্ত বসু ফের বললেন,—'এখন সাতদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম। যাকে বলে Complete rest। তারপর স্টিচ্ কেটে দিলে আপনার পাথুরিয়াঘাটার মেসে ফিরে যাবেন। হাসপাতাল থেকে অবশ্য তিন দিন পরেই ছেড়ে দিতে চাইছিল। বলছিল, স্টিচ্টা পরে একদিন এসে কাটিয়ে নিলেই চলবে। কিন্তু আমি রাজী হইনি। কেন জানেন?'

দীপ্তেন্দু কোনো কথা না বলে শুধু সম্পাদকের মুখের দিকে তাকাল।

রতিকান্ত বসু বললেন,—'তিনদিন পরে আপনি কোথায় যেতেন? পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের সেই মেসে? সেখানে কে আপনার দেখাশোনা করত বলুন? তারপর যদি হঠাৎ আবার Bleeding শুরু হত তাহলে আমরাই বা খবর পেতাম কেমন করে?'

দীপ্তেন্দু চুপ করে সব শুনল। কিন্তু আগের মতোই কোনো কথা বলল না।

রতিকান্ত বসু বললেন,—'ডিউটিতে থাকার সময় এই দুর্ঘটনা। তার মানে accident while on duty। সুতরাং আপনাকে সুস্থ করে তুলতে যা খরচপত্তর হবে তার সবটাই আমাদের। তার মানে entire expenses will be borne by the Company. সুতরাং এই বিষয়ে আপনার কোনো চিন্তা নেই। আমি এখানে

এসেই সুপারকে ধরে পেয়িং বেডে ট্রান্সফার করে এনেছি। ইচ্ছে করেই আর কেবিনের কথা বলিনি। কারণ কেবিনে থাকা মানেই স্পীক-টি-নট। মুখ বুজে শুয়ে থাকতে হবে। কার সঙ্গে দুটো কথা বলবেন? একমাত্র ভিজিটিং আওয়ার্স ছাড়া বাকি সময়টা আপনাকে বই কিংবা খবরের কাগজ পড়ে কাটাতে হবে। তার চেয়ে পেয়িং বেড ভালো। একটা ঘরে সাত-আটজন থাকে। দিব্যি গল্পগুজব করে সময় কাটাতে পারবেন।'

পরদিন সকালেই দীপ্তেন্দু বেশ খানিকটা সুস্থ বোধ করল। মাথার সেই বেদনাটা অবশ্য আছে। সকালে একটা বঙ্গভূমি আর স্টেটস্‌ম্যান কাগজের ব্যবস্থা রতিকান্ত বসু করে গিয়েছেন। নিউজ পেপারের পাতায় চোখ রাখতেই দীপ্তেন্দু চমকে উঠল। কাগজে লিখেছে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন পণ্ড। হুড়োহুড়ি ধস্তাধস্তিতে অন্তত উনত্রিশ জন আহত। তাদের মধ্যে বঙ্গভূমি কাগজের সাংবাদিক দীপ্তেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের আঘাত গুরুতর। এখন তিনি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ভিজিটিং আওয়ার্স হতেই অনেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। বঙ্গভূমি কাগজের দু-তিনজন। তার মেসের জীবন চক্রবর্তী, রতন দত্ত এবং আরো কয়েকজন।

রতন দত্ত বলল,—'রাত্তিরে মেসে ফিরেই শুনলাম কাগজের অফিস থেকে নাকি খবর দিয়ে গেছে আপনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। কয়েকদিন সেখানেই থাকতে হবে। তা শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল মশায়। সব নিয়তি, বুঝলেন না? কার যে কখন কী হয়?'

জীবন চক্রবর্তী বলল,—'আপনার হ'ল গিয়ে active service, টেবিল-চেয়ারে বসে তো কলম পেষা নয়। সর্বত্র দৌড়ে গিয়ে খবর সংগ্রহ করে আনতে হবে। তবেই না কাগজের সুনাম। সেল বাড়বে।'

চারটে থেকে ছটা পর্যন্ত ভিজিটিং আওয়ার্স। সকালেও খানিকটা সময় অবশ্য ভিজিটার্সেদের জন্য বরাদ্দ করা আছে। কিন্তু তখন একেবারে নিকটাত্মীয় ছাড়া বড় একটা কেউ আসে না।

একদিন বাদেই কিন্তু বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার্সে ব্রজবিলাস সরকার এসে হাজির। তাকে দেখেই দীপ্তেন্দু খুব অবাক হয়ে বলল,—'দাদু, আপনি?'

'কেন?' ব্রজবিলাস চিন্তিতমুখে প্রশ্নটা তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন,—'তোমার এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমি না এসে পারি?'

'না মানে আপনি খবরটা কার কাছে পেলেন?'

'বা রে। সব কাগজেই তো এই accident-এর ঘটনা বেরিয়েছে। কোনোটায় বেশি, কোনোটায় কম। তবে আমি দেখেছি স্টেটস্‌ম্যানে। তাতেই লিখেছে বঙ্গভূমি কাগজের রিপোর্টার দীপ্তেন্দু চট্টোপাধ্যায় গুরুতর আহত হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।'

'কাগজে ওসব বাড়িয়ে লেখে। তেমন কিছু গুরুতর নয়।'

'কে বললে?' ব্রজবিলাস মৃদু হাসলেন। খবর পড়ার ঢঙে বললেন,—'তোমাকে তিনটে স্টিচ্ দিতে হয়েছে। নাহলে রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। তাছাড়া তুমি অজ্ঞান হয়ে গেছলে। ভাগ্যিস ওই পুলিশ অফিসার তোমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নইলে সেই অবস্থায় আরো ঘন্টাখানেক পড়ে থাকলে কী হ'ত কেউ বলতে পারে?'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'ওপেন সেশনের দিন আপনি কি সভায় এসেছিলেন?'

'নাহ্। এই বয়সে ওই হুড়োহুড়ি আর সহ্য হয় না। পরাশরকে জানিয়ে দিয়েছিলাম প্রকাশ্য অধিবেশনের দিন আমাকে কিন্তু আর যেতে ব'ল না।'

'ভালো করেছিলেন দাদু। ওহ্! সে কী অবস্থা। ওই ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেলে আপনাকে বোধহয় আর বের করে আনাই যেত না।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'পরদিন নিউজ পেপারে সব জানতে পেরেই আমি বঙ্গভূমি কাগজের অফিসে টেলিফোন করেছিলাম। তোমাদের সম্পাদক রতিকান্ত বসু বললেন,—নাহ্! আঘাত তত গুরুতর নয়। তবে তিনটে স্টিচ্ দিতে হয়েছে। নইলে রক্তপড়া বন্ধ হচ্ছিল না। এখন দিন সাতেক bed rest। তারপর হাসপাতাল থেকে স্টিচ্ কেটে দিয়ে রিলিজ করবে।'

দীপ্তেন্দু বিরক্তির সঙ্গে জানাল,—'চুপচাপ এমনি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে দাদু? এখন ইচ্ছে করলেই ওরা আমাকে ছেড়ে দিতে পারেন। কিন্তু সম্পাদক মশায় সেটি হতে দিচ্ছেন না।'

'উনি ঠিক কাজই করেছেন। তুমি এখনও বেশ দুর্বল দীপ্তেন্দু। কয়েকটা দিন না হয় রেস্ট নিলে। খাটাখাটুনি তো সারাজীবন পড়ে রয়েছে।'

কথার মধ্যেই এক ফাঁকে দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আপনার মহারানীর খবর কী দাদু? এখানে এসে মেডিক্যাল কলেজে জি অ্যান্ড ও তে এম. এস. করবে না?'

'কী জানি! ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বোধহয় বাড়ির বউয়ের further studies-এ মত দেয়নি। কিন্তু মহারানী কি ছাড়ার পাত্র? দেখবে একদিন ঠিক ব্যাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে হাউস-স্টাফশিপ নেবার জন্য এসে হাজির হবে।'

দিন দুই বাদে ভিজিটিং আওয়ার্সে নীলিমা দত্ত এসে উপস্থিত। তাকে দেখেই দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আপনি সেরে উঠেছেন নীলিমাদি? আমি ভাবতাম অফিসের কত লোক তো এসে দেখা করে গেল। কিন্তু কই, নীলিমাদি তো এলেন না।'

'আসব কেমন করে?' নীলিমা ঈষৎ হাসলেন। বললেন,—'আজই তো জয়েন করেছি। গতকাল বিকেলে রতিকান্ত বাবু নিজে টেলিফোন করেছিলেন। রিপোর্টারের অভাবে কাগজ নাকি ডুবতে বসেছে। তারপর তুমি হাসপাতালে পড়ে আছ। আমি তাড়াতাড়ি জয়েন না করলেই নয়। অগত্যা ভাঙা শরীর নিয়ে আসতেই হ'ল।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমি তো জয়েন করতে চাই, কিন্তু উনি ফতোয়া দিয়ে গেছেন অন্তত সাতদিন কমপ্লিট রেস্টে থাকতে হবে।'

দু-চার কথার পব নীলিমা দত্ত হঠাৎ বললেন,—'আজ তোমার একটা টেলিফোন এসেছিল।'

'আমার?' দীপ্তেন্দু চিন্তিত মুখে তাকাল। বলল,—'কে টেলিফোন করল?'

'নাম বলেনি। তবে মহিলার গলা। তোমার কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় হতে পারে।'

'ধুর!' দীপ্তেন্দু মাথা নেড়ে বলল,—'আমার আবার আত্মীয়-স্বজন কে আছে এখানে? মহিলা তো বহুদূর—।'

'তাহলে কোনো বান্ধবী।' নীলিমা দত্ত মুচকি হেসে বললেন,—'মানে তোমার কোনো মেয়ে-বন্ধু হতে পারে।'

'কলকাতায় আমার কোনো মেয়ে-বন্ধু নেই।' দীপ্তেন্দু পরিষ্কার জবাব দিল।

পাঁচ দিন বাদে ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হবার মুখে তিনকড়ি হাজরা দেখা করতে এলো। এসেই কাঁদ-কাঁদ মুখ করে বলল,—'আমাকে ক্ষমা করুন ভাই।'

'ক্ষমা? কেন? কী অপরাধ করেছেন?' দীপ্তেন্দু হাসল।

'ছি-ছি, না বুঝে আকথা-কুকথা কত কী বলেছি আপনাকে। আমার অপরাধের শেষ নেই।'

'ছাড়ুন তো ওসব কথা।' দীপ্তেন্দু তাকে মৃদু ধমক দিল। বলল,—'সব ঘটনা আমি ভুলে গেছি।'

'আপনি মহৎ, দেবতা। নইলে কি আমাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসতেন?'

দীপ্তেন্দু মুচকি হেসে শুধোল,—'কেমন আছেন বলুন? বেগুনিয়ার খবর-টবর পেয়েছেন?'

তিনকড়ি বলল,—'আগামী শনিবার বেগুনিয়া যাব ঠিক করেছি। কাল-পরশুই ওভার টাইমের পাওনা টাকাটা কোম্পানী দেবে বলে ডিক্লেয়ার করেছে। তাই কোনো অসুবিধে নেই।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'বেশ। শুনে খুশি হলাম। যান, বেগুনিয়া গিয়ে একবার ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীকে দেখে আসুন।'

তার অপরাধ স্খালন করতে তিনকড়ি বলল,—'গত শনিবার কেন যেতে পারলাম না জানেন? সকালে কাগজ খুলেই দেখলাম ব্ল্যাক প্যান্থার রেসে দৌড়ুবে। অমনি মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। ভাবলাম শনিবার ওই ঘোড়াটার ওপর win খেলব। win এ জেতা মানে বোঝেন তো? তিরিশ টাকায় প্রায় শ'-আড়াই টাকা উঠে আসবে। তাহলে আপনার দেনাটাও শোধ করতে পারব। আর বেগুনিয়া গিয়ে ইন্দুমতীর হাতে শ'খানেক টাকা দিয়ে আসব। কিন্তু কপাল মন্দ ভাই। ব্ল্যাক প্যান্থার রেসে পিছনে পড়ে রইল। আর বাজীমাত করল মুর অ্যাভেনিউয়ের

দরিপাদেব সুইট হার্ট নামেব ঘোড়াটা।'

দীপ্তেন্দু পরামর্শ দিল—'আপনি ববং রেস খেলাটাই ছেড়ে দিন তিনকড়ি বাবু। মিছিমিছি কত টাকা বরবাদ হচ্ছে বলুন।'

তিনকড়ি হাজরা একটা হতাশ ভঙ্গি করে বলল,—'প্রতিবার বেসের মাঠ থেকে ফিরে আপনি যা বললেন, আমি তাই ভাবি। তারপর শনিবার এলেই মনটা কেমন ছটফট করতে থাকে। পকেটে টাকা থাকলেই কে যেন পা দুটোকে চুম্বকের মতো রেসের মাঠের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তারপর সব খুইয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসি।'

সাতদিনের মাথায় দীপ্তেন্দু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। ডাক্তার একটা ফিট সার্টিফিকেট দিতে ভুল করে নি। পরদিনই বঙ্গভূমি কাগজের অফিসে গিয়ে সে কাজে যোগ দিল।

রতিকান্তবাবু তাকে দেখেই বললেন,—'আসুন, আসুন। শরীর সুস্থ তো? দুর্বলতা নেই?'

'আজ্ঞে না।' দীপ্তেন্দু সায় দিল।

'তাহলে নতুন উৎসাহে এবার কাজে নেমে পড়ুন। আর হ্যাঁ, এখন থেকে নীলিমা দত্তের সঙ্গে আপনার যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং independently সব কাজই করবেন। নতুন একটা Press Card আপনার নামে ইসু করা হচ্ছে। ওটা সঙ্গে রাখবেন।'

দীপ্তেন্দু তার চেয়ারে এসে বসবার পরই টেলিফোনটা ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নীলিমা দত্ত বলল,—'হ্যালো।' তারপর সে যেন কাকে উদ্দেশ্য করে জানাল,—'হ্যাঁ। উনি আজই জয়েন করেছেন। ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।'

দীপ্তেন্দু গিয়ে রিসিভার তুলতেই অপরপ্রান্ত থেকে সে বলল, —'আমি অগ্নিবীণা।'

'ও, তুমি? কেমন আছ বল?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

অগ্নিবীণা সে কথার জবাব না দিয়ে কিঞ্চিৎ অভিমান মিশ্রিত কণ্ঠে বলল,—'আপনি কি জলপাইগুড়িতেও আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবেন না?'

এ কথার উত্তর খুঁজতে গিয়ে দীপ্তেন্দু মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল নীলিমা দত্ত মাঝে মাঝেই আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে.........

॥ পাঁচ ॥

ঈশ্বর সহায়। হয়তো সেজন্যই রতিকান্ত বসুর খাস বেয়ারা এসে নীলিমা দত্তকে তখনই সম্পাদকের ঘরে যেতে বলল। তলব শুনেই নীলিমা দত্ত দ্বিরুক্তি না করে রতিকান্ত বসুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। রিসিভারটা হাতে নিয়ে দীপ্তেন্দু এবার স্বচ্ছন্দে শুধোল,—'তোমাকে জলপাইগুড়িতে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছি না হঠাৎ একথা মনে হ'ল কেন?'

অগ্নিবীণা বলল,—'বা রে! শান্তিতে থাকব কেমন করে? কংগ্রেসের ওপেন সেশন কভার করতে গিয়ে ভিড়ের চাপে আপনি একটা খুঁটির গায়ে ছিটকে পড়েছিলেন। আর তখনই একটা বড় পেরেক আপনার মাথার পিছন দিকে ঢুকে যায়। ফলে হেমারেজ শুরু হয়। অজ্ঞান অবস্থায় একজন পুলিশ অফিসার আপনাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছিল বলেই রক্ষে।'

দীপ্তেন্দু মুচকি হেসে বলল,—'জলপাইগুড়ি এখান থেকে পৌনে চার'শ মাইল রেলপথ বলে শুনেছি। কিন্তু তাতে কী যায় আসে? অতদূরে থেকেও তুমি তো দেখছি দিব্যি সব খবর জোগাড় করে বসে আছ।'

অগ্নিবীণা বলল,—'এসব খবর জোগাড় করতে হয় না মশায়। একদিন বাদেই স্টেটসম্যানের পাতায় ডিটেলস্ ছাপা হয়েছে। তাছাড়া মেডিক্যাল কলেজে আপনার সঙ্গে দেখা করে এসে রাত্তিরেই দাদু আমাকে ট্রাঙ্ককল করে সব বলেছেন। সাতদিন বাদে স্টিচ্ কাটার পর ওরা আপনাকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দেবে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'জানো বুলু, মেডিক্যাল কলেজের পেয়িং বেডে শুয়ে আমার কেবল মনে হ'ত এখন তুমি যদি এখানে হাউস-সার্জন থাকতে। তাহলে হয়তো তোমাকেই আমার চিকিৎসা করতে হত। স্টিচ্ দেওয়া, রোজ ড্রেসিং, তারপর স্টিচ্ কাটা, —সব।'

অগ্নিবীণা চাপা হাসিতে উচ্ছল হয়ে বলল,—'আপনি বেশ লোক দীপ্তেন্দুদা। আচ্ছা আমি এখন মেডিক্যাল কলেজে হাউস-সার্জন থাকলেও সার্জিকাল ওয়ার্ডে যেতাম কেমন করে? আমি তো গাইনি অ্যাণ্ড অবস্টেরিকস্ ডিপার্টমেন্টের হাউস-সার্জন হতাম। যেখানে শুধু মেয়েদের চিকিৎসা হয়।'

দীপ্তেন্দু নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল,—'তা ঠিক। কিন্তু কলকাতায় আসতে তোমার এত দেরি হচ্ছে কেন? শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বুঝি further studies-এ অমত করছে?'

'হ্যাঁ। সে তো করছেই। তবে এখন একটা টানাপোড়েন চলছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমিই জিতব।'

দীপ্তেন্দু তবু জিজ্ঞেস করল, —'তোমার হাজব্যাণ্ডের কী মত? স্ত্রীকে কলকাতায় পড়তে পাঠাতে তার আপত্তি আছে?'

অগ্নিবীণা বলল, 'এসব বিষয়ে সে খুব indifferent। তার মতও নেই আবার অমতও নেই। আসলে এই ব্যাপারে বিরুদ্ধ মত আমার শ্বাশুড়ির। উনি চান না বাড়ির বউ আবার কলকাতায় গিযে ডাক্তারি পড়া শুরু করে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'তাহলে তো মুস্কিল। তোমার পক্ষে কলকাতায় আসা তো অসম্ভব দেখছি।'

'কে বললে?' অগ্নিবীণা প্রশ্নটা তাকেই ছুড়ে দিল। বলল,—'দেখবেন শেষপর্যন্ত ঠিক একদিন হাউস-স্টাফশিপ শুরু করতে কলকাতায় গিয়ে হাজির হবো।'

'ইউ আর ওয়েলকাম। কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে রাখছি।'

'বাব্বা!' অগ্নিবীণা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল,—'কেমন সুন্দর কথা বলতে শিখেছেন। রিপোর্টার হয়ে আপনার রীতিমত উন্নতি হয়েছে।'

দীপ্তেন্দু সহাস্যে জানাল,—'কী করি বল? রিপোর্টারের ভাষাই তো ভরসা।'

টেলিফোনের তারে অগ্নিবীণার কণ্ঠস্বর ফের ভেসে এলো,—'শুনুন আসল কথাটাই তো বলা হয় নি।'

অপাঙ্গে চারপাশে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল দীপ্তেন্দু। নাহ্! যে যার কাজে ব্যস্ত। ঈষৎ চাপা গলায় সে শুধোল, —'আবার কী কথা বুলু? তুমি হঠাৎ এসে উদয় হবে আমি তো সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

'কিন্তু তার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে কাজেকর্মে যেখানেই যান কখনও বেশি রিস্ক নিয়ে ফেলবেন না।'

'সেটা কি সম্ভব? আমাদের কাজে তো রিস্ক রয়েছে বুলু।'

'নাহ্। তেমন রিস্ক কখনও নিতে পারবেন না,. যাতে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে মাথার পেছনে পেরেক ঢুকে যায়।' এক মুহূর্ত থেমে অগ্নিবীণা ফের বলল,—'জানেন এ রকম কেসে কনকাসেন অফ ব্রেন হতে পারত।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল, —'তোমাকে একটা কথা শুধোব বুলু?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়। কী কথা বলুন।'

'জলপাইগুড়ি রওনা হবার সময় ট্রেনে বসে তুমি বলেছিলে পরস্ত্রীকে ভালবাসতে নেই। এখন যদি জিজ্ঞেস করি পরপুরুষের ভালমন্দের জন্য তোমারই বা এত ভাবনা কিসের বুলু? জানতে পারলে সেটা কি পাঁচজনে ভাল চোখে দেখবে?'

'জানি না, যান।' অগ্নিবীণা একটা ঢোক গিলে ঈষৎ স্বচ্ছন্দ হযে বলল,—'উঃ! আপনার সঙ্গে দেখছি কথায় পেরে ওঠার জো নেই। আচ্ছা, একটা মানুষের বিপদে-আপদে তার জন্য একটু ভাবনা-চিন্তা হওয়া কি দোষের?'

'কে বললে দোষের?'

'এই তো আপনি বললেন।' অগ্নিবীণা কণ্ঠস্বর নরম করে জানাল,—'এখন তো

দেখছি আপনার ওপব নজর রাখাব জন্যই আমাকে কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে।'

'তাই নাকি? সেটা আমার পক্ষে মন্দ নয়।' দীপ্তেন্দু পরিহাস কবে জানাল,—'কিন্তু সাবধান, এই মাত্তর যে কথাটা বললে সেটা আর কারো কাছে ফাঁস ক'র না।'

ঠিক তখনই নীলিমা দত্তকে ঘরে ঢুকতে দেখে দীপ্তেন্দু লাইনটা ছেড়ে দিল। এতক্ষণ ধরে সে টেলিফোনে একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছিল জানলে নীলিমা দত্ত নিশ্চয় একটু বাঁকা হাসতেন।

দীপ্তেন্দু চেয়ারে বসে নিজেই জিজ্ঞেস কবল, —'সম্পাদক ডেকেছিলেন কেন নীলিমাদি?'

নীলিমা দত্ত এক পলক তার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,—'তোমাকেও খুঁজছিলেন। কিন্তু আমি বারণ করলাম।'

'বারণ করলেন মানে?' কারণটা জানার জন্য দীপ্তেন্দু ভুরু কোঁচকাল।

'মানে কিছু নয়।' নীলিমা দত্ত সহাস্যে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, 'রতিকান্তবাবুকে বললাম জলপাইগুড়ি থেকে দীপ্তেন্দুর একটা ট্রাঙ্ককল এসেছে। এক ভদ্রমহিলা কথা বলছেন।'

'ও হ্যাঁ। মানে টেলিফোনটা এমনি করেছিল।'

নীলিমা দত্ত মুচকি হেসে শুধোলেন,—'মেয়েটি কে?'

'ইয়ে মানে আমাদের গ্রামেরই।' দীপ্তেন্দু আমতা আমতা করল।

নীলিমা দত্ত জিজ্ঞেস করলেন,—'তোমার কেউ হয়? মানে আত্মীয়া—'

'নাহ। সে রকম কিছু নয়। অগ্নিবীণা মানে মেয়েটি ব্রজবিলাস সরকারের নাতনি। আপনি নিশ্চয় তাঁর নাম শুনেছেন?'

'শুনেছি বৈকি।' নীলিমা ভুরু তুলে তাকালেন। বললেন,—'উনি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা। সম্ভবত তারও আগে বিপ্লবী ছিলেন।'

'ঠিক ধরেছেন। দাদু মানে বিপ্লবী ব্রজবিলাস সরকারের একসময় দ্বীপান্তর হয়েছিল। গান্ধীজীর হস্তক্ষেপের ফলে সেই আদেশ নাকি রদ হয়।'

নীলিমা দত্ত মুচকি হেসে শুধোলেন,—'তা এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?'

'বেশিদিন নয়। তবে মাঝখানে তিন বছর আমি তো আবার মধ্যপ্রদেশে ছিলাম।'

নীলিমা দত্ত জিজ্ঞেস করলেন,—'মেয়েটি জলপাইগুড়িতে থাকে? কী করে সেখানে?'

'বা রে! জলপাইগুড়িতেই তো ওর শ্বশুরবাড়ি। তবে সেখানকার একটা চা-বাগানের হাসপাতালে সে ভিজিটিং মেডিক্যাল অফিসার।'

'তাই নাকি? মেয়েটি তাহলে ডাক্তার?'

'হ্যাঁ, স্টুডেন্ট লাইফে রীতিমত ভালো ছাত্রী ছিল, হঠাৎ বিয়ের ঠিক হয়ে গেল

বলে ওর আর পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট করা হয়ে ওঠেনি। এখন চেষ্টা করছে মেডিক্যাল কলেজ থেকে হাউসস্টাফশিপ কম্‌প্লিট করে গাইনি অ্যাণ্ড অবস্টেরিকসে এম. এস. করবে।'

নীলিমা দত্ত বললেন,—'তুমি তো ওর অনেক খবরই রাখ দেখছি। আমারও মনে হ'ল তোমার এই অ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে মেয়েটি বেশ উদ্বিগ্ন,—মানে চিন্তিত হয়ে পড়েছে।'

'হ্যাঁ, মানে কাগজে সব ছাপা হয়েছিল কিনা, তাই দেখেই অগ্নিবীণা ব্যস্ত হয়ে এখানে টেলিফোন করেছিল।'

'ওর নাম বুঝি অগ্নিবীণা?'

'হ্যাঁ, ব্রজবিলাস সরকার মানে দাদু ওর এই নাম রেখেছেন।'

নীলিমা দত্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'তুমি তাহলে সম্পাদকমশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে এসো দীপ্তেন্দু। অনেকক্ষণ আগেই তোমার খোঁজ করেছিলেন।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়, যাই তাহলে। হয়তো জরুরী কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।'

দীপ্তেন্দু ঘরে ঢুকতেই রতিকান্ত বসু তাকে সাদর আহ্বান জানালেন। বললেন,—'আসুন আসুন। নীলিমা বলছিল আপনার নাকি জলপাইগুড়ি থেকে একটা জরুরী টেলিফোন এসেছে। তাই তখন আর আপনাকে ডাকাডাকি করিনি, তা জলপাইগুড়ি থেকে কোনো খারাপ খবর-টবর আসেনি তো?'

'না-না, ওসব কিছু নয়। আপনি তখনই আমাকে ডাকলে পারতেন।'

'বসুন বসুন। আসল ব্যাপারটা হল একটা জরুরী বিষয়ে আমাদের তৈরি হতে হবে। তার জন্যই একটা টিম মানে কাজটা সকলের মধ্যে বন্টন করে দিতে চাই। আর সেই বিষয় নিয়েই আপনার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।'

'কাজটা কী স্যর?'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'এই মাত্র মানে ঘন্টাখানেকও হবে না দিল্লীর খবর পেলাম ষোলই ফেব্রুয়ারী থেকে পঁচিশে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে।'

'তাই নাকি?' দীপ্তেন্দু উত্তেজিত বোধ করল। শুধোল, —'তাহলে কলকাতায় কবে ভোট হচ্ছে?'

রতিকান্ত বসু একটুও চিন্তা না করে বললেন, —'পঁচিশে ফেব্রুয়ারী মানে শেষ দিন। ওই দিন শুধু কলকাতায় নয় হাওড়াতেও ভোটপর্ব সমাপ্ত হবে।' সম্পাদক আরো কী বলেন শোনার জন্য দীপ্তেন্দু সাগ্রহে তাকিয়ে রইল।

রতিকান্ত বসু বললেন,—'আরো একটা নতুন খবর আছে। বেতার মারফৎ নির্বাচনী প্রচারের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন এবং এই নির্বাচনেই সেটি

কার্যকর হচ্ছে।'

'তাই নাকি?' দীপ্তেন্দু শুনে উৎসাহিত বোধ করল।

রতিকান্ত বসু বললেন—'ষোলটি রাজনৈতিক দলকে পনের মিনিট করে তেইশ দিন বক্তব্য প্রচারের সুযোগ দেওয়া হবে। এছাড়া—' রতিকান্ত বসু মুখ তুলে ফের দীপ্তেন্দুকে লক্ষ করে বললেন,—'এবার ভোটে আর একটি নতুন ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।'

'সেটা কী?'

'আগে একটি কেন্দ্রে প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য আলাদা ব্যালট বাক্স দেওয়া হত। এবার থেকে ভোট দেওয়ার জন্য একটিই ব্যালট বাক্স থাকবে। যে কোনো প্রার্থীর জন্য ভোট দিন, ব্যালট পেপার ওই একই বাক্সে জমা পড়বে। তবে কেন্দ্রীয় আসনে নির্বাচনের জন্য একটি ব্যালট বাক্স আর বিধানসভায় নির্বাচনের জন্য একটি আলাদা বাক্স থাকবে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'ভোট শেষ হ'লে ব্যালট বাক্সের শীল ভেঙে সব ব্যালট পেপার গুনে তারপর বিভিন্ন প্রার্থীর নামে আলাদা আলাদা ভাবে সাজানো হবে।'

রতিকান্ত বসু বললেন, —'আপনাকে যে কাজের জন্য ডেকেছি এখন সেটা বলছি। ভোটের আগে বিভিন্ন কেন্দ্রের হাল-হকিকৎ নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করব বলে ঠিক করেছি। কোন কেন্দ্রের কী অবস্থা। গতবার ভোটে কোন প্রার্থী সেখানে জিতেছিল, এবার কার জেতার সম্ভাবনা বেশি, আমাদের নিবন্ধে এসব কথাই তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে। তার জন্য আপনাকে কয়েকটি আসন নিয়ে লিখতে বলব। তবে কলকাতার আসনগুলি সম্বন্ধে লেখার জন্য অনেকে রয়েছে। আপনাকে ভার দিচ্ছি রাঢ় বাংলার নির্বাচনী অবস্থার রূপরেখা তুলে ধরতে। বিশেষ করে বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং বীরভূম নিয়ে লিখতে হবে। সময় থাকলে এবং কাগজে স্থানাভাব না হলে পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি আসন নিয়েও লিখতে হতে পারে।'

'প্রথম কিস্তির লেখাটা কবে বের করতে চান?'

'খুব তাড়াতাড়ি, আজ ধরুন জানুয়ারী মাসের দশ তারিখ হ'ল। প্রথম কিস্তির লেখাটা এই মাসের শেষাশেষি বের করতে পারলে ভালো হয়।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমি খুব চেষ্টা করব স্যার। তবে আমার ইচ্ছে প্রথমে বর্ধমান জেলা নিয়ে শুরু করি।'

'বেশ তো। খুব ভালো প্রস্তাব। তাহলে বরং আর একটা কাজ করুন। প্রথম কিস্তিটা সুপরিচিত কম্যুনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরীর কেন্দ্রকে নিয়ে শুরু করুন। যতদূর জানি এবার কংগ্রেস থেকে ওর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বর্ধমানের অধিরানী মহারানী রাধারানী মহতাব। আমার ধারণা এই নির্বাচনে বিনয় চৌধুরী মহাশয় অনেক ভোটের ব্যবধানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাধারানী মহতাবকে পিছনে ফেলে

বিধানসভায় নির্বাচিত হবেন।'

'সেটাই সম্ভব।' দীপ্তেন্দু জবাব দিল। বলল,—'কম্যুনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরী দীর্ঘকাল ধরে বর্ধমানে নানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। শ্রমিক-কৃষক এবং মেহনতী মানুষের মধ্যে তার প্রভাব বেশি। ফলে নির্বাচনে তিনিই যে জয়ী হবেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।'

রতিকান্ত বসু বললেন, —'তাহলে আপনি কাজ শুরু করে দিন। পুরানো নথিপত্র ঘেঁটে গত দুবারের নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিন।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে বিনয় চৌধুরী কংগ্রেস প্রার্থী বর্ধমানরাজ উদয়চাঁদ মহতাবকে পরাজিত করে বিধানসভায় নির্বাচিত হন।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'আপনার ঠিকই মনে হয়েছে। ১৯৫২ সালে মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাবকে নির্বাচনী যুদ্ধে পরাস্ত করা একটা কঠিন ব্যাপার ছিল। হাজার হোক রাজা-মহারাজার সঙ্গে নির্বাচনী সমরে একজন সাধারণ মানুষের জয়ী হওয়াটা তখন অনেকের চোখেই এক চমকপ্রদ ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। এবং বিনয় চৌধুরী সেই অসাধ্যসাধন করেছিলেন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমার দ্বিতীয় কিস্তির লেখা হবে বাঁকুড়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত ডাঃ অনাথবন্ধু রায়ের নির্বাচন নিয়ে। এই কেন্দ্রে যারা প্রার্থী হতে পারেন তাদের মধ্যে ডাঃ অনাথবন্ধু রায় ছাড়াও আরো একজন চিকিৎসক থাকবেন বলে শোনা যাচ্ছে। ইনি সি. পি. আই প্রার্থী ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'ঠিক আছে। আপনি কাজে নেমে পড়ুন। আপনার প্রথম কিস্তির লেখাটার জন্যে আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করব।'

সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে দীপ্তেন্দু আবার নিজের চেয়ারে এসে বসতেই নীলিমা দত্ত শুধোলেন,

'—কী? সম্পাদক আপনাকে কোন জেলার নির্বাচনী প্রতিবেদন লেখার ভার দিলেন?'

দীপ্তেন্দু হেসে জিজ্ঞেস করল,—'নীলিমাদি, আপনি নিশ্চয় কলকাতার কোনো আকর্ষক কেন্দ্রকে নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করবেন?'

'হ্যাঁ।' নীলিমা দত্ত হাসলেন। বললেন,—'আন্দাজ করো দেখি আমার ভাগ্যে কোন কেন্দ্রটি পড়েছে?'

'বা রে! সেটা আমি কেমন করে বলব?'

নীলিমা দত্ত এবার জবাব দিলেন—'যে কেন্দ্রটি থেকে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমি কভার করব রাঢ় বাংলার বিশেষ কয়েকটি কেন্দ্রকে। প্রথম কিস্তিটা হবে কম্যুনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরী বনাম কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী

বর্ধমানের মহারানী রাধারানী মহতাবকে নিয়ে।'

রাত আটটা নাগাদ দীপ্তেন্দু অফিস থেকে বেরিয়ে দেখল তাদের কাগজের ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সাব-এডিটর সোমেশ্বর ব্যানার্জী বাসস্টপে দাঁড়িয়ে।

দীপ্তেন্দুকে আসতে দেখেই সোমেশ্বর সখেদে জানাল, —'ঝাড়া আধঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি মশায়, তা বাসের পাত্তা নেই।' বিরক্তি প্রকাশ করে সে আবার বলল,—'খামোকা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করবেন? তার চেয়ে বরং চলুন হাঁটতে হাঁটতে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে এগিয়ে যাই।'

'হেঁটে যাবেন? মানে আপনি তো সেই বাগবাজারে থাকেন। অতটা রাস্তা—' দীপ্তেন্দু তার মুখের দিকে তাকাল।

সোমেশ্বর বলল—'বাসের জন্য হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে সে ঢের ভালো। চলুন না,—শীতের রাত্তির, হাঁটলে কষ্ট হবে না। বিবেকানন্দ রোড এলেই আপনি পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের দিকে চলে যাবেন। আর আমি এগোব শ্যামবাজার পাঁচ-মাথার দিকে।'

কথামতো দুজনে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে হাঁটছিল। হঠাৎ শ্রীমানী মার্কেটের কাছে এসে সোমেশ্বর প্রস্তাব করল,

—'চলুন মশায়, মার্কেটের ভেতর একটা ভালো চায়ের দোকান আছে। চমৎকার চা বানায়, বেশ জমিয়ে দু-কাপ চা নিয়ে বসা যাবে।'

দীপ্তেন্দুর আপত্তি ছিল না। এক কাপ চা পেলে এখন মন্দ হয় না। এতটা পথ হেঁটে ক্লান্তও লাগছে। রাত আর কত হবে? কিন্তু এরই মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। গরম চা পেটে পড়লে শরীরটা কিঞ্চিৎ চাঙ্গা হবে।

মার্কেটের ভেতর ঢুকে সোমেশ্বর তাকে সেই চায়ের দোকানে নিয়ে এলো। এমনি সাধারণ দোকান। ঘরের ভেতর গোটা দশ-বারো চেয়ার আর তিনটে টেবিল। কাউন্টারের লোকটি সোমেশ্বরকে চেনে বলে মনে হল। তাকে ঢুকতে দেখেই অভ্যর্থনা করল,—'আসুন, আসুন। অনেকদিন তো আর এদিকে পা মাড়ান নি।'

সোমেশ্বর মুচকি হেসে জবাব দিল,—'সময় পাই না মদনবাবু। কাগজের অফিসের চাকরি, বোঝেন তো? সকালে শ্যামবাজারে, তো বিকেলে শ্যামনগরে। কখন কোথায় যে কাজ পড়বে তা আগাম জানতে পারি না।'

দীপ্তেন্দুর দিকে তাকিয়ে কাউন্টারের লোকটি শুধোল,—'ইনি?'

'আমার সহকর্মী। মানে বঙ্গভূমি কাগজের রিপোর্টার। ওকে ধরে নিয়ে এলাম আপনার দোকানের চা খাওয়াব বলে। সন্দেহ ছিল, এত রাত্তির অব্দি খোলা থাকবে কিনা।'

কাউন্টারের লোকটি বলল,—'রাত নটা অব্দি আমরা দোকান খুলে রাখি। মার্কেট কিনা,—নটা-দশটা অব্দি লোক আসা-যাওয়া করে।'

সোমেশ্বর বলল,—'তাহলে চটপট বানিয়ে দিক। দুটো ডবল-হাফ স্পেশ্যাল।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করল,—'তারপর, বলুন কেমন লাগছে আমাদের অফিস?'

'ভালো।' দীপ্তেন্দু হেসে জবাব দিল। বলল,—'কদিন আর এসেছি। এখনও কারো সঙ্গে তেমন আলাপ জমেনি।'

'বেশি আলাপ না হওয়াই ভালো। আসলে কাগজের অফিসে যত নির্লিপ্ত মানে দূরে দূরে থাকবেন ততই মঙ্গল।'

'তার মানে?'

'মানে বুঝলেন না?'

দীপ্তেন্দু একটু অবাক হয়ে জানাল,—'নাহ্।'

সোমেশ্বর ভুরু কুঁচকে শুধোল,—'আচ্ছা মশায়, অফিসে আপনার বস্ কে বলুন তো?'

'কেন? চিফ রিপোর্টার সুধাময়বাবু। তার ওপরে খোদ সম্পাদক —রতিকান্ত বসু।'

'আবার সম্পাদকের ওপরেও কিন্তু আর একজন বসে আছেন। তার নাম শুনেছেন?'

'আপনি কি কাগজের মালিকের কথা বলছেন?'

'এক্‌জাক্টলি, উনি সৌমিত্রশংকর দত্ত। জেনে রাখুন এই অফিসে ওর নিজস্ব কিছু লোক আছে। তাদের মারফৎ অফিসের সব খবরাখবর উনি জানতে পারেন।'

'বলেন কী?' দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে তাকাল।

সোমেশ্বর বলল,—'তাদের মধ্যে একজনকে অবশ্য আপনি ভালো করে চেনেন।'

'কে বলুন তো?' দীপ্তেন্দু জিজ্ঞাসু হ'ল।

'নীলিমা দত্ত। যার কাছে আপনি বেশ কিছুদিন শিক্ষানবিশী করেছেন।'

'নীলিমাদি?' দীপ্তেন্দু অস্ফুটে শুধোল, তার মনে পড়ল এখানে জয়েন করার পরই নীলিমাদি তাকে জিগ্যেস করেছিলেন,—'চাকরিটা পেতে কে আপনাকে সাহায্য করল?'

দীপ্তেন্দু সরল মনে জবাব দিয়েছিল, আমার এক বন্ধু। ওর নাম সন্দীপ। রতিকান্ত বসুর কাছে ওই আমাকে নিয়ে এসেছিল।'

নীলামাদি অবশ্য আর কোনো প্রশ্ন করেন নি। তবে দীপ্তেন্দুর যে একটা খুঁটির জোর আছে সে কথা বুঝতে তার অসুবিধে হয় নি।

সোমেশ্বর সেই একই কথা বলল,—'এ অফিসে খুঁটির জোর না থাকলে কারো চাকরি হয় না, বুঝলেন?'

দীপ্তেন্দু কোনো জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

সোমেশ্বর বলল,—'এখানে সাবধানে কথা বলবেন। মনে রাখবেন দেয়ালেরও

কান আছে। হঠাৎ বেফাঁস কিছু একটা বলে ফেললে পরদিনই সেটা মালিকের কানে চলে যাবে।'

দীপ্তেন্দু এত সব ব্যাপার জানত না। সে চায়ের কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে সাত-পাঁচ ভাবছিল।

সোমেশ্বর বলল,—'তবে আপনার চিন্তা নেই মশায়, তার দুটো কারণ। প্রথমটা হল যে আপনার রিপোর্টিঙের কাজ ভালো। যা ইতিমধ্যেই দশজনের নজরে পড়েছে।'

'আর দ্বিতীয়টা?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

সোমেশ্বর হেসে জবাব দিল,—'সেটা হয়তো আপনিও জানেন। You are in the good book of the Editor.'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সোমেশ্বর ফের শুধোল,—'নীলিমা দত্তকে আপনার কেমন মনে হয়?'

'কেন? ভালো বলেই তো মনে হয়েছে।'

'হ্যাঁ। তবে দু-চার দিনের পরিচয়ে তো মানুষকে চেনা যায় না, আচ্ছা ওর পার্সোনাল লাইফ সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন?'

'নাহ্।' দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল।

সোমেশ্বর বলল,—'শোনা যায় স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে দুজনেই আলাদা। ছাড়াছাড়ি হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বিয়ের পর নীলিমা দত্তের একটি মেয়ে হয়। সে মায়ের কাছেই থাকে। ক্লাস নাইনে'এ পড়ে। 'ভদ্রমহিলার হাজব্যাণ্ড কিন্তু একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। আপনিও হয়তো তার নাম শুনেছেন।'

'তাই নাকি? কী নাম বলুন তো—

'প্রতিভাময় দত্ত। বিখ্যাত সুরকার এবং সঙ্গীতজ্ঞ। ওর গানের সুরেই অনেক ফিল্ম হিট করেছে।'

দীপ্তেন্দু একটু ভেবে বলল,—'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। 'শেষ গানের খেয়া' ছবিতে উনিই সুর দিয়েছেন। That was a hit movie.'

'ঠিক বলেছেন।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'প্রতিভাময়বাবুর সঙ্গে নীলিমাদির তাহলে ছাড়াছাড়ি হয় নি?

'আপনি কি Divorce এর কথা বলছেন?' সোমেশ্বর একটু চিন্তা করে বলল,—'যদ্দুর জানি কোর্ট থেকে কোনো ডিক্রি হয় নি। তবে প্রতিভাময় দত্ত শুনেছি তার একজন পুরাতন ছাত্রীকে নিয়ে থাকেন। মেয়েটি বিধবা। বলা বাহুল্য দুজনের বিয়ে হয়েছে কিনা জানি না। But they stay together.'

'আর নীলামাদি?'

'এতদিন ওর জীবনে কেউ আসেনি বলেই জানতাম। কিন্তু এখন কানাঘুসোয় অন্য কথাও শুনতে পাচ্ছি।'

'কী রকম?' দীপ্তেন্দু মুখ তুলে তাকাল।

সোমেশ্বর বলল—'নীলিমা দত্ত এখন একজন অধ্যাপকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার তালে আছেন।'

'অধ্যাপক? কোন কলেজে পড়ান? বাড়ি কোথায়?'

সোমেশ্বর মুচকি হেসে জবাব দিল,—'নর্থ ক্যালকাটার কোন একটা কলেজে আছেন বলে শুনেছি। কিন্তু মজার ব্যাপারটা কী জানেন?'

'কী?'

'ভদ্রলোক বিবাহিত। দমদমে বউ-ছেলে, ঘর-সংসার সবই আছে।'

'তাহলে? এ বিয়ে হবে কেমন করে?'

'সেটাই প্রচণ্ড বাধা বলতে পারেন। শুনেছি অধ্যাপকের স্ত্রী ডিভোর্স দিতে নারাজ। ফলে এমন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। তবে তাতে কোনো অসুবিধে হয় নি। নীলিমা দত্ত গতমাসেই এই ভদ্রলোকের সঙ্গে গোপালপুর-অন-সী থেকে বেড়িয়ে এসেছেন।'

'এসব খবর আপনি কেমন করে জানলেন?'

'আশ্চর্য ব্যাপার। খবর কি চাপা থাকে মশায়? বিশেষ করে প্রেম বা পরকীয়া সম্পর্ক হলে। যতই চাপা দিন ও ঠিক ধোঁয়ার মতো ঠেলে ওপরে উঠবে।'

ঈষৎ হেসে সোমেশ্বর ফের জানাল,—'আমাদের অফিসেরই একজন, কিন্তু নাম জানতে চাইবেন না, দুজনকে গঞ্জাম স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে দেখেছে।'

শ্রীমানী মার্কেট থেকে ওরা বেরিয়ে এলো। সোমেশ্বর বলল,—'শুনলাম আপনি নির্বাচনী পরিস্থিতি পর্যলোচনা করতে রাঢ় বাংলা কভার করবেন।'

'হ্যাঁ আমাদের সম্পাদক মানে রতিকান্ত বসু তাই বলেছেন। আর প্রথম কিস্তিটা হবে কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরী বনাম বর্ধমানের মহারানী রাধারানী মহতাবকে নিয়ে। ভাবছি আগামী সপ্তাহেই একবার বর্ধমান ঘুরে আসব।'

সোমেশ্বর বলল,—'বর্ধমানের নির্বাচন কবে হবে এখনও সেটা ঘোষণা হয় নি। তবে ধরে নিন ফেব্রুয়ারী মাসের কুড়ি তারিখ নাগাদ হতে পারে।'

'তার মানে এই মাসের মধ্যেই মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সেই সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারও শুরু হয়ে যাবে।'

বিবেকানন্দ রোড থেকে দীপ্তেন্দু বাঁ দিকে অগ্রসর হল। তার মনে পড়ল অনেকদিন আগে যখন সে কলেজে পড়ত তখন কতবার ডাফ স্ট্রীটের বাড়ি থেকে রাতের আহার সেরে এখান থেকেই রিকশতে উঠে মেসে ফিরেছে। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ পেরিয়ে কালীকৃষ্ণ টেগোর স্ট্রীট ধরে গেলে পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের মোড় পড়বে। হাঁটতে হাঁটতে দীপ্তেন্দু লক্ষ করল দুপাশের দোকানপাট ইতিমধ্যেই

বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে শুধু দু-একটা রিকশ যাচ্ছে। শীতের রাত্রি। নটা বাজলেই পথঘাট শুনসান। গলির ভেতর থেকে একটা কুকুর বিশ্রী সুর করে কেঁদে উঠল।

তাকে দেখে মেসের ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে বলল, —'আসুন, আসুন বাবু। আমি শুধু আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। আজ জীবনবাবু পর্যন্ত আটটার মধ্যে এসে গেছেন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমার খাবারটা তুমি ঢাকা দিয়ে রেখে গেলেও পারতে।'

'তাই কখনও হয় বাবু? শীতের রাত্তির। এমনিতেই রান্নাবান্না সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাই ভাতের হাঁড়িটা আমি ঢিমে আঁচে বসিয়ে রাখি। যাতে একটু গরম থাকে। আর আপনাকে খেতে দেবার আগে মাছের ঝোলটা ছোট কড়ায় ঢেলে একবার গরম করে নিই।'

দীপ্তেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলল,—'তুমি খাবারটা ready কর ঠাকুর। আমি জামাকাপড় পাল্টে এখুনি আসছি।'

রবিবার হতেই দীপ্তেন্দুর মনে হ'ল সকালে একবার ডাফ স্ট্রীট থেকে ঘুরে আসবে। ব্রজবিলাস সরকার সেই হাসপাতালে যা একবার এসেছিলেন, তারপর থেকেই আর কোনো যোগাযোগ নেই। হয়তো দাদুর শরীরটা সুস্থ নেই। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দীপ্তেন্দুর আর খোঁজ খবর করে উঠতে পারেন নি। তাছাড়া অগ্নিবীণা শেষ পর্যন্ত কী ঠিক করল, কলকাতায় এসে মেডিক্যাল কলেজে হাউস-স্টাফশিপটা নেবে কি না সেটা জানার জন্য সে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

ডাফ স্ট্রীটের বাড়ির বৈঠকখানায় ব্রজবিলাস সরকার বসেছিলেন। তার সামনে পরাশর। পিছন থেকে হলেও দীপ্তেন্দু মানুষটাকে চিনতে পারল। ছোট্ট দুটো সিঁড়ি পেরিয়ে সে ঘরে পা দিতেই ব্রজবিলাস সহর্ষে বলে উঠলেন,—'আরে এসো এসো দীপ্তেন্দু। মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছাড়া পেয়েই নিশ্চয় কাজে যোগ দিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাও বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'কী হে পরাশর? চিনতে পারছ না একে? আমাদের দীপ্তেন্দু,—সেই যে, পাঁচালে স্বাধীনতা দিবসের দিন বক্তৃতা দিয়েছিল।'

পরাশর বললেন,—'বা রে। তারপরও তো ওর সঙ্গে এখানে আমার দেখা হয়েছে, শুধু মাঝখানে কয়েকটা বছর ওকে আর এখানে দেখতে পাই নি।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'কেমন করে পাবেন, মাঝখানে তিনটে বছর যে আমি মধ্যপ্রদেশে ছিলাম।'

'মধ্যপ্রদেশে ছিলে? ওখানে কোনো চাকরি পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি?'

ব্রজবিলাস মধ্যস্থতা করে বললেন,—'হ্যাঁ, একরকম তাই বলতে পার। তবে সে চাকরিতে জলাঞ্জলি দিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে এসে একটা নতুন কাজে যোগ দিয়েছে।'

'তাই নাকি?' পরাশর উৎসাহিত বোধ করলেন, বললেন—'It's a good news. তা তুমি কোথায় চাকবি কবছ?'

ব্রজবিলাস মুচকি হেসে শুধোলেন,—'সেটা তুমি আন্দাজ ক'র দিকি।'

পরাশব একটা হতাশ ভঙ্গি কবে জবাব দিলেন,—'সেটা আমি কেমন কবে জানব বলো?'

ব্রজবিলাস ঈষৎ হেসে বললেন,—'দীপ্তেন্দু এখন সাংবাদিক। একটা সংবাদপত্রের রিপোর্টার। ইতিমধ্যেই ও সুন্দব রিপোর্টিঙ করছে।'

'তাই নাকি? তা সেটা কোন কাগজ? যেখানে তুমি রিপোর্টার—'

দীপ্তেন্দু বলল,—'বঙ্গভূমি। আপনি নিশ্চয় কাগজটা দেখেছেন?'

'হ্যাঁ দেখেছি।' পবাশব কেমন ঠাণ্ডা গলায কথা কইলেন।

বললেন—'ওটা বামপন্থীদের কাগজ।'

দীপ্তেন্দু জবাব দিল,'—নাহ্ ঠিক বামপন্থী কাগজ ওটাকে বলা যায় না। তবে বামপন্থী মতবাদকে ওরা প্রাধান্য দেয়।'

'তার মানেই তাই। যার নাম চালভাজা তাব নামই মুড়ি।' পরাশর স্পষ্ট জানালেন।

ব্রজবিলাস বললেন,—'সে যাই হোক। বরং এখন দীপ্তেন্দুকে দুটো প্রশ্ন করি।'

'কী প্রশ্ন দাদু?'

'নির্বাচন তো দোরগোড়ায়।' ব্রজবিলাস বললেন,—'তোমাদের কাগজে নিশ্চয় এই নিয়ে কিছু লেখালেখি হবে।'

'অবশ্য।' দীপ্তেন্দু ইতিবাচক উত্তর দিল। বলল —'নির্বাচন নিযে কয়েকটি নিবন্ধ আমাদের কাগজে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে। আর রাঢ় বাংলাব বিশেষ কয়েকটি নজর কাড়া কেন্দ্র কভার করার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে।'

পরাশর শুধোলেন—'তা রাঢ় বাংলার কোন কোন কেন্দ্র তুমি কভার করবে দীপ্তেন্দু?'

'সবটা এখনও ঠিক হয়নি' দীপ্তেন্দু একটুও চিন্তা না করে জবাব দিল। বলল, 'আমার নিবন্ধের প্রথম কিস্তিটা হয়তো সামনের মাসের শুরুতেই বেরুবে। প্রথম কিস্তিটা লিখব কম্যিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরী আর কংগ্রেসের রাধারানী মহতাবের নির্বাচনী সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে।'

'তুমি নিশ্চয় লিখবে এই নির্বাচনী সমরে কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরীর জেতার সম্ভাবনাই বেশি।'

'বা রে! সেটা কেমন করে বলব? আমি তো এখনও বর্ধমানের ভোটারদের মুখোমুখি হই নি। আগে এলাকাটা ভালো করে দেখে আসি। তারপর সব দিক খতিয়ে, ভালোমতো বিচার করে লিখব নির্বাচনী সাফল্যের পাল্লা কার দিকে বেশি ঝুঁকেছে।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'দীপ্তেন্দু কিন্তু ঠিকই জবাব দিয়েছে পরাশর। রিপোর্টারের তো সেটাই কাজ। এলাকাটা সরেজমিনে ঘুরে এসে নানা ধরনের ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বক্তব্য শুনে তবেই তো নির্বাচনী প্রতিবেদনে লিখবে, ভোটের ফলাফলে কার জেতার সম্ভাবনা বেশি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমি কিন্তু বাঁকুড়াও কভার করছি পরাশরদাদু। বিশেষ করে ডাঃ অনাথবন্ধু রায়ের কেন্দ্র বাঁকুড়া। শুনতে পাচ্ছি ওর বিরুদ্ধে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কমিউনিস্ট প্রার্থী ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য। তার জেতার সম্ভাবনাও কিছু কম নয়। হয়তো বা শেষপর্যন্ত দুজনের মধ্যে একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।'

পরাশর ঈষৎ গম্ভীর গলায় বললেন,—'ডাঃ অনাথবন্ধু রায়ের জেতা নিয়ে আমাদের কোনো সংশয়ই থাকত না। যদি কংগ্রেস প্রভাবিত কিছু এলাকা অন্য একটি কেন্দ্রের সঙ্গে না জুড়ে দেওয়া হত। বাঁকুড়া নিয়ে সেটাই হয়েছে আমাদের সমস্যা।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কিন্তু ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য প্রার্থী হিসেবে কিছু কম যোগ্য নন। ভালো চিকিৎসক হিসেবে তার সুনামও আছে। এবং বলাবাহুল্য ভোট পাওয়ার ব্যাপারে সেটা তার সহায়ক হবে।'

ব্রজবিলাস শুধোলেন,—'তুমি পরাশরের কেন্দ্রটি কভার করবে না দীপ্তেন্দু?'

'শেষ পর্যন্ত ওটা হয়ে উঠবে কি না বুঝে উঠতে পারছি না দাদু। আসলে পরাশর দাদুর কেন্দ্রটি বেশ interior মানে জেলার ভেতর দিকে। প্রায় দশ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে এলাকা। দু-একদিনে এত বড় এলাকা কভার করা যাবে বলে মনে হয় না।

'সেটা মানছি।' ব্রজবিলাস স্বীকার করলেন। 'তবে পরাশর জিতবেই এটা আমি হলফ করে বলতে পারি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমিও তাই চাই দাদু। বাঁকুড়ার কোনো কেন্দ্র থেকে পরাশরদাদু রিটার্ন করলে জেলার নিশ্চয় উপকার হবে।'

পরাশর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—'আমি তাহলে চলি ব্রজবিলাস। আরো কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করা বাকি। একবার কংগ্রেস অফিসেও যাওয়া দরকার।'

ব্রজবিলাস শুধোলেন,—'তুমি কি আজ রাতের ট্রেনেই ফিরে যাচ্ছ?'

'না গিয়ে উপায় আছে? শুনলে তো দীপ্তেন্দুর মুখে, নির্বাচনী পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ও রাঢ় বাংলা কভার করতে বেরিয়ে পড়বে। তাহলে আর সময় কোথায়? ঘর গুছোতে কটা দিনই বা পাচ্ছি?'

পরাশর একবার পিছন ফিরলেন। আবার ঘুরে ব্রজবিলাসের মুখোমুখি হলেন। বললেন,—'তুমি তাহলে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বাঁকুড়ায় আসছ? আমার কেন্দ্রে অন্তত দু-তিনটে সভায় তোমার ভাষণ দেওয়া চাই।'

ব্রজবিলাস ম্লান হাসলেন। বললেন,—'যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন যাব নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের মতো ওল্ড ফসিলদের নিয়ে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়ালে সত্যি কিছু ফল হবে? আমরা তো এখন বাতিলের দলে পরাশর। বরং কলকাতা থেকে কিছু ইয়ং বেঙ্গলকে নিয়ে গেলে কাজ হবে।'

পরাশর হাসলেন, বললেন,—'পুরানো চাল ভাতে বাড়ে ব্রজবিলাস। তোমার মতো একজন আদর্শবান সত্যনিষ্ঠ বিপ্লবী দেশপ্রেমিককে যদি দেশের লোক এখন বাতিল করে তাহলে আর কী বলার আছে?'

দীপ্তেন্দু পিছন থেকে বলল,—'সব রাজনৈতিক দলই কম-বেশী সুবিধাবাদীদের দখলে চলে যাচ্ছে দাদু। এবার অনেক কংগ্রেসী প্রার্থী আছেন যারা ১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। যেমন বালী কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ১৯৫২ সনে স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ান। তেমনি ১৯৫৭ সনে চব্বিশ পরগণার একটি কেন্দ্রের পরাজিত বামপ্রার্থী এবাব কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন।'

পরাশর বললেন,—'এসব কথা এখন থাক। গণতন্ত্রে দলত্যাগের একটা সুযোগ তো রয়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো কোনোদিন দেশের সর্বোচ্চ আইনসভাই দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রণয়ন করবে।'

পরাশর চলে গেলে ব্রজবিলাস বললেন,—'ব'স দীপ্তেন্দু। তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি।'

দীপ্তেন্দু উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল।

ব্রজবিলাস কেমন নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কথা কইলেন, —'মহারানী বোধহয ফিরে আসছে।'

কথাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ গভীর এবং সে কারণেই দুর্জ্ঞেয়। তাই দীপ্তেন্দু শুধোল,—'ফিরে আসছে মানে?'

'বলতে পারব না। গতরাত্রে মহারানী ট্রাঙ্ককল করেছিল। বলল—দাদু আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। তার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে শুধোলাম,—ফিরে আসছ মানে? সে জবাব দিল, আমি গিয়ে বলব। ব্যস্ আর কোনো কথা হয়নি। রিসিভারটা নামিয়ে রাখার আগে জানাল,—টিকিট পেলে সামনের শনিবার দার্জিলিং মেল ধরে আসার চেষ্টা করবে।'

দীপ্তেন্দু তবু বলল,—'ওর কথা শুনে আপনার কী মনে হয় দাদু? অগ্নিবীণা মেডিক্যাল কলেজের হাউস-স্টাফশিপটা কমপ্লিট করবার জন্যই আসছে?'

'হ্যাঁ, নইলে কলকাতায় ফিরে আসার কী মানে হয়?' ব্রজবিলাস ঈষৎ চিন্তিত মুখে বললেন,—'জানো দীপ্তেন্দু, আমার ভয় হয় মহারানী বোধহয় ঝগড়াঝাঁটি করে জলপাইগুড়ি থেকে চলে আসছে।'

'কিন্তু কেন?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

'কেন আবার? ব্রজবিলাস বললেন,—'ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাড়ির বউয়ের কলকাতায় এসে ফের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ডাক্তারি পড়াটা আদপেই পছন্দ করেনি। আর এই নিয়ে মহারানীর সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদ। তাছাড়া, তোমাকে বলেছি তো, ওর বিয়েটা ঠিক সুখের হয়নি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমি তাহলে উঠি দাদু। অগ্নিবীণা এলে আমাকে বরং একটা খবর দেবেন। ছুটির দিন দেখা করে যাব।'

ব্রজবিলাস শুধোলেন,—'তুমি বর্ধমান যাবে বলছ? সেটা কবে?'

'আগামী সপ্তাহে কিংবা আর একটু পরে। সম্পাদক এই কিস্তিটা দিয়েই ইলেকশন পর্যালোচনা শুরু করতে চান। তাই যত তাড়াতাড়ি পারি লেখাটা শেষ করে দিতে হবে।'

দুপুরে খাওয়ার বেঞ্চিতে রতন দত্তর সঙ্গে দেখা। রবিবার ছুটির দিন। তাই মেস বাড়িটা ফাঁকা। উইক-এণ্ড কাটাতে অনেকেই দেশের বাড়িতে গেছে। সোমবার সকালে ফিরবে।

তাকে দেখে রতন দত্ত বলল,—'এই যে মশায়, বঙ্গভূমি কাগজে মাদ্রাজ টেস্ট নিয়ে আজ একটা ক্রোড়পত্র বেরিয়েছে। তা আপনাদের খেলাধূলার পাতাটা কে দেখছেন যেন?'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'সোমেশ্বরবাবু। মানে সোমেশ্বর ব্যানার্জী।'

রতন দত্ত বলল.—'ক্রোড়পত্রটা ভালোই হয়েছে। তবে একটা জিনিস থাকলে আরো ভালো হ'ত। টাইগার মানে পতৌদির নবাবের একটা লাইফ স্কেচ দিতে পারত। জানেন তো, প্রথম ইনিংসেই পতৌদির নবাব সেঞ্চুরী করে বসে আছে। ইংলণ্ড এখন প্রতিকূল অবস্থায়। আমার কী মনে হয় বুঝলেন?'

'কী?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

রতন দত্ত বলল,—'মাদ্রাজ টেস্টটা জিতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত প্রথম রাবার লাভ করবে।'

শুক্রবার দিন অফিসে যেতেই নীলিমা দত্ত বললেন,—'তোমার একটা টেলিফোন এসেছিল দীপ্তেন্দু।'

'আমার টেলিফোন? কোথা থেকে?'

নীলিমা দত্ত কাজের পাতায় চোখ রেখেই বললেন, —'তুমি যা ভাবছ তাই। জলপাইগুড়ি।'

দীপ্তেন্দু কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে কর্মরত নীলিমা দত্তের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে কাজের পাতা থেকে মুখ তুলে নীলিমা আবার বললেন,— 'উনি হয়তো দুটো নাগাদ ফোন করবেন তোমাকে। কী জরুরী কথা আছে।'

কিছুক্ষণ পরেই সম্পাদক তাকে ডেকে পাঠালেন। দীপ্তেন্দু ঘরে ঢুকতেই রতিকান্ত বসু বললেন,

—'আসুন আসুন, তাহলে সামনের সপ্তাহেই কি বর্ধমান থেকে একবার ঘুরে আসবেন?'

'হ্যাঁ, আর দেরি করেও লাভ নেই। নির্বাচনের দিন-তারিখ তো ঘোষণা হয়ে গেছে। মনোনয়ন পত্র দাখিলের পর দু-পক্ষেরই প্রচার এখন তুঙ্গে।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'নির্বাচনী পর্যালোচনার প্রথম কিস্তিটা এর পরের রবিবার থেকেই শুরু করব ভাবছি। আপনি নিশ্চয় তার আগেই লেখাটা দিতে পারবেন।'

'আমি নিশ্চয় তা পারব স্যর।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'এই ধরনের পর্যালোচনার প্রথম শর্ত কী জানেন? নির্বাচনী যুদ্ধে কার জেতার সম্ভাবনা বেশি সেটাই আপনাকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে। ফলাফল বেরোনোর পর যদি দেখা যায় যে আপনার বিশ্লেষণের অঙ্কটা আদৌ মেলেনি তাহলে সাংবাদিক হিসেবে আপনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে সকলেই ধরে নেবে। যেখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে সেখানে পাল্লা কোন দিকে ঝুঁকবে তার বিচার আপনি পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দেবেন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আপনার কথাগুলি আমি মনে রাখব স্যর।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'আরো একটা কথা মনে রাখবেন। যে সব কেন্দ্রে দশ বা পনের পারসেন্ট অথবা আরো বেশী মুসলমান ভোটার রয়েছে সেখানে তারা যেদিকে ঝুঁকবে সেদিকেই পাল্লা ভারী হবে। নির্বাচনী পর্যালোচনা করবার সময় এদিকটার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবেন।'

বেলা আড়াইটে নাগাদ তার কাছাকাছি টেবিলের টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। দীপ্তেন্দু হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল। অপরপ্রান্ত থেকে অফিসের অপারেটর বলল,—'জলপাইগুড়ি থেকে দীপ্তেন্দুবাবুর একটা ট্রাঙ্ককল আছে।'

'আমিই দীপ্তেন্দুবাবু, মানে দীপ্তেন্দু চট্টোপাধ্যায়।'

'নিন, তাহলে কথা বলুন, ট্রাঙ্ককল ফ্রম জলপাইগুড়ি।'

দীপ্তেন্দু রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই অপরপ্রান্তে থেকে সে বলল—'আমি অগ্নিবীণা।'

'ও হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তারপর কী খবর বল? কেমন আছ?'

'সে অনেক কথা। কলকাতায় গিয়ে বলব। আপাতত আপনাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি দীপ্তেন্দুদা।'

'কী কাজ বলো?'

অগ্নিবীণা বলল,—'শনিবার দার্জিলিং মেলের রিজার্ভেশান পেয়েছি। ওই ট্রেনেই আমি কলকাতা যাচ্ছি। আপনি কি রবিবার হাওড়া স্টেশনে একবার আসতে

পারবেন?'

'হ্যাঁ, কেন পারব না? রবিবার তো ছুটির দিন।'

'সে জন্যই আপনাকে বললাম। আমার সঙ্গে কিছু ভারী লাগেজ থাকবে। স্টেশনে থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমাকে ডাফ্ স্ট্রিটের বাড়িতে পৌছে দিলেই আপনার ছুটি।'

দীপ্তেন্দু সহর্ষে বলল,—'এটা কোনো ব্যাপারই নয়। আমি ঠিক সময়ে দার্জিলিং মেল অ্যাটেণ্ড করব। কিন্তু দাদুকে কি তোমার আসার খবরটা জানিয়ে রাখব?'

'উনি কিছুটা জানেন। তবে এখনও Confirm করিনি। আসলে দাদুকে বললেই উনি এই অশক্ত শরীরে ঠিক হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হবেন। তারপর ছুটোছুটি করে ট্যাক্সি ডেকে আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন।'

'দাদুর আসার তো প্রয়োজন নেই। আমি যখন সশরীরে হাওড়া স্টেশনে হাজির থাকছি। বরং শনিবার রাত্তিরে টেলিফোন করে তোমার আসার খবরটা আগাম জানিয়ে রাখব।'

'হ্যাঁ। তাই জানিয়ে দেবেন। তাহলেই দাদু আর ব্যস্ত হবেন না।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সীটে গিয়ে বসতেই দীপ্তেন্দু লক্ষ করল নীলিমা দত্ত যেন কিছু শোনার আগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু দীপ্তেন্দু ইচ্ছে করেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করল না। বরং বর্ধমান গিয়ে কী ভাবে নানা এলাকার ভোটারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নির্বাচনী পরিস্থিতির পর্যালোচনা করবে তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করল।

দার্জিলিং মেল ঘন্টাখানেক লেট ছিল। প্ল্যাটফর্মে লোকজনের নামা শুরু হতেই দীপ্তেন্দু এগিয়ে গিয়ে একটা থ্রি-টায়ার কামরার ভেতর অগ্নিবীণাকে আবিষ্কার করল। জানলার ফাঁক দিয়ে চেঁচিয়ে বলল,—'আমি এসে গেছি বুলু।'

মালপত্র বলতে দুটো শক্তপোক্ত বড় সুটকেস তার সঙ্গে। কুলি ডেকে কামরা থেকে সেগুলি নামাল দীপ্তেন্দু। শুধোল,—'এত ভারী সুটকেস। কী আছে এতে?'

'ডাক্তারীর বই।' অগ্নিবীণা ভুরু নাচিয়ে বলল,—'হাউসস্টাফ-শিপটা কমপ্লিট হলেই পরীক্ষা দিতে বসব না? তার জন্যই তো এগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।'

'খুব ভালো কথা।' দীপ্তেন্দু তাকে উৎসাহ দিল। বলল,—'সুযোগ থাকতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সটা কেউ আবার না কমপ্লিট করে?'

গাড়ি ডাফ স্ট্রীটে পৌছতেই ব্রজবিলাস ছেলেমানুষের মতো এগিয়ে এসে ট্যাক্সির পাশে দাঁড়ালেন। বললেন,—'মহারানী এসো এসো। তোমার বিহনে আমার সংসার বৃক্ষের ডালপালা সব যে শুকিয়ে যেতে বসেছে। তুমি এলে, এবার গাছের ডালে পাতা গজাবে, ফুল ফুটবে। বসন্তের পাখি ডাকবে।'

'হবে হবে। সব হবে। তোমার কাব্য এখন একটু বন্ধ কর দিকি দাদু। আগে

মালপত্রগুলো নামাবার ব্যবস্থা করি।'

জিনিসপত্র নামাতেই অগ্নিবীণা ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল। দীপ্তেন্দুকে বলল,—'আপনি বসুন দাদুর ঘরে। আমি এখুনি আসছি।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'আজ রাত্তিরে ওকে এখানে নিমন্ত্রণ কর মহারানী। খেয়ে দেয়ে ওর মেসে ফিরে যাবে।'

কিন্তু দীপ্তেন্দু প্রবল আপত্তি জানাল, বলল,—'দাদু, কাল সকালেই যে আমাকে বর্ধমান যেতে হচ্ছে। তাই সন্ধ্যেব পর টুকিটাকি কাজও আছে।'

'বর্ধমানে কেন?' অগ্নিবীণা শুধোল।

দীপ্তেন্দু বলল,—'বিভিন্ন কেন্দ্রের নির্বাচনী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমাদের কাগজে ধারাবাহিক কতকগুলি নিবন্ধ প্রকাশিত হবে। তার প্রথম কিস্তিটা বর্ধমান নিয়ে, আর সেটা কভার করতেই বর্ধমান যাওয়া।'

'ঠিক আছে। তাহলে বর্ধমানের কাজ সেরেই তুমি এখানে আসবে।' ব্রজবিলাস বললেন।

'নিশ্চয়, সে আর বলতে হয।'

সমস্তদিন টোটো করে বর্ধমান শহরটা ঘুরে বেড়াল দীপ্তেন্দু। দোকানপাট, স্কুল-কলেজ,—পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কিছুই বাদ দিল না। কখনও রিকশতে কখনও পায়ে হেঁটে। নানা ধরনের লোকের সঙ্গে কথা বলে ভোটের হাওয়া কোন দিকে সেটা বোঝার চেষ্টা করল। সারাদিন খাওযা বলতে একটা পাইস-সিস্টেম হোটেলে ভাত আর মাছের ঝোল। মাঝে অন্তত দশ-বারো কাপ চা। ওরই মধ্যে একবার সময় করে কংগ্রেস প্রার্থী রাধারানী মহতাবের সঙ্গেও দেখা করল। কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরী প্রচারের কাজে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন বলে তার সঙ্গে দেখা করতে পারে নি। রাত্তিরে ট্রেন ধরে যখন সে কলকাতায় ফিরল তখন দশটা বেজে গেছে।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে সে গুছিয়ে প্রতিবেদনটি লিখে ফেলল। অন্তত আড়াই কলাম লেখা। যাদের সঙ্গে সে কথা বলেছে তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে ভুলল না। তার পরদিন অফিসে গিয়ে প্রতিবেদনটি রতিকান্ত বসুর হাতে দিয়ে বলল,—'আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি নানা ধরনের লোকের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবার। এখন আপনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন তাই হবে।'

আধঘন্টা বাদেই সম্পাদক তাকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে দীপ্তেন্দু দেখল চিফ রিপোর্টার সুধাময়বাবু একপাশে গম্ভীরমুখে বসে আছেন।

তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রতিকান্ত বসু বললেন,—'এ কী লিখেছেন! ভোটে বিনয় চৌধুরী হেরে যেতে পারেন?'

॥ ছয় ॥

খোদ সম্পাদকের মুখে ওই মন্তব্য শুনে দীপ্তেন্দু প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর এবং শান্ত গলায় সে জানাল,—'বর্ধমানে আমি নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বর্ধমান কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফলের একটা মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছি। নিজেকে আমি SEFOLOGIST বা নির্বাচনী ফলাফলের বিশেষজ্ঞ বলেও দাবী করি না। বর্ধমানের সাধারণ মানুষ, নানা শ্রেণীর ভোটারের সঙ্গে কথা বলে আমার যা ধারণা হয়েছে প্রতিবেদনে তারই উল্লেখ করেছি।'

সম্পাদক বললেন,—'আপনার কি ধারণা এই নির্বাচনে বিনয়বাবুর পক্ষে জয়ী হওয়া কঠিন?'

দীপ্তেন্দু আগের মতো শান্ত কণ্ঠে বলল,—'স্যর, নির্বাচনে কে জয়ী হবেন তার সঠিক মূল্যায়ন একটি দুরূহ কাজ। যেদিকে হাওয়া রয়েছে সাতদিন বাদেই হয়তো তার উল্টোদিকে হাওয়া বইতে পারে। তখন নির্বাচনী ফলাফল আগে যেমন হবে বলে আশা করা গিয়েছিল তার উল্টোটাই রেজাল্টে প্রতিফলিত হবে। আসলে বর্ধমান কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী রাধারানী মহতাব সাতমহলা বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন মাটিতে, সাধারণ মানুষের কাছে ভোটপ্রার্থী হয়ে। আমার প্রতিবেদনে আমি একজন মেহনতি মানুষ,—এক রিকশাচালকের কথা উল্লেখ করেছি। জিজ্ঞাসা করতে সে স্পষ্ট বলল,—'বিনয়বাবুর বিরুদ্ধে অন্য কেউ দাঁড়ালে আমি বিনয়বাবুকেই ভোট দিতাম। কিন্তু রানীমা এসে আমার বাড়ির দরজায় দাঁড়ালেন। আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন। চিরুনী দিয়ে ওর চুল আঁচড়ে দিলেন। বলুন, এরপরও কি আমি রানীমাকে ভোট না দিয়ে পারি?'

সম্পাদক বললেন,—'খবরে প্রকাশ অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় বর্ধমানে একটি নির্বাচনী সভা করে এসেছেন। এবং সেখানে বর্ধমানের মহারাজাকে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিভূ আখ্যা দিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে বর্ধমানরাজ অন্তরায় ছিলেন। এরপরও কি বর্ধমানের মানুষ মহারানীকেই ভোট দেবে?'

'জানি না, শেষপর্যন্ত ফলাফল কী দাঁড়াবে। তবে শহরের ছোট ব্যবসায়ী, শিক্ষক, অফিসের কেরানী, অন্য অধস্তন কর্মচারী,—সাধারণ মানুষ, এদের অনেকেই রানীমার পক্ষে ভোট দেবেন। সেই হিসেবেই নির্বাচনী পর্যালোচনার শেষে আমি লিখেছি, এবারকার ভোটে জয়মাল্যটা যেন বর্ধমানের মহারানী রাধারানী মহতাবের গলায় দোলার অপেক্ষায় রয়েছে।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'ঠিক আছে। আপনি যান। এ বিষয়ে সুধাময়বাবুর সঙ্গে আলোচনা করে আমি একটা সিদ্ধান্ত নেব।'

দীপ্তেন্দু আর অপেক্ষা করল না। সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের সীটে

এসে বসল।

নীলিমা দত্ত অপাঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'বর্ধমান নিয়ে কী এমন লিখেছ দীপ্তেন্দু যে সম্পাদক চিফ রিপোর্টারকে ডেকে পাঠিয়ে আলোচনায় বসলেন।'

দীপ্তেন্দু মৃদু হেসে বলল,—'ও এমন কিছু নয়। তবে লেখাটা বোধহয় যাবে না।'

'কেন?' নীলিমার ঠোঁটে দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠল।

দীপ্তেন্দু বলল,—'লেখাটা হয়তো ওর পছন্দ হয় নি। এমনও হতে পারে এবার অন্য কাউকে পাঠিয়ে বর্ধমান কেন্দ্রের বিষয়ে আর একটি নির্বাচনী প্রতিবেদন কাগজে ছাপবেন।'

তার কথা না শেষ হতেই সোমেশ্বর সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, —'দীপ্তেন্দুবাবু, খুব ব্যস্ত নাকি?'

'নাহ্। ব্যস্ত কিসের? বসুন—।'

সোমেশ্বর হেসে বলল,—'আর বসার সময় নেই। বরং হাত খালি থাকলে চলুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?' দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে তাকাল।

'একটা ছবির আজ প্রেস শো। বোধহয় সামনের শুক্রবার রিলিজ করবে। চলুন দেখে আসি।'

'সিনেমার পাতা আপনিই এখন দেখছেন?'

'হ্যাঁ। মিলন সান্যাল পনের দিন ছুটি নিয়েছে। ওর স্ত্রীর কী সব অসুখ-বিসুখ। তাই সম্পাদক ওটা আমাকেই দেখতে বলেছেন।'

'কিন্তু রতিকান্ত বসুর পারমিশন ছাড়া আমি যাব কেমন করে? যদি অন্য কোনো কাজে এখুনি ডাক পড়ে।'

'আপনার পারমিশন আমি নিয়ে আসছি। আচ্ছা বলুন, ফিল্মের আমি কী বুঝি? বরং আপনি সঙ্গে থাকলে দুজনে মিলে একটা রিভিয়্যু খাড়া করতে পারব।'

'ছবিটার কী নাম?'

'সমুদ্র এবং তরঙ্গ।' সোমেশ্বর জবাব দিল।

'বাব্বা! কী গালভরা নাম। তা ছবির হিরো-হিরোইন কে?'

'নায়ক তমালকুমার আর নায়িকা নীহারিকা দেবী।'

'তমালকুমার? তার মানে হরিদাস?'

'হরিদাস কে?' সোমেশ্বর শুধোল।

'হরিদাস মানে ওটাই ওর আসল নাম।'

'আশ্চর্য! আপনি ওকে চেনেন নাকি?'

'চিনি বৈকি। একসঙ্গে বাঁকুড়া কলেজে পড়তাম। তারপরও দেখা-সাক্ষাৎ

হয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে কলেজ স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে কথা বললাম।'

সোমেশ্বর চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে বলল,—'আরে মশায়, আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক। তমালকুমার আপনার ক্লাস-ফ্রেণ্ড আর এই ব্যাপারটা আপনি বেমালুম চেপে গিয়েছেন।'

'কী আশ্চর্য! এ কি একটা বলে বেড়াবার মতো কথা নাকি? কলেজে একসঙ্গে আই. এসসি. পড়তাম। ওর বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলেকে ডাক্তার করে। আর সেজন্যই কারো নমিনেশন জোগাড় করে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে ওকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। থাকত বেলগাছিয়ার হস্টেলে। কিন্তু ডাক্তারিতে ওর মন বসল কই? মাথায় সিনেমার পোকা। ডাক্তারি পড়ার সময় লুকিয়ে-চুরিয়ে দু-একটা ছবিতে ছোটখাটো রোলে নেমেছিল। ফলে ফার্স্ট এম. বি. বি. এসের চৌকাঠটাই আর ডিঙোতে পারল না, এদিকে ছেলের এই ফিল্ম-লাইনে যাতায়াতের খবরটা ওর বাবার কানে পৌঁছে গেল। তখন এক বিশ্রী অবস্থা আর কী, রাগ করে বাবা ওকে ত্যাজ্যপুত্র করতে যাচ্ছিলেন।'

'তারপর?' সোমেশ্বর শুধোল।

'তারপর আর অনেকদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এই অফিসে জয়েন করবার ঠিক আগে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল কলেজ স্ট্রীটে। আমাকে দেখে নিজেই গাড়ি থামিয়ে এলো কাছে, দু-চার কথার পর বলল,—রাখ আমার কার্ডটা। সময় করে একদিন চলে আয় বাড়িতে। তবে হ্যাঁ, টেলিফোন করে আসবি। নইলে বাড়ি এসে দেখবি আমি শুটিঙে বেরিয়ে গেছি।'

সোমেশ্বর বলল,—'ওর সঙ্গে আপনার এমন দহরম-মহরম জানলে মিলনই আপনাকে নিয়ে যেত ওর কাছে। একটা ইণ্টারভ্যু নিয়ে সেটা ফলাও করে ছাপত বঙ্গভূমি কাগজে।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—' প্রেস-শো টা কোথায় হবে?'

'গোর্কি সদনে। ছবিটা ওখানেই দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে।' কথা শেষ করেই সোমেশ্বর উঠে দাঁড়াল। বলল,—'একটু অপেক্ষা করুন। আমি এডিটরের কাছ থেকে আপনাকে সঙ্গে নেবার পারমিশন নিয়ে আসছি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'রতিকান্ত বসু কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক আমার ওপর প্রসন্ন নন। তার কারণ বর্ধমান কেন্দ্র নিয়ে লেখা নির্বাচনী পর্যালোচনাটা ওর ঠিক পছন্দ হয়নি। শেষপর্যন্ত এই লেখাটা হয়তো বেরোবে না। তার বদলে অন্য কাউকে পাঠিয়ে ফের বর্ধমানের ওপর একটা নতুন নির্বাচনী প্রতিবেদন লিখিয়ে নেবেন।'

সোমেশ্বর মাথা নেড়ে বলল,,—'তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সমুদ্র এবং তরঙ্গ বইটার পরিচালক কে জানেন? রামানন্দ রায়। উনি একজন নামী ডিরেক্টর। ওর অনেক ছবিই দেশে-বিদেশে সমাদৃত এবং প্রাইজ পেয়েছে। এই ছবিটাও স্বর্ণকমল পেলে কিছু আশ্চর্য হবার নেই। তাই ওর ছবির ব্যাপারে মিডিয়া

সাগ্রহে অপেক্ষা করে। রিলিজ হবার আগেই নানা জল্পনা-কল্পনা চলে। এবং সেজন্যই প্রেস-শোতে আপনাকে সঙ্গে নিতে চাইলে রতিকান্ত বসু কখনও আপত্তি করবেন না।'

সোমেশ্বর যা বলেছিল তাই হ'ল। মিনিট পাঁচ-ছয় পরেই এডিটরের ঘর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো সে। দীপ্তেন্দুকে বলল,—'পারমিশন গ্রান্টেড্। নিন উঠে পড়ুন। আর দেরি করলে প্রেস-শো শুরু হবার আগে পৌঁছতেই পারব না।'

'শো কটায় শুরু হবে?' দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল।

সোমেশ্বর জবাব দিল,—'সওয়া একটায়।' তারপর হঠাৎ কী মনে হতে বলল,—'ও হ্যাঁ। যাবার আগে রতিকান্ত বসু একবার আপনাকে দেখা করে যেতে বলেছেন।'

দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে তাকাল। সম্পাদকের আবার তলব কেন? বর্ধমান কেন্দ্রের নির্বাচনী পর্যালোচনার ব্যাপারটা যখন চুকে-বুকে গেছে।

অফিস থেকে বেরোবার আগে দীপ্তেন্দু একবার সম্পাদকের ঘরে ঢুকল। তাকে দেখেই রতিকান্ত বসু সাদরে কাছে ডাকলেন। বললেন,—'বসুন এই চেয়ারটায়। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

দীপ্তেন্দু চেয়ারে বসে চোখ তুলে সম্পাদকের ঘরের দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল। সাড়ে বারোটা। সোমেশ্বর বলছিল প্রেস শো সওয়া একটায়। ট্যাক্সিতে করে গেলেও গোর্কিসদনে পৌঁছতে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগবে। তার ব্যস্ততা বুঝতে পেরে রতিকান্ত বসু বললেন,—'জানি। বামানন্দ রায়ের নতুন ছবির প্রেস-শো দেখতে যাচ্ছেন। আপনাকে বেশিক্ষণ আটকাব না। মিনিট পাঁচের মধ্যেই ছেড়ে দিচ্ছি।'

সম্পাদকের টেবিলে তার লেখাটা একপাশে রয়েছে, দীপ্তেন্দুর সেটা চোখে পড়ল। লেখাটার এক কোণে খসখস করে দস্তখত দিয়ে রতিকান্ত বসু বললেন,—'এটা প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম। কালকের কাগজেই বেরুবে।'

সম্পাদকের এই সিদ্ধান্ত শুনে দীপ্তেন্দুর চোখ দুটি এক অব্যক্ত আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রতিকান্ত বসু বললেন,—'একটা কথা জেনে রাখুন। অনেকসময় যা অবশ্যম্ভাবী এবং সত্যি হতে চলেছে তাও আমরা কাগজে ছাপতে পারি না। প্রতিবেদনে আপনি যা লিখেছেন ফলাফল হয়তো তাই হবে। হলে সব দিক বজায় রইল। কিন্তু না হলে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। এই প্রতিবেদন লেখার মালমশলা জোগাড় করতে গিয়ে সাংবাদিক কি যথেষ্ট সতর্ক হন নি? এবং ভুল তথ্য আহরণ করার মাশুল দিতে নির্বাচনের ফলাফলটাই যে উল্টে গেছে। বলা বাহুল্য সেটা পরোক্ষে কাগজের সুনাম হানিকর।'

দীপ্তেন্দু কোনো মন্তব্য করবার আগেই সম্পাদক ফের বললেন,—'কিন্তু আমি

সেই risk নিলাম। এখন ঈশ্বর আপনার সহায় হ'ন।'

সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সোমেশ্বর শুধোল,—'কী মশায়? বতিকান্ত বসু আবার আপনাকে ডাকলেন কেন?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমাকে ডেকে পাঠানোর কারণটা শুনলে আপনিও একটু অবাক হবেন।'

'কী কারণ মশায়?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'বর্ধমান কেন্দ্র নিয়ে আমার নির্বাচনী পর্যালোচনাটা উনি ছাপতে দিলেন। কালকের কাগজেই বেরুবে।'

সোমেশ্বর বলল,—'তার মানে কী জানেন? আপনার বিশ্লেষণটা সম্ভবত ওর পছন্দ হয়েছে। কিন্তু লেখাটা বামপন্থীদের পক্ষে হয়নি বলেই উনি ছাপতে দিতে দ্বিধা করছিলেন।'

দীপ্তেন্দু জানাল,—'হ্যাঁ। উনিও সে কথাই বললেন। পর্যালোচনার ফলাফল যদি মিলে যায় তাহলেই সব দিক বজায় থাকবে।'

রাস্তায় নেমেই সোমেশ্বর একটা ট্যাক্সি ডাকল। দুজনে উঠে বসতেই অবাঙালী ড্রাইভার মিটার ডাউন করে গন্তব্যস্থলের নির্দেশ চাইল। সোমেশ্বর বলল,—'গোর্কি সদন চলুন।'

হলে ঢুকেই দীপ্তেন্দু বুঝতে পারল নামী-দামী সব লোকের এখানে সমারোহ। খবরের কাগজ এবং পত্রপত্রিকার প্রতিনিধি ছাড়াও, সমালোচক, সাহিত্যিক, প্রোডিউসারেব আত্মীয়-স্বজন, ডিরেক্টরের বিশেষ বন্ধু-বান্ধব এমন অনেকেই নিমন্ত্রিত।

ফিল্মটা বাণিজ্যিক ছবি নয়। বরং এটাকে আর্ট ফিল্ম বলা যায়। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই ছবি শেষ। নিঃসন্দেহে পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে বই। কাহিনী একজন প্রয়াত লেখকের। যিনি একদা বাংলা সাহিত্যে রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিলেন। সে কারণে এবং পরিচালনার গুণে বইটা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। তার বন্ধু হরিদাস ওরফে তমালকুমারের অভিনয় মনে রাখার মতো। একজন গ্রাম্য যুবকের রোলে বেশ মানিয়েছে হরিদাসকে। তার বিপরীতে ছবির নায়িকা নীহারিকা দেবী, স্বচ্ছন্দ এবং সম্পূর্ণ জড়তামুক্ত।

ছবি শেষ হতেই চা-পান এবং জলযোগের ব্যবস্থা। দীপ্তেন্দু লক্ষ করল খুব সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে হরিদাস কখন এসে হাজির হয়েছে। দূর থেকে তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে এগিয়ে এলো কাছে। বলল,—'তুই এখানে? বঙ্গভূমি কাগজের তরফ থেকে নিশ্চয়?'

দীপ্তেন্দু সহাস্যে জানাল,—'তাছাড়া আবার কী? তবে আমি ফিল্ম জার্নালিস্ট নই।'

'জানি জানি।' হরিদাস একটু চিন্তা করে বলল,—'তোদের কাগজের সিনেমার

পাতাটা তো মিলনবাবু মানে মিলন সান্যাল দেখছেন।'

'আপাতত তিনি ছুটিতে। তার জায়গায় সম্পাদক এখন সোমেশ্বরকে কাজটা দেখতে বলেছেন। আয়, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি সোমেশ্বর ব্যানার্জী। ক্রীড়া-সাংবাদিক। তবে খবরের কাগজের অফিসে কেউ একটা চ্যানেল নিয়ে থাকলে চলে না। যখন যেখানে প্রয়োজন তখন সেখানে বসতে হয়। বিশেষ করে ছোট সংবাদপত্রে।'

সোমেশ্বর হেসে বলল,—'আপনার কথা দীপ্তেন্দুর কাছে অনেক শুনেছি। সেজন্যই তো ওকে ধরে আনলাম।'

'আমার কী নাম বলেছে দীপ্তেন্দু আপনার কাছে?'

'ইয়ে মানে—' সোমেশ্বর একটু ইতস্তত করছিল।

তমালকুমার একগাল হেসে বলল,—'হরিদাস পাল। তাই না?'

সোমেশ্বর ঈষৎ হাসল। বলল,—'আমাদের কাগজের তরফ থেকে একটা আর্জি আছে আপনার কাছে।'

'কী আর্জি বলুন?'

'আপনার একটা ইণ্টারভ্যু চাই। মানে এই ছবিটার বিষয়ে। কেমন করে এই ছবির নায়ক নির্বাচিত হলেন। শুটিঙের সময় আপনার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল, নানা ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে।'

হরিদাস নায়কের ঢঙে চোখ দুটি তুলে বলল,—'আপনার আর্জি মঞ্জুর। কিন্তু একটা শর্তে।'

'কী শর্ত বলুন।'

'ইণ্টারভ্যুর দিন দীপ্তেন্দুকে সঙ্গে আনা চাই।'

'অবশ্য। সে কথা আবার বলতে হয়।' সোমেশ্বর সায় দিল। তারপর দীপ্তেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল,—'কি মশায়? ইণ্টারভ্যুর দিন আসবেন তো?'

দীপ্তেন্দু মুচকি হেসে জানাল,—'রতিকান্ত বসুর পারমিশন চাই।'

'তিনি কে?' হরিদাস জিজ্ঞেস করল।

'কাগজের সম্পাদক। তবে তার জন্য চিন্তা নেই। পারমিশন হয়ে যাবে।'

হরিদাস বলল,—'তাহলে দুদিন আগে একটা টেলিফোন করে সময়টা ঠিক করে নেবেন।' তারপর দীপ্তেন্দুর দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'ইণ্টারভ্যু নেওয়া হলে তুই কিন্তু আমার সঙ্গে যাবি।'

'কোথায়?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

'সেটা এখন উহ্য থাক। এলেই জানতে পারবি। তারপর নিজেই হাসতে হাসতে বলল,—'অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে। সেদিন কলেজ স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে তো কিছুই বলা হয় নি।'

তমালকুমার তাকে সঙ্গে করে আরো অনেকের কাছে নিয়ে গেল। ছবির

প্রোডিউসার ভুরামল সরাফ, পরিচালক রামানন্দ রায়, নায়িকা নীহারিকা দেবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পরিচালকের কাছে তাকে নিয়ে গিয়ে হরিদাস বলল,—'আমার বন্ধু দীপ্তেন্দু, দীপ্তেন্দু চ্যাটার্জী। ম্যাট্রিকুলেশনে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিল। আমরা একসঙ্গে বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজে পড়েছি। ব্রিলিয়্যাণ্ট স্টুডেন্ট। ভেবেছিল ইঞ্জিনিয়র হবে। কিন্তু সেটা আর হয় নি। এখন বঙ্গভূমি কাগজের রিপোর্টার।'

রামানন্দ রায় কম কথা বলেন। লম্বা, গৌরবর্ণ দেহ। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। ঠোঁটের ডগায় চাপা হাসি। দীপ্তেন্দুকে উৎসাহিত করে বললেন,—'জীবনের কোনো খেলাই ফাইন্যাল খেলা নয়। সব সেমি-ফাইন্যাল। শেষ পর্যন্ত ফাইন্যাল খেলাটা যে কবে আসবে তার জন্যই অপেক্ষা করতে হয়। কে বলতে পারে হয়তো ভালো রিপোর্টিঙের জন্যই আপনি একদিন ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়ে যাবেন।'

হিরোইন অবশ্য এত কথার মধ্যে গেলেন না। হাত তুলে দীপ্তেন্দুকে নমস্কার জানিয়ে বললেন,—'ছবিটা কেমন লাগল আপনার?'

দীপ্তেন্দু সহাস্যে জবাব দিল,—'খুবই সুন্দর। আমার তো মনে হয় গুণিজনের প্রশংসা কুড়োবে।'

'রামানন্দ রায়ের বই মানেই নতুন টেকনিক। নতুন আঙ্গিকে তোলা ছবি। সেজন্যই তো ওঁর ফিল্মে অভিনয় করে আমাদের একটা আলাদা স্যাটিস্‌ফেকশন হয়।'

চা-পান এবং জলযোগ সেরে সোমেশ্বর আর দীপ্তেন্দু গোর্কিসদন থেকে বেরিয়ে এলো। ট্যাক্সিতে উঠে সোমেশ্বব বলল,—'ছবির রিভিয়্যুটা আপনিই লিখবেন। আমি সম্পাদককে তাই বলব।'

'পাগল নাকি?' দীপ্তেন্দু প্রতিবাদ জানাল। বলল,—'আপনি সিনেমার পাতার চার্জে থাকতে আমি এসব লিখতে যাব কেন? তাছাড়া ফিল্মের রিভিয়্যু কি কোনো কালে করেছি?'

সোমেশ্বর বলল,—'নাই বা করলেন? ব্যাপারটা তো এমন কিছু শক্ত নয়। ছবি দেখে আপনার কী মনে হ'ল, রিভিয়্যুয়ের অর্থ তাই। ছবির গল্প কেমন, চিত্রনাট্য ভালো কি না, ক্যামেরার কাজ, সিকোয়েন্স তারপর অভিনয় এবং শেষে গান,—এই সব নিয়ে আলোচনা করলেই রিভিয়্যু হবে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'দেখবেন রতিকান্ত বসু কিছুতেই রাজী হবেন না, আমার হাতে এখন অনেক কাজ। রাঢ় বাংলার নির্বাচনী পর্যালোচনা,—হয়তো রবিবার রাত্তিরেই বাঁকুড়া যেতে হতে পারে।'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।' সোমেশ্বর এই নিয়ে আর কথা বাড়াল না।

শুক্রবার দিন দীপ্তেন্দু খবরের কাগজের অফিস থেকে ফিরতেই ঠাকুর বলল,—'বাবু আপনার একটা চিঠি আছে।'

'আমার চিঠি?' দীপ্তেন্দু একটু অবাক হ'ল। বলল,—'কী চিঠি? কই দেখি—।'

একটা সাদা খামের ভেতর চিঠিখানা। লেফাফার মুখ আঠা দিয়ে বন্ধ করা। খামের ওপর মেয়েলি হস্তাক্ষরে তার নাম লেখা। দীপ্তেন্দু লেফাফার মুখটা ছিঁড়ে দ্রুত হাতে চিঠিখানা বের করল। পরিষ্কার বাংলায় কয়েক লাইনের চিঠি—।

দীপ্তেন্দুদা,

সেই যে রবিবার আমাকে ডাফ স্ট্রীটে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন তারপর আর দেখা নেই। অথচ বর্ধমান থেকে ফিরেই এখানে আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। আপনার জন্য খুব চিন্তায় আছি। শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো? এর মধ্যে দুদিন বঙ্গভূমি কাগজের অফিসে ফোন করেছিলাম। অপারেটর বলল, আপনি অফিসে নেই। কাজে বেরিয়েছেন।

আমার পুরানো ডায়েরিটা বের করে আপনার মেসের ঠিকানাটা খুঁজে পেলাম। আমাদের বাড়িতে যে খবরের কাগজ দেয় তাকেই অনেক বলে কয়ে চিঠিটা মেসে পৌঁছে দিতে রাজী করিয়েছি।

সামনের রবিবার সকালে অবশ্যই এখানে আসবেন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করবেন। আপনার সঙ্গে অনেক কথা ছিল। ইচ্ছে থাকলেও এতদিন তা বলতে পারিনি। সুযোগ পেলেই সব বলব। আচ্ছা, আপনি কি ভাবলেন শুধু বাক্স দুটো পৌঁছে দেবার জন্যই আপনাকে হাওড়া স্টেশনে যেতে বলেছিলাম?

প্রণাম নেবেন।

ইতি

আপনার বুলু

চিঠিটা হাতে নিয়ে দীপ্তেন্দু অনেক কিছু ভাবছিল। ঠাকুর শুধোল,—'বাবু চিঠিতে কোনো খারাপ খবর নেই তো?'

'না-না। এসব কিছু নয়। তুমি ভাত বেড়ে রাখ। আমি জামাকাপড় পাল্টে এখুনি আসছি।'

খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে দীপ্তেন্দু ডাফ স্ট্রীটের বাড়ির কথা ভাবছিল। বুলু অর্থাৎ অগ্নিবীণার তাকে কী যেন বলার আছে। এতদিন ইচ্ছে থাকলেও তা বলতে পারে নি। কিন্তু কী সেই কথা বুলুর? তবে কি জলপাইগুড়ির শ্বশুরবাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি করে সে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় পিত্রালয়ে এসে উঠেছে! দাদু অর্থাৎ ব্রজবিলাস সরকার নাতনির আসার খবর জানাবার সময় যেন এরকমই একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

তার রুম-মেট তিনকড়ি হাজরা নিমীলিত নেত্রে পাশ ফিরে বলল,—'কী মশায়? আজ এত চুপচাপ কেন? অফিসে কোনো গণ্ডগোল হয় নি তো?'

'না-না। গণ্ডগোল কিসের? এমনিই মানে আজ একটু খাটাখাটুনি বেশি হয়েছে কিনা। তাই আর শরীরটা বইছে না। চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে।'

তিনকড়ি হাজরা বলল,—'চোখ বুজে শুয়ে থাকুন। মাত্র পাঁচ মিনিট। দেখবেন ঘুমে চোখ দুটো কখন জড়িয়ে এসেছে।'

রবিবার ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। হাতঘড়িটা দুদিন আগেই সারিয়ে এনেছে। বালিশের নীচে হাত ঢুকিয়ে ঘড়িটা বের করে আনল দীপ্তেন্দু। প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। বিছানা থেকে উঠে মুখহাত ধুয়ে চা খেতে হবে। তারপর প্রাত্যহিক কর্ম, স্নান। সব সেরে ডাফ স্ট্রীটে পৌঁছতে বেলা নটা বাজবে।

বৈঠকখানা ঘরে ব্রজবিলাস বসেছিলেন। সেদিনকার খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে দীপ্তেন্দু ঘরে ঢুকতেই ব্রজবিলাস তাকালেন। তাকে দেখেই সমাদর করে বললেন,—'আরে দীপ্তেন্দু, এসো, এসো। সকাল থেকেই ভাবছি তুমি কখন আসবে।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'আজ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দাদু। সাড়ে সাতটায় বিছানা ছেড়ে উঠেছি।'

'তা ছুটির দিন একটু দেরিতে ঘুম ভাঙতেই পারে।' ব্রজবিলাস স্বীকার করে নিলেন। তারপর বললেন,—'আমরা বুড়ো হয়েছি। তাই কাক না ডাকতেই ঘুম ভেঙে যায়।'

অগ্নিবীণা এসে ঘরে ঢুকল ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা হাতে। তার চোখ দুটি উজ্জ্বল, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। দীপ্তেন্দুর সামনে চায়ের কাপ রেখে বলল,—'ভেতর থেকেই আপনার গলা শুনলাম। তা আগে চা খেয়ে নিন। তারপর জলখাবার আনছি।'

ব্রজবিলাস একটা অসহায় ভঙ্গি করে তার দিকে তাকাতেই অগ্নিবীণা বলল,—'কী, হাফ-কাপ চা চাই তো?'

ব্রজবিলাস ঈষৎ হেসে সায় দিলেন। বললেন,—'তুমি কিন্তু পক্ষপাতিত্ব করছিলে মহারানী। দীপ্তেন্দু আসতেই চায়ের কাপ হাতে তার সামনে এসে দাঁড়ালে। আর আমি বুড়োমানুষটা যে অনেকক্ষণ ধরে খবরের কাগজ নিয়ে পড়ে আছি সেদিকে একবার তাকালেও না।' তারপর একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—'বুড়ো হবার এই দোষ, বুঝলে দীপ্তেন্দু? কেউ আর ফিরে তাকায় না।'

অগ্নিবীণা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ব্রজবিলাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'তুমি তো সকালেই এক কাপ চা খেয়েছ দাদু। আবার এক কাপ খেলে তো রাত্তিরে ঘুম হবে না।'

ব্রজবিলাস কোনো জবাব না দিতে অগ্নিবীণা ফের শুধোল,—'কী, কাল রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছিল? বল আমাকে—।'

দীপ্তেন্দু মধ্যস্থতা করল,—'আচ্ছা, এত জেরা করছ কেন বুলু? দাদুকে দাও না হাফ-কাপ চা।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'ডাক্তারকে তবু সহ্য করতে পারি, বুঝলে দীপ্তেন্দু? কিন্তু লেডি ডাক্তার নৈব নৈব চ।' তারপর নাতনির দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন,—'যদি বলি কাল রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছিল, তাহলে সে কথা তুমি বিশ্বাস করবে মহারানী?'

'নাহ্। আমি বলব, তাহলে, শোবার আগে নির্ঘাত আধখানা ঘুমের বড়ি খেয়েছিলে।'

অগ্নিবীণা আর কথা বাড়াল না। ব্রজবিলাসকে লক্ষ্য করে বলল,—'তোমার জন্যে হাফ-কাপ চা নিয়ে আসছি। আর সেই সঙ্গে দীপ্তেন্দুদার জলখাবার।'

দরজা পর্যন্ত গিয়ে সে আবার ফিরে তাকাল। বলল,—'আমাকে একবার মেডিক্যাল কলেজে যেতে হবে দীপ্তেন্দুদা। আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে।'

'আমি?' দীপ্তেন্দু ভুরু কোঁচকাল। 'মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে আমি কী করব?'

'এমনিই যাবেন আমার সঙ্গে। জানেন তো, আগামী কাল থেকে আমি হাউস-স্টাফ হিসেবে যোগ দিচ্ছি।'

'তাই নাকি? এ তো একটা সুখবর। হাউস-স্টাপশিপ কমপ্লিট হলেই তুমি গাইনি আর অবস্টেরিকসে এম. এস. পরীক্ষায় বসতে পারবে।'

অগ্নিবীণা কেমন ম্লান হেসে জানাল,—'দেখা যাক। শেষ পর্যন্ত কী হয়।'

অগ্নিবীণা ঘরের ভিতরে যেতেই ব্রজবিলাস বললেন,—'বঙ্গভূমি কাগজে বর্ধমান কেন্দ্রের নির্বাচনী পর্যালোচনার যে প্রতিবেদনটি তুমি লিখেছ আমি সেটি মনোযোগ সহকারে পড়েছি দীপ্তেন্দু। বামপন্থীরা হয়তো লেখাটা পছন্দ করবে না। কিন্তু তোমার বক্তব্যে কোনো ফাঁক বা গোঁজামিল নেই।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'এই নির্বাচনে রাধারানী মহতাব জিততে পারেন এরকম একটা সম্ভাবনার কথা লিখেছি বলে আমাদের সম্পাদক রতিকান্ত বসু একটুও খুশি হন নি। আসলে বিনয় চৌধুরী যে ভোটে হেরে যেতে পারেন এটাই তার বিশ্বাস হয় নি।'

ব্রজবিলাস শান্তকণ্ঠে বললেন,—'এ রকম একটা ফলাফল যে হতে পারে সেটা বিশ্বাস করা শক্ত। তোমার ওই প্রতিবেদন পড়ার আগে আমার নিজের কাছেও তা অকল্পনীয় মনে হয়েছিল। কারণ কম্যুনিস্ট প্রার্থী বিনয় চৌধুরী একজন সৎ, নির্লোভ, পার্টির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ কর্মী। ১৯৫২ সনের নির্বাচনে স্বয়ং বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব বিনয় চৌধুরীর কাছে ভোটযুদ্ধে হেরে যান। ১৯৫৭ সনের নির্বাচনে অবশ্য ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরী মাত্র ১৭১০টি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। এই দুজন শক্তপোক্ত নির্ভরযোগ্য প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর রাধারানী মহতাব যে বিনয় চৌধুরীর সঙ্গে নির্বাচনে এঁটে উঠতে পারবেন সেটা বিশ্বাস করা

শক্ত নয় কি?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'সরেজমিনে নানা ধরনের ভোটারের সঙ্গে কথা বলে আমার কিন্তু মনে হয়েছে পাল্লা এবার বর্ধমানেব মহারানীর দিকেই ঝুঁকেছে। তবে ফলেন পরিচীয়তে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কে জেতেন।'

ব্রজবিলাস শুধোলেন,—'তুমি কি এবার বাঁকুড়া শহরের নির্বাচনী রণাঙ্গন দেখতে যাচ্ছ দীপ্তেন্দু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার পরিক্রমার মধ্যে ওটা পড়বে। আর সম্ভব হলে আজ রাত্তিরের ট্রেন ধরে আমি বাঁকুড়া রওনা হতে পারি। বাঁকুড়ার পর মেদিনীপুরেও একবার যাবার ইচ্ছে। সেখানে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী আছেন। কংগ্রেস প্রার্থী হলেন পুর চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল বারী। উনি গত আঠারো বছর ধরে মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচিত হয়ে আসছেন।'

ইতিমধ্যে ভিতর থেকে ব্রজবিলাসের চা আর দীপ্তেন্দুর জন্য লুচি, বেগুনভাজা পাঠিয়ে দিয়েছে অগ্নিবীণা। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ব্রজবিলাস বললেন,— 'আমাকেও একবার বাঁকুড়ায় যেতে হবে। অন্তত চার-পাঁচ দিনের জন্য। নইলে পরাশর ছাড়বে না। এই সেদিনও বলে গেল ওর কনস্টিচুয়েন্সিতে কয়েক জায়গায় মিটিঙ করতে হবে।'

দীপ্তেন্দু অনুযোগ করল,—'কিন্তু এই ভাঙা শরীরে আপনার কি এত পরিশ্রম, ঘোরাঘুরি সহ্য হবে দাদু? তার চেয়ে বরং পরাশর দাদুকে একটা চিঠি লিখে দিন। শরীর খারাপ বলে নির্বাচনী সভা করতে আপনি যেতে পারলেন না।'

'না-না। তা হয় না দীপ্তেন্দু। পরাশর আমার পথ চেয়ে বসে আছে। ধর আমি যদি না যাই এবং নির্বাচনে পরাশর হারে তাহলে ওকে কোনোদিন মুখ দেখাতে পারব? চিরকাল ভাববে আমি গেলাম না বলেই ইলেকশনে ও জিততে পারেনি।'

ব্রজবিলাস যাবেনই। শরীর অশক্ত হলেও কোনো যুক্তি দিয়ে তাকে ক্ষান্ত করা যাবে না। এটা বুঝতে পেরে দীপ্তেন্দু চুপ করে গেল। ব্রজবিলাসকে বোঝাবার আর চেষ্টা করল না।

মিনিট পাঁচেক বাদেই অগ্নিবীণা ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। তার কপালে বড় লাল টিপ। সিঁথিতে একটু সিঁদুর ছোঁয়ানো।। পরনে একটা চাঁপাফুল রঙের শাড়ি। কাপড়টার চওড়া লাল পাড়। বুলুকে এত সুন্দর মানিয়েছে এই শাড়িতে। দীপ্তেন্দু একদৃষ্টিতে কতক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

অগ্নিবীণা এগিয়ে এসে বলল,—'জানেন তো দীপ্তেন্দুদা, দাদু আবার বাঁকুড়ায় যেতে চাইছে।'

'হ্যাঁ শুনলাম। তবে বাঁকুড়া শহরে নয়। পরাশর দাদুর কনস্টিচুয়েন্সিতে।'

'তাহলেই বুঝুন। সেটা জেলার আরো অনেক ভেতরে। দাদু বলেছে বাঁকুড়া থেকে আটত্রিশ মাইল বাসে যেতে হয়।'

ব্রজবিলাস মুচকি হেসে বললেন,—'বাসে নাও যেতে হতে পারে। জেলা কংগ্রেস থেকে নিশ্চয় গাড়ির ব্যবস্থা করবে।'

'সে না হয় বুঝলাম।' অগ্নিবীণা চোখ নাচিয়ে কথা কইল। শুধোল,—'কিন্তু সেখানে তুমি থাকবে কোথায় সেটা তো বলনি।'

ব্রজবিলাস মৃদু হেসে উত্তর দিলেন,—'সে ব্যবস্থা পরাশর করবে। তোমার চিন্তা নেই মহারানী। গতবারেও দালান বাড়িতে আমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'দাদুর সঙ্গে তুমি না হয় যেতে বুলু। তাহলে সেখানে ওর দেখাশুনো করতে পারতে।'

অগ্নিবীণা মাথা নাড়ল। বলল,—'দাদুর যে তাতে মত নেই। আসল ব্যাপারটা কী জানেন দীপ্তেন্দুদা? আমি সঙ্গে গেলে এই বয়সে দাদুর এখানে-সেখানে যাওয়া, এগুলো তো আর হতে দেব না। আর জেলা কংগ্রেস থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করলে কী হবে? এমন সব জায়গায় বক্তৃতার আয়োজন করে যে সেখানে যেতে হলে গোরুর গাড়ি কিংবা হণ্টন ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'ওসব কথা পরে হবে। তোমরা এখন এসো। মেডিক্যাল কলেজের কাজ শেষ হলেই দীপ্তেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি আসবে। দেরি ক'র না।'

রাস্তায় নেমে কয়েক মিনিট হাঁটল দুজনে। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে একটা ট্রাম আসছিল। রবিবার, তাই ফাঁকা গাড়ি এবং যাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। অগ্নিবীণা বলল,— 'চলুন, এই ট্রামটায় উঠে পড়ি। ট্যাক্সির জন্য আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে?'

ট্রামে উঠে মাঝামাঝি একটা জায়গায় দুজনে বসল। হঠাৎ কী মনে হতে দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল,—'আচ্ছা বুলু, তুমি যেন আমাকে কী বলবে চিঠিতে লিখেছিলে?'

'এতক্ষণে বুঝি সে কথা মনে পড়ল আপনার?'

'না মানে দাদুর সামনে তোমাকে আর সে কথা জিজ্ঞেস করিনি।'

'ভেরি গুড্। তাহলে তো আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে দেখছি। আমি ভেবেছিলাম রিপোর্টারের কাজ করে মগজে বুঝি মরচে পড়ে গিয়েছে।'

'কী যে বলো।' দীপ্তেন্দু হাসল। হঠাৎ চলন্ত ট্রামটা মেডিক্যাল কলেজ পেরিয়ে যেতেই সে ব্যস্ত হয়ে বলল,—'এই, মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল যে ছেড়ে এলাম। তুমি নামবে না?'

'নামব কেন?' অগ্নিবীণা তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল। সুন্দর একটি ভঙ্গি করে সে জিজ্ঞেস করল,—'আচ্ছা, আপনাকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাব এটাই বা ভাবলেন কেমন করে?'

'আশ্চর্য! তুমি তো তখন তাই বললে।'

'সত্যি। আপনি এত সহজ, সরল দীপ্তেন্দুদা। আচ্ছা, মেডিক্যাল কলেজে দরকার আছে না জানালে কী বলে আপনার সঙ্গে বেরিয়ে আসতাম?'

ট্রাম বউবাজারের মোড়ে আসতেই দুজনে নেমে পড়ল।

অগ্নিবীণা বলল,—'চলুন ইন্দোবার্মা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি। ভিড়ভাড় কম, মোটামুটি ফাঁকা থাকে।'

সেদিনকার মতই রেস্তোরাঁয় লোকজনের ভিড় নেই। সামনে দু-চারজন খরিদ্দার বসে। চায়ের কাপ নিয়ে তারা গল্পে মত্ত। তাই কয়েক পা এগিয়ে কোণের দিকের একটা ছোট্ট টেবিলে মুখোমুখি বসল দুজনে। একজন বুড়োমতন লোক অর্ডারের জন্য কাছে আসতেই অগ্নিবীণা তাকে দু-কাপ চা আর দুটো কেক দিতে বলল।

দীপ্তেন্দু বাধা দিল,—'আবার কেক কেন বুলু? এই মাত্র অতগুলো লুচি বেগুনভাজা দিয়ে খেয়ে এলাম। শুধু দু-কাপ চা বললেই হ'ত।'

'নাহ্। তার কারণ আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। দু-কাপ চা নিয়ে অতক্ষণ রেস্তোরাঁর চেয়ার দখল করে বসে থাকা ঠিক শোভন নয়।'

মিনিট কয়েক না যেতেই বুড়ো লোকটা চা আর কেক নিয়ে এলো। পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে কোনোরকম ভনিতা না করেই অগ্নিবীণা বলল,—'দাদু আপনাকে বলেছেন কিনা জানিনা, আমি জলপাইগুড়ি থেকে চলে এসেছি।'

ব্যাপারটা যে সিরিয়াস দীপ্তেন্দু এতক্ষণে বুঝতে পারল। ব্রজবিলাস অবশ্য তাকে এরকম একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু বুলু অর্থাৎ অগ্নিবীণা যে পাকাপাকিভাবে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসবে এটা তার মগজে ঢোকে নি।

একটু চিন্তা করে সে বলল,—'হঠাৎ এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে হ'ল কেন?'

অগ্নিবীণা বলল,—'আমার মতো অবস্থায় পড়লে যে কোনো মেয়েই এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিত। অবশ্য তার যদি বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানজ্ঞান থাকে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'গণ্ডগোল বাধল কেমন করে? নিশ্চয় মেডিক্যাল কলেজে তোমার এই হাউসস্টাফশিপ কমপ্লিট করা নিয়ে?'

অগ্নিবীণা জবাব দিল,—'হ্যাঁ। বলতে পারেন দ্যাট ওয়াজ দি লাস্ট স্ট্র অন দি ক্যামেল'স ব্যাক। কিন্তু তলে তলে অনেকদিন থেকেই এই গণ্ডগোলটা দানা বাঁধছিল। একদিন হঠাৎ যখন আমি এটা আবিষ্কার করলাম তখন আমার আর বিদ্রোহ করা ছাড়া অন্য পথ সামনে খোলা ছিল না।'

দীপ্তেন্দু আরো কিছু শোনার জন্য সাগ্রহে তাকাল।

অগ্নিবীণা বলল,—'আমার শ্বশুরবাড়ির পূর্ব-ইতিহাসটা না জানলে কেন যে আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হ'ল সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না।' কেকের গায়ে ছোট্ট একটু কামড় দিয়ে অগ্নিবীণা আবার শুরু করল,—'জলপাইগুড়িতে আমার শ্বশুরবাড়ির পরিবার বনেদী এবং এককালে বেশ ধনী বলেই পরিচিত ছিল। চা-বাগানের মালিকানা, কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা ইত্যাদি নানা ধরনের আয়ের উৎস ছিল বলে এই পরিবারের হাতে পাহাড় প্রমাণ সঞ্চয় না থাকলেও টাকাকড়ি কিছু কম ছিল না। আমার স্বামীর ঠাকুর্দা রজতকান্তি দত্ত ছিলেন রীতিমত বিলাসী। সেকালেই

ফি-বছর তিনি একবার বিলেত দেশটা ঘুরে আসতেন। অন্যান্য চা বাগানের সায়েব-সুবোরা প্রায় আসতেন আমার শ্বশুরবাড়িতে। বলাবাহুল্য সেই সব রাত্তিরে আমোদ-প্রমোদের ফোয়ারা বইত শ্বশুরবাড়ির বাগানবাড়িতে। সুরাপান তো সামান্য ব্যাপার। উপভোগের জন্য স্বাস্থ্যবতী তরুণীদের সাপ্লাই করত বাগানের আড়কাঠিরা। তারপর যা হয়। বেহিসেবী খরচ করলে সঞ্চয় ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসে। আমার শ্বশুরবাড়ির পরিবারেও তাই ঘটল। ঠাকুর্দা অর্থাৎ রজতকান্তি দত্তকে অবশ্য এসব দেখে যেতে হয় নি। কিন্তু আমার শ্বশুর কনককান্তি দত্তের আমলেই চা-বাগানটা দেনার দায়ে হস্তান্তর করতে হ'ল। বাকি রইল কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা। তাও দেখে শুনে চালাতে পারলে তার আয়ও কিছু কম ছিল না। আপনি শুনেছেন নিশ্চয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমার স্বামী চাকরি-বাকরির চেষ্টা করেন নি। বয়সের ভার আর যৌবনের অত্যাচার এই দুই মিলিয়ে শ্বশুরমশায়ের তখন এমন অবস্থা যে কন্ট্রাক্টরি ব্যবসার বোঝাটা আর টানতে পারছিলেন না। ফলে বিজনেসটা সম্পূর্ণভাবেই আমার স্বামীর ওপর বর্তাল। আর এসব ব্যবসায় যা অবশ্যম্ভাবী, উনিও তার ব্যতিক্রম হন নি। ধীরে ধীরে মদ্যপান ওর নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়াল।'

'দাদু সেকথা আমাকে একদিন বলেছেন,' দীপ্তেন্দু ছোট্ট প্রত্যুত্তর দিল।

অগ্নিবীণা বলল,—'আপনি হয়তো ভেবেছেন এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে কেন আমি শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটালাম। এরকম ভাবা খুব স্বাভাবিক। উনি যে মদ খান এটা আমি বিয়ের দু-চারদিন বাদেই টের পেয়েছিলাম। আর কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা করতে হলে মদ খেতেই হয় আবার খাওয়াতেও হয়। নইলে ব্যবসা চলবে না, মার খাবে। তাই শ্বশুরবাড়িতে আসার কিছুদিন বাদেই এটা আমার গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। আর ব্যবসার কাজে মাসের পনের-কুড়ি দিন তো উনি বাইরেই থাকতেন। ফলে বন্ধুবান্ধব কিংবা ইঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে বসে মদ খাওয়ার আসরটা আমার দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালেই রয়ে গেল। যে কটা দিন উনি বাড়িতে থাকতেন, সেই দিনগুলিতে তো বন্ধুবান্ধবদের আসা-যাওয়া ছিল না। একটা ঘরে বসে অনেক রাত্তির পর্যন্ত একাই মদ গিলতেন। আমি দু-একবার বলেছি এত বেশি ড্রিঙ্ক করলে কিন্তু লিভার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমার তো মনে হয় এই বদ-অভ্যাসটা ছাড়লেই ভালো, নইলে কমানো উচিত। এক পেগ কিংবা বড় জোর দু-পেগ তার বেশি কখনও খাওয়া ঠিক হবে না।

উনি অর্ধ-মত্ত অবস্থায় জড়িত কণ্ঠে বলতেন,—ডাক্তার বউ হওয়া দেখছি এক ফ্যাসাদ। সব ব্যাপারেই তুমি যদি নাক গলাও অগ্নিবীণা তাহলে তো আমার পক্ষে বাড়িতে থাকাই দুষ্কর।'

অগ্নিবীণা ফের বলল,—'বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে স্বামীকে শোধরানোর সময় পার হয়ে গেছে। হঠাৎ তেমন কিছু না ঘটলে মদের নেশাটা ওর যাবে না। ফলে ব্যাপারটা আমি মেনেই নিয়েছিলাম। কিন্তু শুধু মদ নয় আর একটা কুৎসিৎ প্রবৃত্তি

কখন যে ওকে গ্রাস করেছে সেটা তখনও আমি টের পাই নি। মাসের পনের-কুড়িটা দিন যে পুরুষ মানুষ একা বাইরে পড়ে থাকে অথচ ঘরে ফেরার কোনো তাগিদ অনুভব করে না, তার পিছনে যে একটা গভীর রহস্য থাকে এটা আমার বুদ্ধিতে ধরা পড়ে নি। কিন্তু পাপ কি চিরকাল চাপা থাকে দীপ্তেন্দুদা? তাই একদিন গভীর নিশীথে সেটা আমার চোখের সামনে প্রকট হয়ে দেখা দিল। ইতিমধ্যে কিছুদিন আগে আমার শ্বশুর গত হয়েছেন। বাড়িতে আমার স্বামীই সর্বময় কর্তা। শাশুড়ির আর ঘর-সংসারে মন নেই। ঝি-চাকরদের হাতেই বাড়িঘর দেখভালের ভার। আমি একটা চা-বাগানের হাসপাতালে ভিজিটিং মেডিক্যাল অফিসার। সংসার দেখার মতো সময় কোথায়? বহুক্ষণ হাসপাতালেই কাটে। বাড়িতে কী হয়, কে এলো গেলো সেদিকে নজর দেবার মতো ফুঁসৎ ছিল না। হঠাৎ বাড়ি এসে একদিন লক্ষ করলাম একটা কমবয়সী নেপালী মেয়ে কাজে লেগেছে। মেয়েটা নেপালী হলেও বেশ সুন্দর দেখতে। ঈষৎ পিঙ্গল ওর চুলের বর্ণ। গায়ের রঙ ফর্সা। অরণ্যের বুনো ফুলের যে সৌন্দর্য ওরও সেই wild beauty.'

অগ্নিবীণা বলছিল,—কাজে কর্মে অমন কত মেয়ে এ বাড়িতে আসে। কেউ টিকে থাকে। কেউ বা না পোষালে দু-চার মাস বাদেই চলে যায়। কারো দিকেই বিশেষ নজর দেবার মতো সময় ছিল না আমার। সেদিন রাত্তিরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছিল। হিমালয় ঘেঁষা জলপাইগুড়িতে এমন বৃষ্টি হয়। হয়তো সমস্ত রাত ধরে টানা বর্ষণ হল। তারপর সকালেই আবার আকাশ পরিষ্কার। রাত দশটা নাগাদ খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে পড়েছিলাম। দিন পাঁচ-ছয় আমার স্বামী বাড়িতেই আছেন। বর্ষার সময় ঠিকাদারির কাজে একটা মন্দা আসে। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর তৈরির কাজ বন্ধ। হঠাৎ নদীতে বন্যা-টন্যা এলে তবু বোল্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ জোটে। কিংবা বালির বস্তা ফেলতে হয় নদীর পাড়ে,—যাতে বন্যার জল না মাটি ধুয়ে নিয়ে যেতে পারে।

তখন কত রাত্তির মনে নেই। হঠাৎ একটা চাপা ফিসফিসানি কানে যেতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। বাইরে ঘন্টাখানেক বাদেই ফের মুষলধারায় বৃষ্টি নামবে। টর্চের আলো ফেলে পালঙ্ক থেকে মেঝেতে পা দিলাম। তাকিয়ে দেখি পাশের খাটে বিছানায় আমার স্বামী নেই। সেই ফিসফিস কণ্ঠস্বর তখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। তারা নিম্নস্বরে কথা কইছে। সেই কণ্ঠস্বরের উৎস কোথায় সেটা আঁচ করে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। দোতলা থেকে ধীরে ধীরে নামলাম। বৃষ্টি কমতেই দুজনের গলা আরো পরিষ্কার শোনা গেল। পা টিপে টিপে খানিকটা যেতেই লক্ষ করলাম একটা ঘরের দরজা ভেজানো। সামান্য একটু ফাঁক করে খোলা। উল্টো দিকে টর্চের আলো ফেলে সেই স্তিমিত আলোকে পরিষ্কার দেখলাম আমার স্বামী ওই নেপালী মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। আর সোহাগে তৃপ্ত নেপালী মেয়েটা সেই স্পর্শসুখে আমার স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে

নিশ্চিন্তে চোখ বুজে রয়েছে।

তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থা আমার। সজোরে এক লাথি মেরে দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালাম আমার শাশুড়ির ঘরের সামনে। প্রচণ্ড করাঘাত করতেই তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললেন,—'কী হয়েছে? কী হয়েছে বৌমা?'

বললাম, 'স্বচক্ষে দেখবেন চলুন আপনার ছেলের কীর্তি।'

শাশুড়ি বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। আমার পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বললেন,—'চল, আমার কাছে শোবে। বিছানায় শুয়ে তোমার কথা শুনব।'

'নাহ্।' আমি প্রায় চিৎকার করে তাকে প্রত্যাখ্যান করলাম। বললাম,—'আগে আপনার ছেলের কীর্তি স্বচক্ষে দেখবেন চলুন। তারপর না হয়।'

'আমি জানি তুমি কী বলছ? কী দেখাতে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ।'

'আপনি জানেন?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

শাশুড়ি নিরুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,—'ওই নেপালী মেয়েটার সঙ্গে তোমার স্বামীকে এক বিছানায় দেখেছ, এই তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে এটা জেনেও আপনি নিশ্চিন্তে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন।'

শাশুড়ির চোখ দুটি তখনও ঘুমে জড়ানো। রাত দুপুরে এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে এটা বোধহয় শোবার সময়েও তিনি চিন্তা করতে পারেন নি। আমাকে লক্ষ করে শাশুড়ি বললেন, —'তুমি তো ডাক্তারি নিয়েই ব্যস্ত আছ বৌমা। ঘর-সংসার, স্বামী কী করে, কোথায় যায়, তার কী চাহিদা এসব দিকে কি কোনোদিন ফিরে তাকিয়েছ? ওই নেপালী মেয়েটা যেদিন এ বাড়িতে এসে ঢুকল, আমি সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, ওটা সাধারণ দাসী-বাঁদী নয়। ও তোমার স্বামীর রক্ষিতা।'

'আপনি কী বলছেন?' আমি চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে তাকালাম।

'ঠিকই বলছি। আর মিথ্যে কথা তো বলতে পারব না। এ বাড়িতে এটাই রেওয়াজ হয়ে গেছে। তোমার দাদাশ্বশুরের যে একাধিক রক্ষিতা ছিল শহরের পুরানো লোকেরা অনেকেই সে কথা জানে। বিয়ের পরই আমার শাশুড়ি তাই বলেছিলেন,—সব দিকে বেশি নজর দিও না বৌমা। তাতে তোমারই ক্ষতি হবে। তারপর একদিন তোমার শ্বশুর একটা মদেসিয়া মেয়েকে এ বাড়িতে এনে তুললেন। তার গায়ের রঙ কালো হলেও মেয়েটা স্বাস্থ্যবতী। বেশ বড়ো বড়ো চোখ। তোমার শ্বশুরের বোধহয় ওকে ভালো লেগেছিল। তুমি বিশ্বাস করবে না, ভুরুতে আতর মেখে আর রুমালে সেন্ট ঢেলে আমার চোখের সামনে দিয়ে তোমার শ্বশুর ওই মদেসিয়া মেয়েটার ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিতেন। একদিন বেশি কান্নাকাটি করেছিলাম বলে আমাকে শাসিয়ে ছিলেন, বাড়াবাড়ি করলে তোকে কেটে করলা

নদীর জলে ভাসিয়ে দেব, কেউ জানবে না। তারপর ওই মদেসিয়া মেয়েটার গর্ভে সন্তান জন্মাল। আর তখন তোমার শ্বশুরের টনক নড়ল। একটা ব্যবস্থা না নিলে শহরে যে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মদেসিয়া মেয়েটাকে মোটা টাকা আর গয়নাগাঁটি দিয়ে ছেলেসুদ্ধ ওর দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। চোখের সামনে এসব দেখেও তো মুখ বুজে সব সহ্য করেছি।'

অগ্নিবীণা চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল,—'শাশুড়িকে বললাম, আপনি সহ্য করেছেন বলেই কি আমাকেও সব মুখ বুজে সইতে হবে?'

শাশুড়ি বললেন,—'এ ছাড়া কী উপায় আছে বলো?'

অগ্নিবীণা ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দিল,—'উপায় আমি নিজেই খুঁজে বের করব। এ বাড়িতে আর থাকছি না। কালই হাসপাতালে লেডি ডাক্তারের কোয়ার্টার্সে গিয়ে উঠব।'

পেয়ালাটা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখে অগ্নিবীনা বলল—'প্রায় মাস তিন হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে ছিলাম। তরপর একদিন ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে চলে এলাম। চিঠিপত্র লিখে আগেই জেনেছিলাম যে হাউসস্টাফশিপটা কমপ্লিট করলেই গাইনি আর অবস্টেরিকসের এম. এস. পরীক্ষায় আমি বসতে পারব। দাদু বোধহয় ঘটনাটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু মুখে একটি কথাও বলেন নি। আমি যে রাগ করে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে গিয়ে উঠেছি, শাশুড়ি বোধহয় সে কথাটা দাদুকে চিঠিতে লিখেছিলেন। তবে ছেলের দুশ্চরিত্র স্বভাবের কথা বেমালুম গোপন রাখতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করেন নি।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'তোমার স্বামী হাসপাতালে এসে তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ করেন নি?'

'হ্যাঁ। মাসখানেক বাদে বোধহয় মায়ের তাড়নায় একবার এসেছিলেন। কিন্তু আমি সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করি।'

অগ্নিবীণা উঠে দাঁড়াল। বলল—'আজ এই পর্যন্তই থাক। পরে আরো শুনবেন।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল,—'বেশি দেরি করলে দাদু চিন্তা করবেন।'

চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এসেই সে হঠাৎ ব্যাগের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট প্যাকেট বের করল।

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'কী ওটা?'

প্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে অগ্নিবীণা বস্তুটি বের করল। একটা গোল্ডেন কালারের স্লিপ-ওভার। দীপ্তেন্দু চোখ তুলে তাকাতেই সে হেসে বলল,—'রঙটা চমৎকার। তাই না? আপনাকে খুব মানাবে এটা পরলে।' তারপর চোখ নাচিয়ে মিষ্টি হেসে শুধোল,—'কী মশায়, পছন্দ হয়েছে তো?

'খুউব। খুউব পছন্দ হয়েছে বুলু।' দীপ্তেন্দু গাঢ় স্বরে কথা কইল। তারপর স্লিপ ওভারটা গভীর ভালবাসার সঙ্গে বুকের কাছে চেপে ধরল।

॥ সাত ॥

ব্রজবিলাস অপেক্ষায় ছিলেন। দীপ্তেন্দু আর অগ্নিবীণা ঘরে ঢুকতেই প্রায় ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন,—'আরে এসো তোমরা।' তারপর নাতনিকে লক্ষ করে বললেন, —'ঘড়িতে কটা বাজল সে খেয়াল আছে? আমার বুঝি খিদে পায় না মহারানী?'

অগ্নিবীণা প্রতিবাদ জানাল,—'বা রে। আমি তো রাঁধুনিদিদিকে বলে গিয়েছিলাম সকাল-সকাল তোমাকে খাইয়ে দিতে।' তারপর চোখ পাকিয়ে শাসনের ভঙ্গিতে ব্রজবিলাসের দিকে তাকিয়ে বলল,—'তুমি নিশ্চয় খেতে চাওনি দাদু?'

দীপ্তেন্দু মধ্যস্থতা করল,—'ঠিক আছে বুলু। দেরি হয়তো সামান্য হয়েছে। কিন্তু আর দেরি করেও লাভ নেই। তুমি বরং তাড়াতাড়ি জায়গা করে ভাত দিতে বল। হাতমুখ ধুয়ে আমি আর দাদু টেবিলে গিয়ে বসছি।'!

'উঁহুঁ।' ব্রজবিলাস মাথা নাড়লেন, বললেন,—'দুজনে কেন? আমরা তিনজনেই একসঙ্গে খেতে বসব। তুমি, আমি আর মহারানী।'

অগ্নিবীণা ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখল ব্রজবিলাসকে। বলল,—'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাই হবে। আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও। আমি জামাকাপড় বদলে আসছি।'

অগ্নিবীণা ভিতরে ঢুকতেই ব্রজবিলাস দীপ্তেন্দুর কাছে এগিয়ে গেলেন। ঈষৎ খাটো গলায় বললেন,—'তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল, বুঝলে?'

'কী কথা? বলুন দাদু।'

ব্রজবিলাস মাথা নাড়লেন। আগের মতো অনুচ্চকণ্ঠে বললেন,—'এভাবে সেটা বলা যাবে না। তোমাকে একটু একা পেলে বলতে সুবিধে হ'ত।' তারপর চারপাশে দ্রুত নজর বুলিয়ে যোগ করলেন—'মহারানীর কানে গেলে বেজায় চটে যাবে।'

ব্রজবিলাস কী যেন ভাবছিলেন। ভুরু তুলে দীপ্তেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন,—'আগামীকাল মহারানী মেডিক্যাল কলেজে হাউস-স্টাফ হিসেবে জয়েন করবে। তুমি কি বেলা দশটা নাগাদ একবার এদিকে আসতে পার?'

দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল, বলল,—'নাহ্ দাদু। আজ রাত্তিরেই আমাকে বাঁকুড়া যেতে হবে। নির্বাচনী পর্যালোচনার দ্বিতীয় কিস্তিটা কভার করতে। ফিরতে ধরুন সেই বুধবার। তার আগে তো দেখা হবে না।'

'বেশ। বাঁকুড়া থেকে ফিরেই না হয় এসো।' ব্রজবিলাস সংক্ষিপ্ত হলেন। তারপর কী ভেবে আবার শুধোলেন, —'আচ্ছা, মহারানী কি তোমাকে কিছু বলেছে?'

ব্রজবিলাসের উৎকণ্ঠার কারণ দীপ্তেন্দু বুঝতে পারল। একবার ভাবল ব্যাপারটা চেপে যাবে। তারপর কী মনে হতে নিজেই ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল। বলল, —'সে অনেক কথা দাদু। আপনার শুনতে সময় লাগবে।'

'কিছু কিছু আমি শুনেছি। ওর শাশুড়ি মানে সৌম্যকান্তির মা আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। গতবারেই মহারানী যখন এখানে চলে আসে, তার আগেই ও শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে গিয়ে ওঠে। এই খবরটা কিন্তু আমরা জানতাম না। মহারানী কিংবা ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কেউ খবর দেয় নি। আর মহারানী কলকাতায় এসেছিল শুধু মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে ওর হাউস-স্টাফশিপ কমপ্লিট করার পারমিশন নিতে। সেই ব্যাপারে কথা পাকা হতেই আবার জলপাইগুড়ির হাসপাতালে ফিরে যায়।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'ওর শ্বাশুড়ি আপনাকে কখন চিঠি লিখেছিলেন?'

'গতবার মহারানী জলপাইগুড়ি রওনা হবার পর। উনি ভেবেছিলেন ছেলের বৌ হয়তো আবার স্বামীর কাছেই ফিরে আসবে। কিন্তু মহারানী হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে গিয়ে উঠেছে জানবার পর এখানে একটি কড়া চিঠি পাঠাতে আর কালবিলম্ব করেন নি। পত্রে লেখা ছিল, সৌম্যকান্তি মানে মহারানীর স্বামী নিজে হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাকে বাড়ি ফিরে আসতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু মহারানী সে কথায় কর্ণপাত করেনি।'

ঘরের ভিতর থেকে মহারানীর কণ্ঠস্বর শুনেই ব্রজবিলাস নীরব হয়ে গেলেন। দীপ্তেন্দুকে বললেন,—'চল, বোধহয় খাবার জায়গা হয়েছে।'

টেবিলে খেতে বসে ব্রজবিলাস বললেন,—'দীপ্তেন্দু তো আজ রাত্তিরেই বাঁকুড়া রওনা হচ্ছে। তুমি সে খবর জান তো মহারানী?'

'কেমন করে জানব দাদু? দীপ্তেন্দুদা কি সে কথা আমাকে বলেছেন?'

মুখের ভিতর ভাতের গ্রাসটা গলাধঃকরণ করে দীপ্তেন্দু বলল,—'বা রে! বাঁকুড়া যাবার কথা তো আগেই ঠিক হয়ে আছে। শুধু দিনটাই যা বলা হয়নি।'

ব্রজবিলাস বললেন—'অফিসের কাজ। যেমন নির্দেশ দেবে তেমন যেতে হবে বৈকি। তুমি বাঁকুড়া থেকে ঘুরে এসো দীপ্তেন্দু। অবশ্য আমাকেও একবার যেতে হবে। শুধু পরাশরের চিঠির অপেক্ষায় রয়েছি।'

খাওয়ার পর দীপ্তেন্দু বাইরের ঘরের একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। অগ্নিবীণা কাছে এসে বলল, 'আপনার তো পান-টান খাওয়া অভ্যেস নেই দীপ্তেন্দুদা।'

'যা বলেছ তুমি।' দীপ্তেন্দু মুচকি হাসল, বলল,—'আমার পান দোষ নেই।'

অগ্নিবীণা এক ঝলক তার দিকে তাকিয়ে বলল,—'ঈশ্বর করুন ওই দোষটা যেন কোনোদিন না হয়।'

একঘন্টা বাদেই দীপ্তেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল,—'আমি তাহলে যাই দাদু। দু-একজনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে। কাগজের অফিসে ঢুকে তো আর সময়ই পাই না। তারপর রাত্তিরের ট্রেন ধরতে হবে। সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়তে পারলেই ভালো।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'বাঁকুড়া থেকে ফিরে একবার এসো কিন্তু। এ পথ যেন

আবার ভুলে যেও না।'

'তাই কখনও ভুলতে পারি দাদু? দীপ্তেন্দু মুচকি হাসল।

দরজা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিল দীপ্তেন্দু। অগ্নিবীণা তার সঙ্গে খানিকটা পথ হেঁটে গেল।

দীপ্তেন্দু বলল,—'জলপাইগুড়ির সব ঘটনা দাদুকে জানানো উচিত ছিল তোমার।'

'কী হবে জানিয়ে? দাদু কিংবা বাবা কেউই এর কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। আপনি জানেন, হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে থাকতে আমার স্বামী সৌম্যকান্তি দত্ত একটা উকিলের নোটিশ পাঠিয়েছিল আমাকে।'

'তাই নাকি? কিসের নোটিশ?'

'কিসের আবার? Restitution of Conjugal life. দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মামলা করবে বলে শাসিয়েছিল।'

'কী আশ্চর্য!' দীপ্তেন্দু বিস্ময় প্রকাশ করল।

অগ্নিবীণা বলল,—'পৃথিবীতে এমন আরো অনেক আশ্চর্য রয়েছে। স্বামী রক্ষিতাকে নিয়ে সহবাস করবে। আর তা জেনেও একটি মেয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করে আবার সেই স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটাতে তার শয্যা-সঙ্গিনী হবে।' ঢোক গিলে অগ্নিবীণা জিভটাকে ফের সচল করে নিয়ে বলল,—'আমাদের দেশে মেয়েরা বড় অসহায় দীপ্তেন্দুদা। অর্থে, শক্তিতে তারা পুরুষের চেয়ে হীন বলেই স্বামী তাদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালাতে দ্বিধা করে না। তবু তো আমার একটা 'economic freedom' আছে। ডাক্তারি পাশ করেছি। মাস গেলে একটা মাইনে আছে। হাসপাতাল থেকে কোয়ার্টার্স দিয়েছে। আমার পক্ষে যা সম্ভব দেশের অনেক মেয়েই তা পারে না। ফলে তারা শুধু পড়ে-পড়ে মার খায়।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'দাদু বোধহয় সমস্ত ব্যাপারটা জানতে চান। সেটা আমার কাছ থেকে না শুনে বরং তোমার মুখ থেকে জানাই ভালো।'

'আপনাকে তো সবই বলেছি দীপ্তেন্দুদা। সৌম্যকান্তির রক্তে যা আছে তাই প্রকাশ পেয়েছে। সে মদ্যপ, দুশ্চরিত্র। বাড়িতে স্ত্রী থাকতেও রক্ষিতা পোষে। এ সবই তার পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ছেলেবেলায় সৎ শিক্ষা পেলে বা চোখের সামনে সু-দৃষ্টান্ত দেখলে হয়তো বা তার একটা পরিবর্তন আসতে পারত। কিন্তু আজ আর সেটা সম্ভব নয়। মেয়েরা ওর কাছে ভালবাসার নয়, ভোগের বস্তু।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'তুমি অনেকটা চলে এসেছ বুলু। এবার ফিরে যাও।'

'বেশ যাচ্ছি। কিন্তু বাঁকুড়া থেকে ফিরেই আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা করবেন। মনে থাকে যেন।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'নিশ্চয় মনে থাকবে।'

মোড়ে এসে সে একটা কলেজ স্ট্রীটগামী ট্রামে উঠে বসল। আপাতত কফিহাউস তার গন্তব্যস্থল। রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় আড়াইটে বাজে। সন্দীপকে হয়তো এখনও পাওয়া যেতে পারে। ছুটির দিন কফিহাউসে সন্দীপ দুপুরবেলাটা থাকে। ট্রাম থেকে নেমে দীপ্তেন্দু সিঁড়ি বেয়ে কফিহাউসের দোতলায় উঠল। যা ভেবেছিল তাই। সন্দীপ একটা চেয়ারে বসে দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কী যেন কথা বলছে। দীপ্তেন্দু কাছে যেতেই সে সোৎসাহে জানাল,—'আসুন, আসুন দীপ্তেন্দুবাবু। আমি কদিন ধরেই ভাবছি একবার আপনার কাছে যাব।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল দীপ্তেন্দু। বলল,—'আমাদের অফিসে একটা টেলিফোন করলেও পারতেন। তাহলে আমিই সময় করে একদিন এখানে চলে আসতাম।'

সন্দীপ বলল—'টেলিফোন করলে কি আপনাকে ধরা যায়? একদিন করেছিলাম, তো অপারেটর জবাব দিল উনি কাজে বেরিয়েছেন।'

'তখন যদি একটা message দিয়ে রাখতেন যে আপনি টেলিফোন করেছেন তাহলে অফিসে ফিরে কিংবা পরদিন আমি ঠিক খরবটা পেয়ে যেতাম।'

বেয়ারা এসে টেবিলে কফির কাপ রেখে গেল।

সন্দীপ বলল,—'আপনার জন্য কিন্তু একটা সারপ্রাইজ রয়েছে।'

'সারপ্রাইজ? সেটা কী?' দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে তাকাল।

'বসুন না! আয়েস করে কফিটা শেষ করুন। তারপর স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন। আর মিনিট দশ-বারো অপেক্ষা করলেই চলবে।'

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে দীপ্তেন্দু ঈষৎ ভুরু কোঁচকাল। তবে দশ মিনিটও অপেক্ষা করতে হয় নি। তার আগেই সারপ্রাইজ সশরীরে হেঁটে সামনে এসে দাঁড়াল। অন্য কেউ নয়। রঞ্জন,—রঞ্জন মিত্র।

দীপ্তেন্দু উঠে দাঁড়াতেই রঞ্জন তার কাঁধে হাত রেখে বলল,—'কতদিন পরে দেখা তোমার সঙ্গে। কোথায় ডুব দিয়েছিলে এতদিন?'

দীপ্তেন্দু কোনো জবাব দেবার আগেই সন্দীপ জানাল,—'সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। কিন্তু ওই কাহিনী এখন থাক। আপাতত জেনে রাখ দীপ্তেন্দুবাবু বঙ্গভূমি কাগজের একজন উদীয়মান সাংবাদিক। বেশ ভালো লিখছেন। এই তো কদিন আগে বর্ধমান কেন্দ্রের নির্বাচনী পর্যালোচনা সেরে লিখেছেন এবার বিনয়বাবুর চেয়ে রাধারানী মহতাবের দিকেই জয়ের পাল্লাটা একটু বেশি ঝুঁকে আছে।'

দীপ্তেন্দু সলজ্জ হেসে জবাব দিল,—'আমার ওই রিপোর্টিঙটা দেখছি কারোরই পছন্দ হয় নি, এমন কি কাগজের সম্পাদক রতিকান্ত বসু তো প্রথমে ওটা ছাপতেই চান নি। তারপর অবশ্য কী মনে হতে প্রেসে পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে ডেকে

বললেন, আপনার পর্যালোচনা যদি যা ঘটবে তার সঙ্গে মিলে যায় তাহলেই ভালো আর না মিললে লোক আপনাকে সাংবাদিক হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেই ধরে নেবে।'

সন্দীপ বলল,—'এটা লেখার আগে আপনি খবর নেন নি যে বিনয়দা অর্থাৎ বিনয় চৌধুরী এর আগে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে খোদ মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাবের বিরুদ্ধে বেশ ভালো ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। তারপর ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ডাঃ শশীভূষণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরে যান।

দীপ্তেন্দু বলল,—'সবই জানি। আর আমি যা লিখেছি তাই যে নির্ভুল তাও বলি না। হয়তো আমার এই নির্বাচনী পর্যালোচনা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু বর্ধমানের নানা জায়গায় পায়ে হেঁটে কিংবা রিক্শায় চেপে ঘুরে বিভিন্ন শ্রেণীর ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে আমি যা বুঝেছি, নির্বাচনী প্রতিবেদনে তারই প্রতিফলন হয়েছে। 'সেটা ভ্রান্ত না সত্য আর কদিন বাদেই তা জানা যাবে।'

রঞ্জন বলল,—'আসলে কী জানো দীপ্তেন্দু? বর্ধমানে বিনয়দার এক সুদৃঢ় সংগঠন। এই সংগঠন তিল তিল করে আমাদের পার্টি গড়ে তুলেছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতা শুধু কঠিন নয়, অকল্পনীয়।'

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে দীপ্তেন্দু বলল, —'সন্দীপবাবু, আমার হাতে কিন্তু আজ সময় নেই।'

রঞ্জন শুধোল,—'কেন? রবিবারে তোমার কী কাজ?'

দীপ্তেন্দু জবাব দিল,—'আজ রাত্তিরের ট্রেন ধরে আমি বাঁকুড়া যাচ্ছি। সম্পাদক আমাকে রাঢ় বাংলার নির্বাচনী পর্যালোচনার ভার দিয়েছেন। বর্ধমান কেন্দ্র নিয়ে লেখাটা তারই প্রথম কিস্তি। এবার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর মেদিনীপুর কেন্দ্রের দিকে নজর দিচ্ছি।'

রঞ্জন শুধোল,—'তুমি মেদিনীপুরে যাবে নাকি?'

'অবশ্য। অন্তত একটা বেলা নিশ্চয় সেখানে থাকছি। মেদিনীপুর কেন্দ্রে মূল লড়াই প্রফেসর সামসুল বারীর বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট এবং পি. এস. পি. প্রার্থীর। তবে মেদিনীপুর আসনে গতবারের নির্বাচনেও কংগ্রেস প্রার্থী অঞ্জলি খান জিতেছিলেন।'

রঞ্জন বলল,—'কবে নাগাদ মেদিনীপুরে আসছ?'

'এখনই তা বলা শক্ত। তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যেয় কিংবা বুধবার সকালে তো নিশ্চয়। মেদিনীপুর কভার করেই কলকাতায় ফিরব।'

সন্দীপ বলল,—'এবার ইলেকশনে শুধু পশ্চিমবাংলায় ১৪০০ জন প্রার্থী মনোয়নপত্র দাখিল করেছেন। আর কলকাতায় ২৬টি আসনে ১১১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ যাবৎ মগরাহাট (পূর্ব) কেন্দ্র থেকে সংরক্ষিত আসনে

কংগ্রেস প্রার্থী অর্ধেন্দুশেখর নস্কর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন। তবে আমরা আসন সংখ্যা আরো বাড়াতে পারব বলেই বিশ্বাস রাখি।'

রঞ্জনের সঙ্গেই দীপ্তেন্দু কফিহাউস থেকে বেরিয়ে এলো। বেলা পড়ে এসেছে। মাঘের শেষ। ফাল্গুন শুরু হতে আর দু-তিন দিন দেরি। শীত প্রায় ফুরিয়ে এলো কলকাতায়। ফাল্গুন মানেই দখিনা বাতাস। রোদ একটু উষ্ণ লাগে। কিন্তু বাঁকুড়া কিংবা পুরুলিয়ায় এখনও বেশ ঠাণ্ডা। দীপ্তেন্দুর মনে আছে দুপুর বারোটায় সূর্যকে যেন একটা একশ পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাতির মতো মনে হ'ত।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। এদিকে-সেদিকে ইতস্তত ছাত্রছাত্রীদের জটলা। রেলিঙে পুরনো বই সাজানো।

দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল,—'তুমি উঠেছ কোথায়?'

রঞ্জন জবাব দিল,—'বউবাজারে, অক্রুর দত্ত লেনে। মেদিনীপুরের এক ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে। ভদ্রলোক অকৃতদার। পার্টির সিমপ্যাথাইজার। মার্টিন বার্নের অফিসে চাকরি করেন। মেদিনীপুর থেকে এসে অনেকেই ওঁর আস্তানায় দু-এক রাত্তির কাটিয়ে যায়।' এক মুহূর্ত থামল রঞ্জন। তারপর নিজেই বলল,—'ইচ্ছে করলে আমি অবশ্য প্রদোষকাকার আরপুলি লেনের বাড়িতেও উঠতে পারতাম।'

এতক্ষণ এই প্রসঙ্গে আসার জন্য দীপ্তেন্দু একটা সুযোগ খুঁজছিল। রঞ্জন আরপুলি লেনের বাড়ির কথা তুলতেই সে জিজ্ঞেস করল,—'প্রদোষকাকার সঙ্গে তোমার তাহলে যোগাযোগ আছে?'

'হ্যাঁ। যোগাযোগ থাকবে না কেন? আর প্রদোষকাকা তো এখন প্রায় অর্ধেকমাস কলকাতাতেই থাকেন।'

'কেমন করে? ওর কৃষক ফ্রন্টের কাজ তো কাকদ্বীপ, নামখানা, মথুরাপুর এইসব অঞ্চলে।'

রঞ্জন হেসে বলল,—'এখন তো সেই আগেকার দিন নেই যে একজন কমরেডকে গা-ঢাকা দিয়ে প্রায় লুকিয়ে রাতের অন্ধকারে তার বাড়িতে এসে উঠতে হবে। তাছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া এখন একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন রাজ্য অ্যাসেম্বলি এবং লোকসভাতেও তার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। প্রদোষকাকা সেই পার্টির একজন কার্ড-হোল্ডার, বলতে পার সর্বক্ষণের কর্মী। সুতরাং কলকাতাতেও তার অনেক ফাংশন আছে। সেই দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'জানো রঞ্জন, মাধুরীবৌদির কথা আমার এখনও মনে হয়। এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে তুমি তো আরপুলি লেনের বাড়িতে থাক নি। তোমার সঙ্গে মাধুরীবৌদির হয়তো আর তেমন যোগাযোগ ছিল না।'

'নাহ্। তার কারণ প্রদোষকাকার মতো একজন কমিটেড্ মানুষকে উনি ঠিক গ্রহণ করতে পারেন নি। সত্যি কথা বলতে রাজাকাকু চলে যাবার পর আরপুলি লেনের বাড়িতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম দীপ্তেন্দু। পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে

অ্যাডমিশন হলে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেসে গিয়ে আবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'জানো রঞ্জন, সেই সময়টা বড়ো কষ্টে কেটেছে মাধুরীবৌদির। প্রদোষকাকা সময় মতো টাকাকড়ি দিতে পারতেন না। রাজাকাকু, তারপরে তুমি দুজনেই ওই বাড়ি থেকে চলে গেলে। ফলে অবস্থাটা কী হয়েছিল বুঝতেই পার। একটা ঘটনা শুনলেই ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হবে। একদিন সন্ধ্যের মুখে আরপুলি লেনের বাড়িতে গিয়ে জানলাম সকাল থেকে রান্নাবান্নার পাট আর হয় নি। টিনে এক বাটির মতো মুড়ি ছিল। সামান্য গুড় দিয়ে সেই কটা মুড়ি আর এক গ্লাস জল খেয়ে সমস্ত দিন কাটিয়েছেন মাধুরীবৌদি। রাত্তিরে আমি যেচে খাওয়ার কথা বলতেই উনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তারপর বাজারে গিয়ে তরিতরকারি এনে দিতে তবেই বৌদি রান্না চাপালেন।'

রঞ্জন বলল,—'সবটা না হলেও আমি কিছু কিছু শুনেছি বৈকি। মাধুরীকাকীমার জন্য তুমি অনেক করেছ দীপ্তেন্দু। প্রায়ই আরপুলি লেনের বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজ নিয়েছ। সন্ধ্যেবেলা গাঁটের পয়সা খরচ করে বাজার-হাটও করে দিতে। তারপর টিউবুলার প্রেগন্যান্সীর যন্ত্রণা শুরু হতে তুমিই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলে। শেষে অপারেশান ছাড়া যখন গত্যন্তর ছিল না তখন রোগিণীকে বাঁচাতে তোমার শরীর থেকে রক্ত দিয়ে সাহায্য করেছিলে।'

'এতসব কথা তুমি শুনলে কার কাছে?'

'কেন? প্রদোষকাকাই একদিন গল্প করেছিলেন।' রঞ্জন তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, —'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব দীপ্তেন্দু? তুমি সত্যি জবাব দেবে?'

'কেন দেব না? তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করতে পার।'

রঞ্জন বলল,—'আমার মনে হয় মাধুরীকাকীমাকে তুমি ভালবাসতে।'

রঞ্জনের মন্তব্য শুনে দীপ্তেন্দু চমকে উঠল। ধরা-পড়া অপরাধীর মতো অস্বীকারের ভঙ্গিতে জানাল,—'না-না। এ তুমি কী বলছ।'

'ঠিকই বলছি। তুমি হয়তো একটা যুক্তি খাড়া করে জানাবে যে মাধুরীকাকীমা তোমার চেয়ে বয়সে বড়ো। সেটা হয়তো সত্যি। উনি তোমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো। কিন্তু দীপ্তেন্দু, ভালবাসা কি সব সময় বয়সের গণ্ডী মানে? শুধু আমি কেন, অনেকের ধারণা, মাধুরীকাকীমার সঙ্গে তোমার একটা প্রেম-টেম হয়েছিল। আর তিনিও যে তোমাকে খুব পছন্দ করতেন তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। সন্দীপ যখন তোমাকে ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট করল তখন উনি প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। পড়াশুনো শেষ হবার আগে তুমি ছাত্র-রাজনীতিতে জড়িয়ে পড় এটা উনি কোনোদিন চান নি। কতজনকে বলেছেন, ছেলেটা কত কষ্ট করে

রাত জেগে প্রুফ দেখে ওর পাড়ার খরচ চালায় আর ওকেই কি না ছাত্র-রাজনীতিতে টেনে এনে ওর পড়াশুনার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে।'

দীপ্তেন্দু চুপ করে রইল। একটি কথারও জবাব দিল না।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল,—'রাত্তিরে তোমার ট্রেন কটায়?'

'রাত নটায়।' দীপ্তেন্দু ছোট্ট জবাব দিল। তারপর বলল,—' তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব রঞ্জন?'

'হ্যাঁ বল।' রঞ্জন সায় দিল।

'মাধুরীবৌদির সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা নিয়ে প্রদোষকাকা কি তোমাকে কিছু বলেছেন?'

'ধুর। উনি কেন এসব বলতে যাবেন?' রঞ্জন তার মুখের দিকে তাকাল। বলল,—'কথাটা অনেকদিনই আমার মনে হয়েছে। আজ তোমাকে দেখে হঠাৎ বলেই ফেললাম।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আচ্ছা, রাজাকাকু এখন কোথায় আছেন জানো?'

'কেন জানব না? উনি এয়ার-লাইন্সের সেই পুরানো চাকরিতেই বহাল আছেন। তবে কিছু দিন হ'ল বিয়ে করেছেন। থাকেন বালীগঞ্জ প্লেসে।'

'বিয়ে করেছেন? তাই নাকি? তা কার সঙ্গে বিয়ে হ'ল?

'তুমি চিনবে না। ওর নাম গীতিকা। গ্রুপ থিয়েটারের মেয়ে। রাজাকাকুর সঙ্গে মেলামেশা ছিল। দুজনকে আমি বহুবার গড়িয়াহাটার মোড়ে কিংবা রেস্তোরাঁয় ঢুকতে দেখেছি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'ভদ্রমহিলার নামটা আমি জানি। মাধুরীবৌদির মুখে যেন শুনেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে মেয়েটাকে উনি একদম সহ্য করতে পারতেন না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ?' রঞ্জন সায় দিল। ফের কেমন অদ্ভূত হেসে মন্তব্য করল,—'মাধুরীকাকীমা মারা গিয়ে বোধহয় এক হিসেবে ভালো হয়েছে দীপ্তেন্দু।'

'এ কথা বলছ কেন?'

'কারণ, আমি জানি, রাজাকাকু গীতিকাকে বিয়ে করছেন জানলে উনি কিছুতেই সেটা সইতে পারতেন না। শেষপর্যন্ত হয়তো বা একটা কেলেঙ্কারি হত।'

দীপ্তেন্দু কোনো জবাব দিল না। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে সে তাড়াতাড়ি বলল,—'আমি তাহলে যাই রঞ্জন। সুযোগ হলে নিশ্চয় মেদিনীপুরে তোমার সঙ্গে দেখা করব। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কলকাতায় এলে তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

বিবেকানন্দ রোড ধরে দীপ্তেন্দু পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের মেসবাড়ির দিকে হাঁটছিল। যেতে যেতে মাধুরীবৌদির সুন্দর মুখখানা তার বারবার মনে পড়তে লাগল। আচ্ছা, রঞ্জন হঠাৎ তাকে এই প্রশ্নটা করল কেন? সে কি তাহলে মাধুরীবৌদিকে সত্যি

ভালবেসেছিল? নইলে জবাব দিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা-পড়া অপরাধীর মতো তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠবে কেন? নিজের হৃদয় তন্নতন্ন করে খুঁজে দীপ্তেন্দুর মনে হ'ল, রঞ্জন যা বলেছে তা মিথ্যে নয়। ষোল আনা সত্যি। মাধুরীবৌদিকে সে ভালবাসত। মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে দাঁড়িয়ে ভোরবেলা বৌদির মৃত্যুসংবাদ শুনে সে শোকে মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত দিন নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মাধুরীবৌদির অসুখের কথা আলোচনা করে শেষবেলায় তাকে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। পাড়ার মেয়েরা একটা পুরনো বেনারসী শাড়ি বৌদিকে পরিয়ে দিয়েছিল। চুলে, সিঁথিতে সিঁদুর। পায়ে আলতা। চিতার লকলকে অগ্নিশিখায় মাধুরীবৌদির ওই দামী শাড়িটাই আগুনের আঁচে প্রথম ঝলসে উঠল। তারপর অমন সোনার প্রতিমার মতো রঙ, বড়ো বড়ো চোখ, এক ঢাল কালো চুল,—লেলিহান বহ্নিশিখা সব গ্রাস করল। শ্মশানঘাট থেকে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরের দরজায় খিল দিয়ে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল দীপ্তেন্দু। তারপর ক্লান্ত শরীরে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। ভাগ্যিস তার রুম-মেট সেদিন মেসে ছিল না। নইলে ছেলেমানুষের মতো ওই বুক-ফাটা কান্না শুনলে সে বোধহয় তাজ্জব হয়ে যেত। রঞ্জন ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। মাধুরীবৌদিকে ভালবাসত দীপ্তেন্দু। এক দেহাতীত প্রেমের নিগড়ে তারা দুজনেই বাঁধা পড়েছিল।

পাথুরিয়াঘাটার মেস থেকে যখন সে স্টেশনের উদ্দেশে বেরোল তখন ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে। নটায় ট্রেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে মিনিট কুড়ি তো লাগবেই।

তারপর বাঁকুড়ার জন্য কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটা, প্ল্যাটফর্মে ট্রেন এসে দাঁড়ালে গাড়িতে ওঠা, পরপর কত কাজই তো রয়েছে।

কপাল ভালো। সে স্টপে এসে দাঁড়াবার মিনিট কয়েক বাদেই একটা হাওড়াগামী বাস এসে থামল। রবিবার, তাই গাড়িতে ভিড় কম। দীপ্তেন্দু দেরি না করে পাদানিতে পা রেখে গাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

নটা বাজতেই ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ল। ছুটির দিন বলে বগীটা মোটামুটি ফাঁকা। এ গাড়িতে রিজার্ভেশান করার বালাই নেই। দীপ্তেন্দু একটা খালি বাঙ্কে উঠে চাদর পেতে শোবার আয়োজন করল। শেষ রাত্তিরে ট্রেন বাঁকুড়ায় পৌঁছবে। বিষ্ণুপুর স্টেশন এলেই তাকে উঠে পড়তে হবে। আশার কথা এই যে গাড়ি অন্তত পনের মিনিট দাঁড়ায়। ইঞ্জিন জল নেয়। তবু সাবধানের মার নেই। ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম যদি গাঢ় হয়ে ওঠে তাহলে বাঁকুড়া স্টেশন ছাড়িয়ে ইঞ্জিন কতদূর চলে যাবে গাড়ির বাঙ্কে শুয়ে সে তা টেরও পাবে না।

আজ দিনভর বাঁকুড়াতে তার ঠাসা প্রোগ্রাম। সকাল থেকে বেলা দুটো অব্দি নানা জায়গায় ঘুরে নির্বাচনী পর্যলোচনার মালমশলা তাকে সংগ্রহ করতে হবে।

তারপর শেষ রাত্তিরের এই ট্রেন ধরেই সে পুরুলিয়া রওনা হতে পারবে।

সকাল থেকে দীপ্তেন্দু গোটা বাঁকুড়া শহরটা প্রায় চষে ফেলল। ওদিকে স্কুলডাঙা থেকে এদিকে লালবাজার। তারপর ফিডার রোড, আড়াডাঙা, শহরের মধ্যমণি নেতাজী সুভাষ রোড—সর্বত্রই সে এক ধরনের সমীক্ষা চালাল। ওরই মধ্যে সময় করে সে বাঁকুড়া আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, —এমন মূল তিনজন প্রার্থীর সঙ্গেও দেখা করল। কংগ্রেসের ডাঃ অনাথবন্ধু রায়, কম্যুনিস্ট প্রার্থী ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য এবং হিন্দু মহাসভার প্রার্থী রাখহরি চট্টোপাধ্যায়। সমীক্ষা শেষ করেই সে বুঝতে পারছিল এই কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। কংগ্রেস অথবা কম্যুনিস্ট প্রার্থীর মধ্যে যে কোনো একজনের জেতার সম্ভাবনা বেশি। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা এবং জনসঙ্ঘ মিলে বারোটি আসন দখল করেছিল। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে বিধানসভায় প্রতিনিধিত্বে এই দুই দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অনেকটা সে কারণেই বাঁকুড়া কেন্দ্র থেকে রাখহরি চট্টোপাধ্যায়ের জেতার আশা কম, নেই বললেও চলে।

কাজ সেরে জেলা স্কুলের কাছে দাঁড়িয়ে সে খ্রীশ্চান কলেজের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তার জীবনের একটা অধ্যায় তো এখানেই কেটেছে। ওই রোনাল্ডসে হোস্টেলের দোতলার একটা ঘরে প্রায় বছর দেড় সে কাটিয়ে গেছে। রাস্তার একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে পুরানো দিনগুলির স্মৃতিচারণা করছিল। তার কলেজের পুরানো বন্ধুর দল, অধ্যাপকদের মুখগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। হঠাৎ পেছন থেকে কে তার কাঁধে হাত রাখতেই সে চমকে উঠল। মাথা ঘোরাতেই সে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে দেখল, তাকে লক্ষ্য করে অখিল মিটিমিটি হাসছে।

দীপ্তেন্দু খুব অবাক হয়ে বলল,—'অখিল, তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি। কেন বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

'ধুর! তা কেন হবে না?' সে একগাল হেসে শুধোল—'তারপর, তোমার খবর বল।'

'খবর নতুন কিছু নেই। তিলুড়ি স্কুলে মাস্টারি করছি। তা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন দীপ্তেন্দু? পাঁচালে যাবার বাসের জন্য অপেক্ষা করছ?'

'না-না,' দীপ্তেন্দু সজোরে মাথা নাড়ল। বলল, —'পাঁচালে যাবার মতো হাতে সময় কই? আমাকে আজ শেষ রাত্তিরের ট্রেনেই পুরুলিয়া যেতে হবে।'

'পুরুলিয়া? সেখানে কেন যাবে?'

দীপ্তেন্দু সব খুলে বলল,—এখন সে বঙ্গভূমি কাগজে সাংবাদিকতার কাজ নিয়েছে। পত্রিকার সম্পাদক তাকে রাঢ় বাংলার নির্বাচনী পর্যালোচনার কাজ সেরে কয়েকটি প্রতিবেদন লিখতে বলেছেন। আপাতত বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর তার পরিক্রমাসূচীতে রয়েছে। বর্ধমান কেন্দ্র নিয়ে লেখা নির্বাচনী পর্যালোচনাটি ইতিমধ্যে কাগজে বেরিয়েছে।

'তাই নাকি? তুমি তাহলে একজন জার্নালিস্ট।' তারপর কী মনে হতে সে বলল,—'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বর্ধমান কেন্দ্রের নির্বাচনী পর্যালোচনা করে বঙ্গভূমি কাগজে একটি প্রতিবেদন যেন বেরিয়েছিল। হ্যাঁ, সেটা আমার চোখে পড়েছে। আরে, তখন কী ছাই জানি ওটা তোমার লেখা।'

দীপ্তেন্দু জানাল,—'সেজন্যই তো বলছি, হাতে সময় নেই। এবার আর পাঁচাল যাওয়া হবে না।'

অখিল তার নেতিবাচক জবাবটিকে প্রায় উড়িয়ে দিয়ে বলল,—'তাই কখনও হয় নাকি? এত কাছে এসে দেশের মাটিতে একবার পা দেবে না।'

দীপ্তেন্দু তবু বলল,—'কিন্তু শেষ রাত্তিরের ট্রেন ধরে আমাকে যে কাল সকালেই পুরুলিয়া পৌঁছাতে হবে। সেখানে কাজ সেরে রাত্তিরেই আবার মেদিনীপুর।'

'শেষ রাত্তিরে না হোক কাল সকালেই তুমি বাস ধরে বেলা দশটা নাগাদ পুরুলিয়ায় পৌঁছে যাবে।'

'কিন্তু পাঁচাল থেকে আমি বাঁকুড়ায় আসব কেমন করে? বাইশ মাইল রাস্তা। মাঝখানে আবার ঘোর জঙ্গল।'

অখিল বলল,—'ভোর পাঁচটায় বাস ছাড়ে পাঁচাল থেকে। সাড়ে ছটার মধ্যে বাঁকুড়ায় ঢুকবে। আর পুরুলিয়া যাবার লাল বাস ঠিক সাতটায় পাবে। সেটা ধরলেই বেলা দশটার মধ্যে নির্ঘাত পুরুলিয়া পৌঁছে যাবে।'

প্রস্তাবটা দীপ্তেন্দুর মনঃপূত হ'ল। কতকাল সে পাঁচালে যায় নি। মা-বাবাকে দেখে নি। মধ্যপ্রদেশে থাকতে একটা চিঠি লিখেছিল বাড়িতে। কিন্তু সে চিঠির আর উত্তর পায় নি। অবশ্য পাওয়ার কথাও ছিল না। কারণ সেই সময় দীপ্তেন্দু তার চিঠিতে স্থায়ী ঠিকানার উল্লেখ করতেও পারে নি। মধ্যপ্রদেশের এখানে-সেখানে কোথাও সাতদিন, কোথাও বা একপক্ষ ডেরা ছিল। শেষপর্যন্ত প্রায় তিন বছরের বসবাস গুটিয়ে একদিন তল্পিতল্পা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে নামল।

অখিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর কেমন যেন একটা নস্টালজিয়া তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল। দুপুবে রোদে পিঠ দিয়ে তারা চার-পাঁচজন মিলে গল্প করত কলেজের মাঠে বসে। দিগন্তে শুশুনিয়া পাহাড়টা ঠিক যেন একটা ছোট হাতির মতো দেখাত। কদাচিৎ কলেজের কোনো ছাত্রী কিছুটা দূরে পায়ে-চলা পথ দিয়ে হেঁটে গেলে তারা আড়চোখে বারবার সেদিকে তাকাত। কিন্তু তাই বলে কোনো চটুল গানের দু-কলি গাওয়া কিংবা শীস দিয়ে সেই ছাত্রীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো ধৃষ্টতা তাদের কারো ছিল না।

বেলা একটায় বাস ছাড়ল। তার আগেই অখিল তাকে সঙ্গে করে মাচানতলার মোড়ের একটা হোটেল থেকে খাইয়ে এনেছিল। সাধারণ আহার। ভাত-ডাল-মাছ আর একটা তরকারি। সাকুল্যে দশ আনা। দীপ্তেন্দু পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে কাউন্টারের লোকটিকে দিতে গেলে অখিল হাত বাড়িয়ে টাকাটা

তুলে নিয়ে দীপ্তেন্দুর পকেটে রেখে দিল। বলল,—'আজ আর তোমাকে পয়সা দিতে দেব না। আমিই পেমেন্ট করব।'

'কেন?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

অখিল বলল,—'কালই ডি. এ.র টাকা হাতে পেয়েছি। জানো তো, স্কুলের চাকরিতে গর্ভমেন্ট ডি.এ. টা আমরা ছ-মাস অন্তর পাই। টাকাটা হাতে পেলাম বলেই তো সোম-মঙ্গল দুটো দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতে পারছি।'

দীপ্তেন্দু আর আপত্তি করল না। বলল,—'বেশ, বেশ। কখনও কলকাতায় গেলে কিন্তু পাথুরিয়াঘাটায় আমার মেসে গিয়ে উঠবে। কেউ না থাকলে মানে বাড়ি-টাড়ি চলে গেলে একটা খালি সীটই তোমাকে দিতে পারব। না হলেও একটা ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।'

অখিল হেসে বলল, 'তার জন্য চিন্তা ক'র না। কলকাতায় যাবার তেমন একটা প্রয়োজন হয় কই? বছর দুই আগে একবার গিয়েছিলাম স্কুলের কাজে। তা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে কাজ সেরে রাত্তিরের ট্রেন ধরেই বাঁকুড়া চলে এলাম। কলকাতায় থাকার দরকারই হয়নি।'

বাস কখন বাঁকুড়া শহরটা পিছনে ফেলে বেলেতোড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে, দুজনের কেউ সেটা খেয়াল করেনি। ধান কাটার পর ন্যাড়া মাঠ দুপাশে। শীতের বেলা এরই মধ্যে মর মর। বাস থেকে শুশুনিয়া পাহাড়টাকে স্পষ্ট দেখা গেল। নীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে পাহাড়টা এক বিচিত্র চিত্রপটের সৃষ্টি করেছে।

অখিল শুধোল,—'কলেজের দিনগুলো তোমার মনে পড়ে?'

'কেন পড়বে না? তবে এখন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়।' তারপর এক মুহূর্ত চিন্তা করে সে পাল্টা প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা তোমার হরিদাসকে মনে আছে?'

'কোন হরিদাস বল তো?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আরে ওই যে, রোনাল্ডসে হস্টেলে আমার সঙ্গে ছিল। কলেজের সোশ্যালে একবার সাজাহান নাটকের সংলাপ বলে অজস্র হাততালি আর প্রশংসা কুড়িয়েছে। ডায়াসে উঠে বাংলার অধ্যাপক সুরেশ্বর দত্ত ওর পিঠ চাপড়ে বাহবা দিলেন।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। ওর নাম হরিদাস পাল। বর্ধমানে বাড়ি।'

দীপ্তেন্দু তারিফ করার ভঙ্গিতে জানাল,—'এখন আর ও হরিদাস পাল নয়।'

'বল কী? তাহলে কী নাম ওর?'

'তমাল কুমার। রুপোলী পর্দার উদীয়মান নায়ক। আর কয়েকদিনের মধ্যে ওর নতুন ছবি 'সমুদ্র ও তরঙ্গ' মুক্তি পেতে চলেছে।'

অখিল স্তম্ভিত হবার ভঙ্গিতে শুধোল, 'তাই নাকি? আমাদের হরিদাস তাহলে এখন ফিল্ম-স্টার।'

'শুধু ফিল্ম-স্টার বললে একটু কম বলা হ'ল।' দীপ্তেন্দু মুচকি হাসল।

'কম কেন?' অখিল ভুরু তুলে তাকাল।

দীপ্তেন্দু বলল, 'সমুদ্র এবং তরঙ্গ ছবির পরিচালক কে জানো? স্বয়ং রামানন্দ রায়। তমাল কুমার সেই ছবির নায়ক।'

অখিল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এত সব জানলে কেমন করে?'

দীপ্তেন্দু হাসতে হাসতে বলল,—'খবরের কাগজের অফিসে চাকরি। সেই সুবাদে ছবির প্রেস শোতে যেতে হয়েছিল। তার আগেও অবশ্য আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। কিন্তু ও যে একজন নামী স্টার হতে চলেছে সেটা বুঝতে পারিনি।'

অখিল বলল, 'হরিদাসের Luck ভালো। তাই এতদূর এগিয়ে যেতে পারল। আর আমরা পিছনে পড়ে রইলাম।'

দীপ্তেন্দু মৃদু আপত্তি জানাল। বলল,—'শুধু Luck বলছ কেন? হরিদাসের প্রতিভা ছিল। Genius বলেই ফিল্ম লাইনে এমন চটপট উন্নতি করতে পারল।'

বেলেতোড় ছাড়িয়ে গাড়ি ছান্দারে এসে থামল। এখান থেকে আর পাকা রাস্তা নয়। মোরাম ছড়ানো লাল মাটির পথ। বাসে যেতে যেতে দীপ্তেন্দু দেখছিল। শিমুল গাছের ডালে এরই মধ্যে অজস্র কুঁড়ি এসেছে। ফাল্গুনে রাঙা শিমুল ফুলে গোটা পথটা কী সুন্দর দেখাবে। ঘাটের বাঁধ পেরিয়ে জঙ্গল। বর্ষায় বন গাছগাছালিতে ঘন হয়ে ওঠে। বিট্ অফিসার আর ফরেস্ট গার্ডের নজর এড়িয়ে কিংবা জ্ঞাতসারেই কাঠ পাচার হয়। সেজন্যই হয়তো শীতে জঙ্গলটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগল।

দীপ্তেন্দু বাড়িতে পা দিতেই তার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। তার বাবা বললেন,—'কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ কোথা থেকে এলে?'

অখিল তার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল। সে পিছন থেকে বলল—'বাঁকুড়া থেকে আমিই ওকে একরকম জোর করে ধরে এনেছি মেসোমশায়। দীপ্তেন্দু এখন বঙ্গভূমি কাগজের জার্নালিস্ট। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কভার করতে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর মেদিনীপুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ছেলের এই কর্মশালার কথা শুনে তার বাবা যে খুব খুশি হলেন তা মনে হ'ল না। একটু চিন্তা করে তিনি বললেন,—'জার্নালিস্ট মানে কাগজের রিপোর্টার? তাহলে প্রফেসরী না করে তুমি কাগজের অফিসের চাকরিই বেছে নিলে।'

দীপ্তেন্দু তার বাবার কথার কোনো জবাব না দিয়ে মাকে উদ্দেশ করে বলল,—'আমাকে কিন্তু কাল ভোরের বাসেই যেতে হবে মা।'

'কালই?' তার মা মৃদু আপত্তি জানালেন, বললেন,—'অন্তত একটা দিন থেকে যা।'

'এবার আর তা হবার উপায় নেই। কাল আর পরশু দুটো দিনে আমাকে পুরুলিয়া আর মেদিনীপুর কভার করতেই হবে।'

অখিল বলল,—'চিন্তা নেই দীপ্তেন্দু। রাত চারটেয় আমি ঠিক তোমাকে ডেকে তুলব। তারপর নিজে গিয়ে বাসে উঠিয়ে দেব।'

তার বাবা বললেন,—'রাত চারটে বাজলে আমার ঘুম এমনিতেই ভেঙে যায়। তুমি মিছিমিছি আবার এই ঠাণ্ডায় কেন উঠে আসবে?'

অখিল বলল,—'ফাল্গুন মাস পড়তে দেরি নেই। এখন আর তেমন ঠাণ্ডা কোথায়? ভোরবেলা উঠে আসতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

রাত্তিরে রান্নাঘরে ভাতের থালা সাজিয়ে মা তাকে খেতে দিলেন। রান্নাঘর বলতে একটা চালা ঘর। খড়ের ফাঁক দিয়ে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। তাদের বাড়ির উঠোনের এক কোণে একটা সজনে গাছে অজস্র সাদা ফুল। দু-চারটে ডালে সজনে ডাঁটাও হয়েছে। তার মা শুধোলেন,—'তুই তো সেই পাথুরিয়াঘাটার মেসেই আছিস?'

'হ্যাঁ' দীপ্তেন্দু ছোট্ট জবাব দিল।

তার মা বললেন,—'হ্যাঁরে, সমস্ত জীবনটা তুই কি এমনি বাউণ্ডুলে হয়েই কাটাবি? এবার বিয়ে থা কর। আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে। তোকে সংসারী করে যাওয়া।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'সে পরে হবে মা। আর কিছুদিন যাক না।'

পরদিন ভোরে অখিল এসে ডাকাডাকি শুরু করল। তার আগেই অবশ্য দীপ্তেন্দু তৈরি। প্রণাম করতেই বাবা বললেন,—'মাসে অন্তত একটা করে চিঠি দিও। অবশ্য মা-বাবার খোঁজ-খবর নেওয়া যদি তোমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'

তার মা এগিয়ে এসে চিবুকে হাত রেখে চুমু খেয়ে বললেন,—'চিঠি দিস বাবা। অনেক বয়স হ'ল। কবে মরে যাব তার ঠিক নেই। তাই বলছি ছুটিছাটা পেলে একবার পাঁচালে আসবি।'

দীপ্তেন্দুর গায়ে বুলুর দেওয়া সেই সোনালি রঙের স্লিপ ওভার। আর গলায় একটা কমফর্টার জড়ানো। সোয়েটারটায় দীপ্তেন্দুকে খুব মানিয়েছে।

অখিল জিজ্ঞেস করল,—'এই সোয়েটারটা কিনলে কোথায়? কলকাতায়? ভারি সুন্দর কিন্তু—'

'উঁহু।' দীপ্তেন্দু মুচকি হাসল।

'তবে? বাইরের জিনিস নাকি?'

দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল। 'তাও জানি না।'

'তাহলে এটা পেলে কোথায়?'

দীপ্তেন্দু হেসে জানাল,—'একজন দিয়েছে।'

অখিল বাঁ চোখটা ঈষৎ টিপে রহস্য করে বলল,—'দিয়েছে মানে? Presentation?'

'তা বলতে পার।' দীপ্তেন্দু সংক্ষিপ্ত জবাব দিল। শেষে বলল,—'কলকাতায় এসো, তখন সব গল্প করব।'

বাস ছাড়তেই অখিল হাত নাড়ছিল। ঘর্ঘর শব্দ করে বাস প্রান্তর ছাড়িয়ে

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস। কমফর্টারটায় ভালো করে কান আর গলা ঢেকে দীপ্তেন্দু জড়সড় হয়ে বসল। দুপাশে জঙ্গল। কখন বন শুরু হ'ল সে খেয়াল করেনি। সাড়ে ছটায় গাড়ি বাঁকুড়ায় পৌঁছবার কথা। সাতটার লাল বাসটা ধরতে পারলে পুরুলিয়া পৌঁছতে তিন ঘন্টাও লাগবে না।

পুরুলিয়া কেন্দ্রের নির্বাচনটা মূলত কংগ্রেস আর লোকসেবক সঙ্ঘের মধ্যে। কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ তারাপদ রায় আর লোকসেবক সঙ্ঘের বিভূতি দাশগুপ্ত। হোটেলে দুটি ভাত খেয়ে দীপ্তেন্দু বেরিয়ে পড়ল শহর পরিক্রমায়। সাহেব বাঁধ, রাঁচী রোড থেকে শুরু করে স্টেশন রোড পর্যন্ত ঘুরে সে ভোটযুদ্ধে জনগণ কার পক্ষে সেটা জানার জন্য একটা ছোটখাটো সমীক্ষা চালাল। শহরের নানা গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ—সর্বত্রই তার ফাইল হাতে নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল, অনেকেই সরাসরি উত্তর দেওয়াটা এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু কথাবার্তা বলার ফাঁকে দীপ্তেন্দু তার মনোভাবটা বুঝতে চেষ্টা করল। বিকেল নাগাদ দীপ্তেন্দুর কাজ শেষ হতেই সে একটা রিকশতে উঠে সোজা স্টেশনে এসে পৌঁছল।

সন্ধ্যে সাতটার ট্রেন দু-ঘন্টা লেট। আদ্রা-চক্রধরপুর-টাটা প্যাসেঞ্জার। চাণ্ডিল হয়ে পুরুলিয়া এসে পৌঁছয়। তারপর সমস্ত রাত্তির ছুটতে ছুটতে এক বেদম মানুষের মতো হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে।

গাড়ি আজ দু-ঘন্টা লেট। তাই মেদিনীপুর পৌঁছতেই হয়তো শেষ রাত্তির হবে। দীপ্তেন্দুর তাতে কোনো সমস্যা নেই। বুধবার সকালে মেদিনীপুরে একটা ছোটখাটো ভোট-সমীক্ষা চালিয়ে সন্ধ্যে নাগাদ কলকাতা ফিরে যেতে পারলেই চলবে। শুক্রবার নির্বাচনী পর্যালোচনার এই কিস্তিটা সম্পাদকের হাতে তুলে দিতে পারলে রবিবারের কাগজে হয়তো বেরিয়ে যাবে।

ঠিক তিনটেয় গাড়ি মেদিনীপুর স্টেশনে দাঁড়াল। বগী থেকে নামার আগে দীপ্তেন্দু একটা হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙে শরীরটা চাঙা করে নিতে চেষ্টা করল। মাঘের শেষ। অত রাত্তিরে প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা। এই ঠাণ্ডায় কে আর স্টেশনের উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকবে? তারই মতো দু-চারজন যাত্রী গাড়ি থেকে নেমে কোনোদিকে না তাকিয়ে স্টেশনের বাইরে চলে গেল।

দীপ্তেন্দুও তাই ভাবছিল। স্টেশনের বাইরে গিয়ে সেও একটা হোটেল খুঁজে বাকি রাতটুকু সেখানেই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এই মফঃস্বলে শীতের ঠাণ্ডা রাত্রে কে আর তার জন্য হোটেলের দরজা খুলে জেগে বসে আছে? তার চেয়ে বরং ওয়েটিং রুমে আরো ঘন্টা দুই কাটিয়ে তারপর হোটেলের খোঁজে বেরোনই ভালো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দীপ্তেন্দুকে আর হোটেলে আশ্রয়ের জন্য যেতে হল না। স্টেশনের ওয়েটিং রুমের এক বেয়ারা তাকে রিটায়ারিং রুমের একটা ঘর খুলে দিল। ইচ্ছে করলে দীপ্তেন্দু এখানে চব্বিশ ঘন্টাও থাকতে পারে। চার্জ হোটেলের

মতই। কিন্তু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি।

রাত জেগে ট্রেনে আসার ফলে শরীরটা বেশ ক্লান্ত লাগছিল। তার কাঁধের ঝোলাটা একটা চেয়ারে ছুড়ে দিয়ে দীপ্তেন্দু টান-টান বিছানায় শুয়ে পড়ল। পাঁচ মিনিট না যেতেই চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে এলো। যখন নিদ্রা ভাঙল, তখন বাইরে দিনের আলো। ঘড়িতে সাতটা বাজে। এক লাফে বিছানা থেকে নেমেই দীপ্তেন্দু প্ল্যাটফর্মে গিয়ে এক কাপ গরম চা খেয়ে এলো। এবার বেরোবার জন্য তাকে তৈরি হতে হবে। বাথরুমে ঢুকতেই তার মনটা প্রসন্ন হ'ল। ঝকঝকে তকতকে বাথরুম। কলে জল।

হোটেলে নিশ্চয় এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। আর সেটা সম্ভবও নয়। সকালের ঠাণ্ডায় গায়ে জল ঢালতেই প্রথমে শীত-শীত লাগছিল। পরে সেটা গা-সহা হয়ে গেল। আর তেমন কনকনে ঠাণ্ডা মনে হ'ল না। স্নান সেরে দীপ্তেন্দু জামা-কাপড় পরে বেরোবার জন্য তৈরি হল। রাত জেগে মেদিনীপুরে আসার ক্লান্তিটুকু এখন প্রায় দূর। রিটায়ারিং রুমের ঘরের দরজায় রেলের বেয়ারার দেওয়া একটা তালা ঝুলিয়ে সে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এলো। স্টেশনের কাছেই একটা রেস্তোরাঁ গোছের দোকানে ঢুকে দীপ্তেন্দু আরো এক কাপ চা এবং সেই সঙ্গে গোটা দুই সিঙাড়া এবং রসগোল্লা খেয়ে প্রাতরাশ সমাপ্ত করল।

মেদিনীপুর কেন্দ্রটি বেশ বড়। শহরটা অন্য শহরের তুলনায় একটু বেশি অগোছালো এবং অযত্নবর্ধিত আগাছার মতো চর্তুদিকে ছড়িয়ে গেছে। ওদিকে ছোটবাজার, বিবিগঞ্জ, অলিগঞ্জ তারপর স্টেশনের দিকে ফিরলে দু-পাশে বার্জ টাউনের বাড়িঘর।

এখানে মূলত ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট এবং পি. এস. পি. প্রার্থী। গত নির্বাচনে অবশ্য আসনটি কংগ্রেসের দখলে গিয়েছিল। এবারও হয়তো সে রকমই ফল হবে। তার কারণ কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক সামসুল বারী শহরে সুপরিচিত এবং জনপ্রিয়।

প্রায় পাঁচ-ছ ঘন্টা একটানা ঘুরে দীপ্তেন্দুর ক্লান্ত নাকাল হবার অবস্থা। বেলা দুটো বাজতেই কাজ গুটিয়ে সে স্টেশনের পথ ধরল। আসার সময় খোঁজ নিয়ে এসেছিল বেলা চারটেয় একটা লোকাল ট্রেন ছাড়ে। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে পৌছবে।

পাথুরিয়াঘাটায় ফিরে দীপ্তেন্দু বিছানায় ভেঙে পড়ল। তার রুম-মেট তিনকড়ি হালদার এক ঝলক ঘরসঙ্গীর শ্রান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে শুধোল,—'এই তিনদিন কোথায় ছিলেন মশায়? একেবারে ঝোড়ো কাক হয়ে ফিরেছেন।'

দীপ্তেন্দু চোখ না খুলেই জবাব দিল,—'বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর মেদিনীপুর ঘুরে এলাম। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন দলের কী অবস্থা সরেজমিনে তাই দেখতে

গিয়েছিলাম।'

'ওরে বাবা! তাহলে তো খুব পরিশ্রম গেছে আপনার। যান মশায় জামাকাপড় বদলে গা-হাত ধুয়ে চটপট খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে উঠে দেখবেন দিব্যি ফ্রেশ লাগছে।'

দীপ্তেন্দু পাশ ফিরে শুয়ে রইল। ঈষৎ ক্লান্ত, নির্জীব গলায় জবাব দিল,—'আপনি ফিরলেন কবে? শনিবার তো দেশে গিয়েছিলেন।'

তিনকড়ি জবাব দিল,—'সোমবার সকালে এসেই শুনলাম খবরের কাগজের কাজে আপনি কোথায় যেন গিয়েছেন।'

পরদিন অফিসে গিয়ে সে প্রথমেই রতিকান্ত বসুর সঙ্গে দেখা করল। বলল,—'আজ রাত্তিরেই লেখাটা শেষ করতে পারব আশা করছি। কালই আপনার হাতে দেব।'

সম্পাদক হেসে বললেন,—'তাহলে তো খুব ভালো হয়। চেষ্টা করব রবিবারেই যাতে ছাপতে পারি।' রতিকান্ত বসু এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন, শেষে বললেন,—'কলকাতায় ভোট পঁচিশ তারিখে অর্থাৎ এর পরের রবিবারে। অন্য সব জায়গায় তার আগে।' দীপ্তেন্দু বলল,—'সেজন্যই বোধহয় বাঁকুড়া পুরুলিয়া আর মেদিনীপুর তিন জায়গাতেই প্রচার যাকে বলে তুঙ্গে।'

'তাই নাকি?' রতিকান্ত বসু শুধোলেন,—'বাঁকুড়া কেন্দ্রের ফলাফল কার অনুকূলে যাবে মনে হয়?'

'বলা শক্ত,' দীপ্তেন্দু সোজাসুজি উত্তর দিল। বলল, —'খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অনাথবন্ধু রায় আর ডাঃ অবনী ভট্টাচার্যের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। যিনিই জিতুন ব্যবধানটা খুব কম হবে বলেই মনে হয়। আর রাখহরি চট্টোপাধ্যায় এখানে কোনো ফ্যাক্টরই নন। গত ১৯৫৭ সনের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

বেলা আড়াইটে নাগাদ অফিসের টেলিফোন অপারেটর তার খোঁজ করল। বলল,—'দীপ্তেন্দুবাবু আপনার একটা কল আছে। ইনি গতকালও আপনার খোঁজ করেছিলেন।

রিসিভার ধরে দীপ্তেন্দু সাড়া দিল,—'হ্যালো, কে বলছেন?'

সে হেসে জানাল,—'কে আবার? আমি,—আমি অগ্নিবীণা।' টেলিফোনের তারে তার সুমিষ্ট হাসির রেশ ভেসে এলো।

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'কী খবর বল? শুনলাম গতকালও নাকি ফোন করেছিলে?'

'হ্যাঁ। আপনি ফিরলেন কবে?'

'এই তো, গতকাল রাত্রে। একটু বেশি সময় লাগল। তার কারণ বাঁকুড়া থেকে

এক বেলার জন্য পাঁচাল গিয়েছিলাম।'

'ওমা! তাই নাকি! রাত্রে নিশ্চয় পাঁচালে ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আবার ভোরেব বাসেই বাঁকুড়া এলাম। সেখান থেকে পুরুলিয়া, তারপর মেদিনীপুর—।'

'আপনি তাহলে একটা হারিকেন ট্যুর সেরে ফিরলেন?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পার।'

'আজ বিকেলে কী কাজ আপনার?' অগ্নিবীণা যেন আব্দার করে শুধোল।

'কী আবার কাজ?' দীপ্তেন্দু জবাব দিল। বলল, —'কাগজের অফিসে কখন কী কাজ তা কি আগে থেকে জানা যায়?'

'আজ বিকেলে আসুন না ডাফ স্ট্রিটে।'

'ডাফ স্ট্রিটে?'

'হ্যাঁ। অসুবিধা কিসের? বাড়িতে আমি একলা আছি দীপ্তেন্দুদা। একটুও ভালো লাগছে না।'

'কেন? তোমার মেডিক্যাল কলেজে ডিউটি নেই?'

'ছিল। কিন্তু আমি ওটা কাটিয়ে এসেছি।' এক মুহূর্ত থেমে সে আবার বলল,—'জানেন তো, দাদু আজও ফেরেন নি।'

'দাদু গেছেন কোথায়?

'বা রে! আপনি জানেন না? মঙ্গলবার সকালেই তো দাদু রওনা হয়ে গেলেন। পরাশর দাদুর নির্বাচনী কেন্দ্রে উনি তিন জায়গায় বক্তৃতা করবেন।'

'তাহলে ফিরবেন কবে?'

'সম্ভবত রবিবার।'

'আর অবিনাশকাকা?'

'বাবা তো গতকালই ভুবনেশ্বরে গেলেন। অবশ্য আগামীকাল সকালেই ফিরবেন বলে গেছেন।'

'তাহলে?'

'আপনি বিকেলে আসুন না দীপ্তেন্দুদা, ছাদে বসে দুজনে গল্প করব।'

'উহুঁ। তাতে আমি রাজী নই।'

'তবে?'

'তোমাকে একটা গান শোনাতে হবে।'

'আমার গান এখন আর আপনার ভালো লাগবে না।'

'কেন বুলু?'

'আমার কি সেই আগের মতো গলা আছে?'

'যা আছে তাতেই চলবে।'

'বেশ। তাহলে বিকেলে আপনি আসছেন তো?

'বিকেলে বোধহয় হয়ে উঠবে না।'

'তবে?'

'সন্ধ্যের পরে।'

'আবার অন্য কাজে বেরিয়ে যাবেন না তো?'

'যাব না, যাব না, যাব না। হল?' দীপ্তেন্দুর গলার স্বর ভালবাসায় গাঢ় হয়ে উঠল।

॥ আট ॥

সন্ধ্যে ছটার পর দীপ্তেন্দু ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছাল। আসার সময় রতিকান্ত বসুর কাছ থেকে পারমিশন চেয়ে নিয়েছে। তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার। সে কারণে সন্ধ্যের আগেই অফিস থেকে ছুটি চায়।

রতিকান্ত বসু অবশ্য আপত্তি করেন নি। তিনদিন ধরে ছেলেটা যা পরিশ্রম করেছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর মেদিনীপুর তিনটে শহর একরকম চষে বেড়িয়েছে। এই ক'দিনেই কী রকম যেন শুকনো দেখাচ্ছে ওকে। এখন এক-আধদিন যদি এদিক-সেদিক এক-আধটু ঘুরে গল্পগাছা করে কাটাতে চায়, তাতে আপত্তি করা আদৌ সমীচীন হবে না।

বাড়িতে অগ্নিবীণা তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিকেলে গা ধুয়ে একটা হাল্কা আকাশী নীল রঙের শাড়ি পরেছে। গায়ে ম্যাচ-করা জামা, কপালে লাল টিপ। গালে মুখে হাল্কা প্রসাধন। শাড়ির ভাঁজে একটা মৃদু সৌরভ। দূরে থাকলেও যা নাকি নাকে এসে লাগে।

অগ্নিবীণা বলল,—'আগে আপনাকে চা দিতে বলি? তারপর জলখাবার খাবেন।'

'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?' দীপ্তেন্দু বাধা দিল, বলল,—'ধীরে সুস্থে হলেই চলবে।'

অগ্নিবীণা বলল,—'কখন মেসের রান্না খেয়ে অফিস গিয়েছিলেন বলুন তো? জলখাবার খেতে দেরি হলে চলবে কেন? খিদে পায়নি আপনার?'

দীপ্তেন্দু আর তর্কে গেল না। হেসে বলল,—'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।' তারপর ঈষৎ চাপা গলায় জানাল, —'গান শোনাবে প্রমিস করেছ কিন্তু। কথাটা মনে আছে তো?'

'শোনাব, শোনাব। আমি কোনো কথা ভুলিনি।' চোখ দুটি ঈষৎ বড়ো করে অগ্নিবীণা মুচকি হাসল। বলল,—'তবে সেটা গান না মেসিন-গান তা আপনিই বিচার করবেন।'

চা-জলখাবার পর্ব শেষ হতেই অগ্নিবীণা হারমোনিয়ামটা নিয়ে এলো, বলল,—

'কবে যে শেষ গান গেয়েছি আমার নিজেরই তা মনে নেই। এতদিন তো এই যন্ত্রটা শোবার ঘরে খাটের নীচে পড়েছিল। আপনি গান শুনবেন বলেই আজ দুপুরে এটা বের করে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে রেখেছি।'

গলাটা অবশ্যই এখন আর আগের মতো নেই। তবু গান শুনতে শুনতে দীপ্তেন্দুর মনে একটা নস্টালজিয়াব ভাব এসে গেল। এতদিন পরেও অগ্নিবীণা তাকে সেই পুরানো দিনের গান গেয়ে শোনাল। সেই যে স্বাধীনতা দিবসের বিকেলে পাঁচালের মিটিঙে সে যে গান গেয়েছিল, আজও সেই গানটাই গাইল। ...... সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে ....। আরো দু-একটা গানের পর সে গাইল,—

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী। ...

দীপ্তেন্দুর মনে পড়ল কতদিন আগে এক প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় অগ্নিবীণাদের গ্রামের বাড়িতে এক কিশোরীর কণ্ঠে এই গান শুনেই সে মোহাবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

স্মৃতির রেশ কাটতেই অগ্নিবীণাকে লক্ষ করে সে বলল,—'কতদিন আগে তোমার গলায় এই গান শুনেছিলাম বুলু। তা প্রায় পনের বছর হতে চলল।'

হারমোনিয়ামটা তুলে রেখে অগ্নিবীণা তাকে সঙ্গে করে ছাদে এসে দাঁড়াল। কলকাতা থেকে শীত প্রায় বিদায় নিয়েছে। এখন দিনটা ঈষৎ উষ্ণ। কিন্তু রাত হলেই বাতাসে কেমন যেন শিরশিরানি স্পর্শ। শেষ রাত্তিরে বেশ শীত-শীত লাগে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে ঠাণ্ডা বাড়ে।

তার দিকে তাকিয়ে অগ্নিবীণা বলল,—'পাতলা স্লিপ-ওভারটা নিয়ে এলে পারতেন। ফেরার সময় গায়ে দিয়ে যেতেন। বলা যায়না চোরা ঠাণ্ডা লেগে জ্বরজারি হতে পারে। মেডিক্যাল কলেজে এরকম কেস তো কত আসে।'

সে কথার জবাব না দিয়ে দীপ্তেন্দু তার দিকে সোজাসুজি তাকাল। বলল,—'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বুলু?'

অগ্নিবীণা একটুও চিন্তা না করে জবাব দিল,—'আপনি কী জিজ্ঞেস করবেন তা আমি জানি।'

'বারে! তুমি কেমন করে জানবে? থট-রিডিং শিখছ নাকি?'

অগ্নিবীণা বলল, —'এর জন্য থট্-রিডিং শেখা লাগে না মশায়।'

'তাহলে বল, তোমার কাছে কী জানতে চাইছি?'

'এ তো সহজ প্রশ্ন। আপনি জিজ্ঞেস করবেন জলপাইগুড়িতে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তাহলে কী দাঁড়াবে?'

দীপ্তেন্দু চুপ করে রইল।

অগ্নিবীণা বলল,—'আসলে এই নিয়ে দাদু খুব চিন্তিত। বোধহয় আপনার সঙ্গে

আলোচনাও করতে চেয়েছেন।'

দীপ্তেন্দু এ কথারও কোনো জবাব দিল না। শেষে বলল,—'যদি আলোচনা করতেও চান তাহলে সেটা কোনো দোষের নয়।'

অগ্নিবীণা হেসে জবাব দিল,—'বা রে! দোষের কেন হবে? বাড়ির মেয়ের বিয়েটা সুখের হয় নি, এ কথা জানলে কোন অভিভাবক না ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হবে?'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'তাহলে তোমার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের একটা ছেদ পড়ল বলো?'

'এখনও পড়ে নি।' অগ্নিবীণা মুচকি হাসল। বলল, —'তবে ছেদ পড়তে আর বেশি দেরিও নেই।'

'তার মানে?'

'মানে তো সোজা দীপ্তেন্দুদা।' অগ্নিবীণা ভুরু কুঁচকে জবাব দিল। বলল,—'সৌম্যকান্তি মানে আমার স্বামী দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উকিলের নোটিশ পাঠিয়েছিল। সে কথা আপনাকে আগেই জানিয়েছি। আমি সে চিঠির জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিনি। আমার উকিল পরামর্শ দিয়েছিলেন দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কোর্টে মামলা করলেও আদালত সেই মামলায় ডিক্রি জারি করবে না। ফলে আমাকে স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার নির্দেশ কোর্টের কাছ থেকে সে কোনোদিন পাবে না।'

'তাহলে? উকিলের ওই নোটিশ পাঠানোর কী অর্থ হয়?'

'অর্থ একটা আছে বৈকি। এরপর সে নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা রুজু করবে। তখন দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে-নোটিশটা সৌম্যকান্তির উকিল পাঠিয়েছিল সেটা আদালতেই পেশ হবে। স্ত্রী যখন তার স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপনে রাজী নয় তখন আদালত ডিভোর্সের ডিক্রি দিতে দ্বিধা করবে না।'

দীপ্তেন্দু এতক্ষণে নোটিশের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারল। সে ব্যাপারটা তলিয়ে চিন্তা করছিল। তারপর অগ্নিবীণার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,—'তোমার কি মনে হয় এরপর ওরা আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করবে?'

'সে কথা আবার বলতে হয় দীপ্তেন্দুদা?' অগ্নিবীণা এক মুহূর্ত চিন্তা করে জানাল,—'তবে আমাকে জব্দ করবার জন্যে একটা অন্য চালও দিতে পারে।'

'কী চাল বুলু?'

'আমার নামে একটা কলঙ্ক রটিয়ে দেবে। কলকাতায় গিয়ে ওসব পড়াশুনো করা একটা ধাপ্পা বৈ অন্য কিছু নয়, আসলে বিয়ের আগে আমার একজন পুরুষ-বন্ধু ছিল। তার টানেই আমি স্বামীর ঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছি।'

'তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব বুলু?'

'হ্যাঁ স্বচ্ছন্দে।'

দীপ্তেন্দু হঠাৎ কেমন স্থিরদৃষ্টিতে অগ্নিবীণার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,— 'আদালতে যদি তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করে তাহলে কি আমরা আবার বিয়ে করতে পারব?'

এমন প্রশ্নের জন্য অগ্নিবীণা বোধহয় তৈরি ছিল না, তার চোখের পাতা বৃষ্টি-ভেজা বেতসপত্রের মতো তিরতির করে কাঁপছিল। মুখখানা ঈষৎ করুণ, আঁখির কোণে দু-ফোঁটা জল টলটল করছে। দীপ্তেন্দুর মনে হ'ল, অগ্নিবীণা হয়তো পড়ে যেতেও পাবে। সে এগিযে গিয়ে সবল দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

অগ্নিবীণা ফিসফিস করে বলল,—'ছেড়ে দিন। এখানে কেউ দেখতে পাবে।'

কিন্তু দীপ্তেন্দু তার অনুনয়ে কর্ণপাত করল না। কৃষ্ণপক্ষ, চারপাশে আবছা অন্ধকার। সেই অন্ধকারকে আড়াল করে দীপ্তেন্দু তাকে সিঁড়ির দরজার মুখে একপাশে টেনে নিয়ে গেল। তাবপর পাগলের মতো তার ঠোঁটে, গালে, গলায় অজস্র চুমু খেল।

অগ্নিবীণা আবার অনুনয় করল,—'ছেড়ে দিন দীপ্তেন্দুদা। যদি হঠাৎ কেউ চলে আসে?'

'কে আসবে? তোমাদেব বাড়িতে এখন তো কেউ নেই বুলু?'

'নাই বা থাকল। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?' দীপ্তেন্দুর কণ্ঠে অস্থিরতা প্রকাশ পেল।

অগ্নিবীণা নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল,—'আমি বিবাহিতা। আপনি বুঝতে পারছেন না কেন, সম্পর্ক না থাকলেও আমার স্বামী রয়েছে।'

'কিন্তু সেই স্বামীকে কি তুমি কোনোদিন ভালবেসেছ বুলু?'

'নাহ্। তা বাসিনি। কিন্তু—'

'তাহলে কিন্তু কিসের?' দীপ্তেন্দু যেন ফৌজদারী উকিলের মতো জেরা করল। বলল,—'যাকে ভালবাসতে পারনি তার কাছে তোমার এত বাধ্যবাধকতা কিসের?'

অগ্নিবীণা ম্লান হাসল। বলল,—'আমি যে হিন্দু মেয়ে দীপ্তেন্দুদা, আমার রক্তে সেই সংস্কার তো রয়ে গেছে। আমার মা, পিতামহী, প্রপিতামহীর শরীরের সেই শোণিত যে আমার শিরা-উপশিরায় আজও বইছে।'

দীপ্তেন্দু এবার ওকে ছেড়ে দিল। বলল,—'আমাব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তুমি দাওনি বুলু?'

অগ্নিবীণা ম্লান হেসে বলল,—'উত্তর দেব কেমন করে? এমন অনেক প্রশ্ন আছে যার জবাব দেবার মতো সময় আসে নি।'

দীপ্তেন্দু তবু শুধোল,—'কিন্তু আমার প্রশ্নটা তো সময়ের ওপর ভিত্তি করে নয়। আমি জানতে চেয়েছি স্বামীর সঙ্গে তোমার ডিভোর্স হলে আমরা কি বিয়ে

করতে পারব? তোমার নিশ্চয় তাতে সায় আছে।'

'হয়তো আছে।' অগ্নিবীণা ঈষৎ ভেজা গলায় কথা কইল। বলল,—'কিন্তু মুস্কিল কী জানেন? আদালত থেকে সেই ডিভোর্সই যে এখনও মঞ্জুর হয় নি দীপ্তেন্দুদা, একটা Hypothesis বা কল্পনার ওপর ভিত্তি করে কি কোনো প্রশ্নের জবাব হতে পারে?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'তোমার মতামত জানতে পারলে একটা সুবিধে হ'ত বুলু।'

'কী সুবিধে?'

'দাদু বোধহয় এই বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন। তোমাদেব বিবাহ-বিচ্ছেদ যে আসন্ন আমার মনে হয় দাদুর সেটা অজানা নয়।' দীপ্তেন্দু এক মুহূর্ত কী চিন্তা করল। তারপর বলল,—'দাদুর কাছে তোমাকে বিয়ে কববার অনুমতি চাইতাম বুলু।'

অগ্নিবীণা তার দিকে তাকিয়ে সুন্দর একটি ভ্রূভঙ্গি করল। বলল,—'এত তাড়াতাড়ি কেন দীপ্তেন্দুদা? সৌম্যকান্তি মানে আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে আগে ডিভোর্সের মামলাটা রুজু হোক।'

দীপ্তেন্দু মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিল। কিন্তু কোনো মন্তব্য করে নি।

উত্তর না পেয়ে অগ্নিবীণা আবার বলল,—'মানুষ তো কত কিছু চায়। কিন্তু তার সব আশা কি মেটে দীপ্তেন্দুদা? আপনি চিন্তা করে দেখুন না শেষ পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে আমার বিয়ে হবে একথা কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম? আর দাদুর অনুমতির কথা বলছেন? আপনাব সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে পাবলে তিনিই বোধহয় সব চেয়ে বেশি খুশি হতেন। ফের যদি সেই সুযোগ আসে তাহলে দাদু অন্তত তার প্রতিবন্ধক হবেন না।'

'আর অবিনাশকাকা? তোমার বাবা?'

অগ্নিবীণা হাসছিল। বলল,—'বাবা কেন এতে অমত করতে যাবেন? ডিভোর্সী মেয়েকে বরং পাত্রস্থ করতে পারলেই তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করবেন।'

ছাদ থেকে অগ্নিবীণার পিছু পিছু দীপ্তেন্দু নীচে নেমে এলো। বলল,—'রাত্তিরে কি তুমি তাহলে একাই থাকছ বুলু?'

'বা রে! একা থাকতে হবে কেন? রাঁধুনীদিদি তো আটটার পর আসবে বলে গেছে। রাত্তিরে এ বাড়িতেই শোবে। আর, সত্যি বলতে, এখানেই তো আমি জন্ম থেকে আছি। তাই ভয়-ডর একটুও করে না।'

ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে দীপ্তেন্দু বলল,—'তাহলে আসি বুলু। দাদু বাঁকুড়া থেকে ফিরলেই একদিন এসে দেখা করে যাব।'

'আপনাকে রাত্তিরে খেয়ে যেতে বলতাম। কিন্তু রাঁধুনীদিদিকে তো আগে বলা হয় নি। তাই এ বেলা আর রান্নার পাট নেই। ও বেলার রান্নাই গরম করে আমাকে খেতে দেবে।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'আমিও তো মেসে নো-মিল করে আসিনি। রাত নটা-সাড়ে নটা পর্যন্ত মেসের ঠাকুর ভাতের হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকে। আসলে লোকটা বেশ ভালো। আমি খেয়েদেয়ে এসেছি শুনলে হয়তো মুখে কিছু বলবে না। কিন্তু মনে দুঃখ পাবে।'

যাবার আগে অগ্নিবীণা বলল,—'মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফিরেই খুব একা-একা লাগছিল। মাঝে মাঝেই আমার এমন হয়। সেজন্যই আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম দীপ্তেন্দুদা। আর আপনি এলেন বলে এত ভালো লাগল।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'রাত হয়েছে বুলু। আমাকে যেন আবার এগিয়ে দিতে এসো না। বরং রাঁধুনীদিদি এলেই খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়। বেলা দুটো অব্দি মেডিক্যাল কলেজের হাজারটা ঝক্কি সামলেছ। এখন একটু বিশ্রাম দরকার।'

পরদিন অফিসে যেতেই নীলিমা দত্ত শুধোলেন,—'কী ব্যাপার দীপ্তেন্দু? গতকাল একটা টেলিফোন পেয়েই রতিকান্ত বসুকে বলে চলে গেলে? কারো অসুখ-বিসুখ নাকি?'

'না-না। ওসব কিছু নয়। এমনি মানে একটু দরকারে যেতে বলেছিল।'

'কে?' নীলিমা একটু রহস্য করে জিজ্ঞেস করলেন,—'সেই ভদ্রমহিলা? উনি তো গত পরশুও তোমার খোঁজ করেছিলেন।'

দীপ্তেন্দু বুঝতে পারল অগ্নিবীণা যে তাকে মাঝে মাঝে টেলিফোন করে সেটা এই অফিসের কেউ কেউ জানে। বিশেষ করে নীলিমা দত্ত। একটি মেয়ে প্রায়শ দীপ্তেন্দুর খোঁজখবর নেয় এটা জানার পর তার কৌতূহল আরো বেড়েছে।

নীলিমা দত্ত জিজ্ঞেস করলেন,—'তোমার ওই বান্ধবী মেয়েটি জলপাইগুড়িতে ছিলেন না?'

'হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু অফিস ঘরের এদিক-সেদিক চকিতে চোখ বুলিয়ে নিল। বলল,—'তবে এখন ও কলকাতায় আছে। মেডিক্যাল কলেজে ওর হাউস-স্টাফশিপটা কমপ্লিট করতে। শেষ হলেই গাইনি আর অবস্টেরিকসে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা দিতে পারবে।'

'বাঃ! এ তো খুব ভালো কথা। মেয়েটি নিশ্চয় লেখাপড়াতে ভালো?'

'হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু স্বচ্ছন্দে জবাব দিল। বলল,—'এক চান্সেই ডাক্তারী পাশ করেছে। হাউস-স্টাফশিপ কবে কমপ্লিট হয়ে যেত। হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল বলেই জলপাইগুড়িতে শ্বশুরবাড়ি যেতে হ'ল।'

নীলিমা দত্ত মুচকি হাসলেন। বলল,—'বিয়েটা তো তোমার সঙ্গেই হতে পারত দীপ্তেন্দু।'

'ইয়ে, না মানে,—কী যে বলেন নীলিমাদি।'

নীলিমা দত্ত চোখ নাচিয়ে রহস্য করল। 'ঠিকই বলছি। আমার তো মনে হয়

মেয়েটি তোমাকে ভালবাসে।'

জবাবে দীপ্তেন্দু আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই রতিকান্ত বসুর খাস বেয়ারা এসে তলব দিল—সাহেব তাকে এখুনি ডাকছেন।

নীলিমা দত্ত বললেন,—'যাও, আগে দেখা করে এসো। পরে কথা হবে।'

দীপ্তেন্দু ঘরে পা দিতেই সম্পাদক বললেন—'আসুন আসুন। আমি তো আপনার লেখাটার অপেক্ষায় বসে আছি।'

গতকাল রাত্রেই লেখাটা শেষ করে সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। দীপ্তেন্দুর মনে হ'ল সকালে অফিসে এসেই নিবন্ধটি সম্পাদকের হাতে দেওয়া তার উচিত ছিল। রতিকান্ত বসু ডেকে পাঠালে তবেই সেটা তার হাতে তুলে দেবে এটা ভাবা বোধহয় ঠিক হয় নি।

রতিকান্ত বসু ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললেন। দীপ্তেন্দু সাইড-পকেট থেকে লেখাটা বের করে সম্পাদকের হাতে দিল। রতিকান্ত বসু তখনই সেটি পড়তে শুরু করলেন। খানিকটা পড়েই বললেন,—'বেশ ভালো হয়েছে। তবে তিনটি কেন্দ্রকে একসঙ্গে নিয়ে লিখেছেন বলেই প্রতিবেদনটি কিঞ্চিৎ বড় হয়ে গেছে।'

দীপ্তেন্দু নিজেই বলল,—'কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় অংশ হয়তো আপনার চোখে পড়বে। Edit করার সময় একটু কাট-ছাঁট করলেই হয়তো সাইজ-মাফিক দাঁড়িয়ে যাবে।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'বাঁকুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ৭২১৫৩ বলে লিখেছেন। এই নির্বাচনে মূলত তিনজন প্রার্থী, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু জবাব দিল। বলল,—'কংগ্রেসের প্রার্থী স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অনাথবন্ধু রায়। কম্যুনিস্ট প্রার্থী ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য। এবং হিন্দু মহাসভা থেকে দাঁড়িয়েছেন রাখহরি চট্টোপাধ্যায়। তবে লড়াইটা স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং ডাঃ ভট্টাচার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'আমারও অনুমান সে রকম। কিন্তু পুরুলিয়ার কী অবস্থা? সেখানে কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে লোকসেবক সঙ্ঘের জোর লড়াই, তাই না?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আজ্ঞে হ্যাঁ। গতবার অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে লোকসেবক সঙ্ঘের লাবণ্যপ্রভা ঘোষ প্রায় ন'হাজার ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাস্ত করেন। কিন্তু এবার লোকসেবক সঙ্ঘের নতুন প্রার্থী বিভূতি দাশগুপ্ত। বিপক্ষে কংগ্রেসের ডাঃ তারাপদ রায়।'

'আর মেদিনীপুরে প্রফেসর সামসুল বারীর বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট প্রার্থী কামাখ্যা ঘোষ এবং পি. এস. পি-র বঙ্কিম পাল ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন, এই তো?'

'হ্যাঁ স্যার।' দীপ্তেন্দু সায় দিল।

রতিকান্ত বসু বললেন,—'ঠিক আছে। লেখাটা একবার আমাদের চিফ্

একটা ব্যাক। সেটা আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার বেরুবে।

দীপ্তেন্দু সীটে গিয়ে বসতেই সোমেশ্বর তার কাছে এগিয়ে এলো। মৃদু হেসে শুধোল,—'আগামী বুধবার কি ফ্রি আছেন?'

'তার মানে?' দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে তাকাল। তারপর সোমেশ্বরের মতলবটা আন্দাজ করে বলল,—'ফ্রি থাকলেও আমি কোনো প্রেস শোতে যাব না।'

'আরে না-না, এটা কোনো প্রেস শো নয়। আপনাকে নিয়ে যাব এক পুরানো বন্ধুর কাছে। I mean your old friend। তাতে নিশ্চয় আপত্তি নেই?'

'Old friend মানে আপনি হরিদাসের কথা বলছেন?'

'হরিদাস নয়।' সোমেশ্বর রহস্য করে হাসল। বলল,—'এখন চিত্রতারকা তমালকুমার।'

'দেখুন সোমেশ্বরবাবু, ফিল্মস্টার কিন্তু আমার পুরানো বন্ধু নয়।' দীপ্তেন্দু একটু মজা করে বলল। পরমুহূর্তেই রীতিমত সিরিয়াস ঢঙে জানাল,—'তবে হরিদাস একসময় আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, There is a world of difference between that college friend and the film star of to-day.'

সোমেশ্বর বলল,—'সে যাই হোক তমালকুমার কিন্তু আগামী বুধবার সকাল এগারোটায় আমাদের এক্সক্লুসিভ্ ইন্টারভ্যুর সময় দিয়েছেন। তবে শর্ত একটাই। এই ইন্টারভ্যুতে আপনাকে অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে।'

তো আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললেন মশায়। ইয়ে, আমাদের ফিল্ম অ্যান্ড আদার

এনটারটেইনমেন্ট সেকশনটা তো মিলন সান্যাল দেখছেন। যদ্দুর জানি উনি সামনের সোমবার জয়েন করবেন। মনে হয় মিলন সান্যাল এলেই আমার আর যাওয়ার দরকার হবে না।'

সোমেশ্বর বলল,—'আপনি কি ভাবছেন তমালকুমারের সঙ্গে এই ইন্টারভ্যুর ব্যাপারে কথা আমি বলেছি?'

'তবে?'

'মিলন সান্যাল নিজেই ওকে কন্ট্যাক্ট করেছিল।' সত্যি বলতে সেদিনকার ঘটনা আমি মিলনকে খোলাখুলি জানিয়েছিলাম। আপনি যে ওর old college friend সে কথাও গোপন করিনি। তারপর আমার কথা শুনেই তো মিলন বাড়ি থেকে তমালকুমারকে টেলিফোন করে। ইন্টারভ্যুর ডেট চায়। তা আপনার বন্ধু এই নিয়ে আর কথা কচলায় নি। বুধবার সকাল এগারোটায় টাইম দিয়েছে। তবে ওই একটাই শর্ত। আপনাকে সঙ্গে যেতে হবে। মনে হয় আমরা কাজ সেরে চলে গেলে আপনার সঙ্গে খানিকটা গল্পগুজব করবে।'

দীপ্তেন্দু একটা অসহায় ভঙ্গি করে বলল,—'তাহলে আমাকে যেতেই হচ্ছে?'

'অবশ্য।' সোমেশ্বর কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা বিলিতি ঢঙ করে জানাল,—'আপনি না গেলে শেষপর্যন্ত যদি ইন্টারভ্যুটা বাতিল করে দেয়? ধরুন হঠাৎ একটা কাজ পড়ে গেছে এই ছুতোয় বেরিয়ে যায়?'

অগত্যা দীপ্তেন্দু রাজী। বলল,—'ঠিক আছে। তাহলে অফিস থেকেই বেরুব তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। সে বিষয়ে চিন্তার কারণ নেই। সোমবার মিলন সান্যাল আসুক। তারপর সেই প্রোগ্রামটা ছকে দেবে।'

'আমরা কে কে যাচ্ছি?'

সোমেশ্বর একটু চিন্তা করে বলল,—'ফিল্ম-এডিটর মানে মিলন সান্যাল আর আপনি তো নিশ্চয়। তারপর ক্যামেরাম্যান। সব শেষে আমাকেও ধরে রাখতে পারেন। অবশ্য যদি মিলন সান্যাল নাছোড়বান্দা হয়।'

দীপ্তেন্দু হাসল। বলল,—'আপনি না গেলে চলবে কেন? এ তো শিবহীন যজ্ঞ হবে তাহলে।'

শনিবার অফিস থেকে বেরুবার আগে দীপ্তেন্দু ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে একটা টেলিফোন করল।

অগ্নিবীণা রিসিভারটা তুলে সাড়া দিল—'হ্যালো।'

'কে, অগ্নিবীণা?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

'হ্যাঁ আমি। আপনি কোথা থেকে বলছেন?

'অফিস থেকে।' এক মুহূর্ত থেমেই দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল,—'দাদু কি বাঁকুড়া

থেকে ফিরেছেন?'

'না দীপ্তেন্দুদা। আমরা খুব চিন্তায় আছি। আজ সকালেই তো ফেরার কথা। কেন এলেন না বুঝতে পারছি না। হঠাৎ শরীর খারাপ হ'ল না তো?'

'না-না, এরকম ভাবছ কেন? ভোটের কাজে গিয়েছেন। এক-আধদিন তো দেরি হতেই পারে।'

'তা ঠিক, তবু ভাবনা তো হয়। কাল সকালে না ফিরলে বাবা নিজেই বাঁকুড়া যাবেন ঠিক করেছেন।'

'পাগল নাকি?' দীপ্তেন্দু বাধা দিয়ে বলল,—'অবিনাশকাকা যাবেন কেন? বরং দাদু যদি কাল না ফেরেন তাহলে রাতের ট্রেন ধরে আমিই একবার বাঁকুড়া ঘুরে আসব।

অগ্নিবীণা বলল,—'আচ্ছা সে কথা পরে ভাবলেই হবে। দাদু কাল ফেরেন কিনা আগে সেটা দেখা যাক।'

'বেশ।' দীপ্তেন্দু বলল—'আমি কাল সকালেই তোমাদের বাড়িতে আসছি। দাদু ফিরলেন কিনা সেটা জানতে পারব আর ফিরে এলে তার সঙ্গে দেখাও হবে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দীপ্তেন্দু বুঝতে পারল, নীলিমা দত্ত এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে টেলিফোনে তার কথাগুলি শুনছিল। তাকে কোনো প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়ে দীপ্তেন্দু বলল,—'ব্রজবিলাসবাবু মানে দাদু আজও বাঁকুড়া থেকে ফেরেন নি। বয়স হয়েছে। তারপর ইদানীং শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আগামীকাল সকালে না ফিরলে হয়তো আমাকেই একবার বাঁকুড়া যেতে হবে।'

নীলিমা দত্ত কিন্তু তাকে সমর্থন করলেন। 'নিশ্চয়, এরকম হলে যেতে হবে বৈকি।' শেষে বললেন,—'কথাটা বরং রতিকান্ত বসুকে একটু ছুঁইয়ে রাখ দীপ্তেন্দু। হঠাৎ যদি যেতে হয় তাহলে আর পারমিশন নেবার দরকার হবে না।'

দীপ্তেন্দু ভেবে দেখল নীলিমা দত্ত কথাটা মন্দ বলে নি। রতিকান্ত বসু এখনও অফিসেই আছেন। অবশ্য ব্রজবিলাস সরকার অর্থাৎ দাদু যদি কাল সকালেই কলকাতা ফিরে আসেন, তাহলে আর তাকে বাঁকুড়ায় ছুটতে হবে না। তবু কথাটা বলা থাকলে ভালো। এমন একটা পরিস্থিতিতে তাকে বাধ্য হয়ে বাঁকুড়া যেতে হয়েছিল জানলে সম্পাদক আর মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।

তার কথা শুনে রতিকান্ত বসু আগাম পারমিশন দিতে এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। বললেন, —'ব্রজবিলাস সরকারের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নাকি? শুনেছি একদা রিভলবার হাতে নিয়েই তার স্বাধীনতা সংগ্রামে হাতখড়ি হয়েছিল। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা মামলায় পুলিশ ওকে অভিযুক্ত করে এবং সেই ফৌজদারী কেসে ওঁর দ্বীপান্তর সাজা হয়েছিল। শুনেছি পরে কাগজপত্র দেখে এবং গান্ধীজীর হস্তক্ষেপে ব্রজবিলাসবাবুর সাজা মকুব হয়। ইংরেজ তাকে আর দ্বীপান্তরে পাঠায় নি। সেই থেকে উনি গান্ধীবাদী,—অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী,

একজন সৎ, নির্লোভ মানুষ বলে বিপক্ষ দলের সমর্থকবাও ওঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।'

দীপ্তেন্দু জানাল, —'ওর নাতনি মানে অগ্নিবীণার কাছে শুনলাম আগামীকাল সকালেও উনি আসতে পারেন। তেমন হলে আমাকে অবশ্য আর বাঁকুড়ায় ছুটতে হবে না।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'হ্যাঁ-হ্যাঁ, উনি ফিরে আসুন আমিও সেটা চাই। বুড়োবয়সে বেশি দৌড়োদৌড়ি শরীরে সইবে কেন? রাজনীতি তো আগে অনেক করেছেন। তাছাড়া আজকেব পলিটিক্সের দুনিয়ায় উনি বরং একটু বেমানান। এখন তাই ওঁর এসব এড়িয়ে চলাই ভালো।'

পরদিন দীপ্তেন্দুর একটু তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙল। বালিশের নীচে থেকে রিস্টওয়াচটা বের করে দেখল সাতটা বাজে। ছুটির দিন হলে দীপ্তেন্দু সাধারণত সাড়ে সাতটা, আটটা অব্দি ঘুমোয়। কিন্তু ব্রজবিলাস সরকারের কথা মনে হতেই সে উঠে বসল। মশারিটা তুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চৌবাচ্চার জলে মুখ হাত ধুয়ে নিল।

মেসের চাকর শ্রীকান্ত এসে বলল,—'বাবু, চা আর পাউরুটি নিয়ে আসি?'

'হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি আন।'

শ্রীকান্ত বলল,—'আজ আবার তাড়া কিসের বাবু? আজ তো রবিবার।'

'জানি।' দীপ্তেন্দু মুচকি হেসে বলল,—'কিন্তু তাড়া আছে। এক ভদ্রলোক বাঁকুড়া থেকে না ফিরে এলে, তার খোঁজে আমাকেই রাতের ট্রেন ধরে বাঁকুড়া যেতে হবে।'

'বলেন কী গো বাবু? তাহলে যাই। চটপট আপনার চা আর রুটি নিয়ে আসি।'

স্নান আর নিত্যকর্ম সেরে দীপ্তেন্দু মেস থেকে বেরুল। যাবার আগে মেসের ঠাকুরকে বলে গেল, আজ দুপুরে নো-মিল করে দিও ঠাকুর। মনে হয় আর দুপুরে খেতে আসা হবে না।'

'বেশ তো বাবু।' ঠাকুর সহাস্যে জানাল,—'আমার কোনো অসুবিধে নেই। এখনও তো রান্না চাপানো হয় নি। যাই বরং সেক্রেটারিবাবুকে আপনার নো-মিলের কথাটা বলে আসি।'

বিবেকানন্দ রোড আর কর্ণওয়ালিশ স্টীটের ক্রশিঙে দীপ্তেন্দু বাস থেকে নামল। ট্রাম লাইন পেরিয়ে খানিকটা হাঁটলেই বাঁ দিকে ডাফ স্ট্রীট। দীপ্তেন্দু রাস্তার মুখ থেকেই দেখতে পেল বৈঠকখানা ঘরে তর চেয়ারে বসে দাদু খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোচ্ছেন। দীপ্তেন্দুর পায়ের শব্দ কানে যেতেই মুখ তুলে বললেন,—'আরে এসো এসো। এতক্ষণ তো তোমার নির্বাচনী প্রতিবেদনটাতেই চোখ

বলেছিলাম।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'প্রতিবেদন থাক। আগে বলুন, ফিরতে এত দেরি হ'ল কেন?'

'দেবি কোথায়?' ব্রজবিলাস পাল্টা প্রশ্ন করলেন। বললেন, —'মঙ্গলবার সকালের ট্রেনে রওনা হলাম। বুধবাব সারাদিন বাঁকুড়ায় ছিলাম। পরদিন গেলাম পরাশরের কনস্টিচুয়েন্সিতে। মোট চার জায়গায় বক্তৃতা করেছি। তাতেই ধর বৃহস্পতি আর শুক্কুর দুটো দিন গেল। আবার বাঁকুড়ায় ফিরলাম শনিবার সকালে। তারপর রাত্তিরের ট্রেনে উঠে কলকাতায় ফিরেছি।'

'সেখানে গিয়ে আপনার শরীব ভালো ছিল তো দাদু?'

'নো প্রবলেম। ব্রজবিলাস নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দিলেন। বললেন,—'গ্রাম বাংলার টাটকা সব্জী, পুকুরের মাছ, ফ্রেশ এয়ার, এসব থাকলে শরীর কি খারাপ হতে পারে দীপ্তেন্দু?'

চায়ের কাপ হাতে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো অগ্নিবীণা। পেয়ালাটা দীপ্তেন্দুর সামনে রেখে বলল,—'দাদুর শরীর কিন্তু ভালো নয় দীপ্তেন্দুদা।'

'বল কী? তুমি কেমন করে জানলে?' দীপ্তেন্দু উৎকণ্ঠিত হ'ল।

অগ্নিবীণা হেসে বলল,—'কেমন করে আবার? আমি দাদুকে পরীক্ষা করেছি। থার্মোমিটার দেখলাম মার্কারি নরম্যালের দাগ ছুঁয়ে আছে। ওটা সামান্য জ্বর বলতে পারেন। তারপর গলায় কাশি। বুকে একটু কফও রয়েছে বলে মনে হ'ল।'

'ও কিছু নয়। দু দিন রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' ব্রজবিলাস সপক্ষে বললেন।

অগ্নিবীণা বলল,—'আসল কথাটা কিন্তু এখনও বলা হয় নি দীপ্তেন্দুদা।'

'কী কথা?' দীপ্তেন্দু জিজ্ঞাসু হ'ল।

অগ্নিবীণা বলল,—'দাদুর শরীরের রক্তচাপ কিন্তু ভালো নয়। একটু আগেই দেখলাম ১৮০/১০০। ডাক্তারি মতে নীচেরটা নব্বইয়ের ওপরে থাকা ভালো নয় দীপ্তেন্দুদা।'

ব্রজবিলাস ডাক্তারি শাস্ত্রের অকাট্য যুক্তিজাল হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন,—'দু-দিন বাদেই দেখবে প্রেসার ঠিক হয়ে গেছে। টেনশনের জন্য অমন মাঝে মাঝে বাড়ে।' তারপর মহারানীর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—'শুধু দীপ্তেন্দুকে চা দিলেই চলবে? আমার জন্যে অন্তত হাফ-কাপ পাঠাও।'

অগ্নিবীণা বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে বলল,—'ঠিক আছে। হাফ-কাপ চা এখুনি নিয়ে আসছি। কিন্তু আমাকে একটা কথা দিতে হবে দাদু।'

'কী কথা?'

'আগে বল কথা দিচ্ছ।'

'বা রে! না শুনলে বলি কেমন করে?'

অগ্নিবীণা মুখখানা ঈষৎ শক্ত করে বলল, —'এখন চার-পাঁচ দিন কমপ্লিট রেস্ট। বাড়ির বাইরে পা দেওয়া চলবে না।'

'আচ্ছা, সেটা কি সম্ভব? তুমিই বলো দীপ্তেন্দু? সামনের রবিবার কলকাতা আর হাওড়ার ইলেকশন। তার আগে কংগ্রেস অফিসে দু-একবার যেতে দেবে না?'

'নাহ্।' অগ্নিবীণা স্থিরবুদ্ধি বিচারকের মতো এক কথায় তার আর্জি নাকচ করে দিল।

সে পিছন ফিরতেই ব্রজবিলাস ব্যস্ত হয়ে বললেন, —'কোথায় চললে মহারানী? দীপ্তেন্দুকে আজ মধ্যাহ্নভোজনের নেমন্তন্ন করো।'

অগ্নিবীণা ফিরে দাঁড়াল। 'বা রে! সেটা আমাকেই বলতে হবে বুঝি? তুমি বললে দীপ্তেন্দুদা কি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না?'

'কেন করব না?' দীপ্তেন্দু মধ্যস্থতা করল। ঈষৎ হেসে জানাল,—'আমি আজ মেসে নো মিল করে এসেছি দাদু। এখানে মধ্যাহ্নভোজন না হলে আমাকে দুপুরবেলাটা উপোস করেই থাকতে হবে।'

'সেটাই ভালো ছিল।' অগ্নিবীণা চোখ ঘুরিয়ে রহস্য করল। 'কেমন করে জানব বলুন? অন্যদিন তো নেমন্তন্ন করলেই বলেন,—মেসে নো-মিল করে আসিনি।'

হঠাৎ কী যেন মনে হতেই দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আচ্ছা অবিনাশকাকা কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না।'

'বাবা বাজারে গিয়েছেন। এখুনি ফিরবেন।' ফের তার দিকে কটাক্ষ করে বলল,—'আপনি যা খেতে ভালবাসেন তাই আনতে বলে দিয়েছি।'

'কিন্তু সেটা কী?' দীপ্তেন্দু সাগ্রহে শুধোল।

অগ্নিবীণা উত্তর দিল,—'বড় সাইজের পার্শে মাছ। যা আপনার অতি প্রিয়।'

অবিনাশ বাড়ি ফিরেই বাজারের থলিটা কাজের লোকের হাতে দিয়ে বললেন,—'বাবা এসে গিয়েছেন দীপ্তেন্দু। নইলে আজ রাত্তিরের ট্রেনে তুমি কিংবা আমি একজন কাউকে নিশ্চয় বাঁকুড়া ছুটতে হ'ত।'

কথাটা কানে যেতেই ব্রজবিলাস চেঁচিয়ে বললেন, —'এত ব্যস্ত হলে চলে? আরে বাপু, বাঁকুড়া তো বিদেশ নয়। বরং মাতৃভূমি বলতে পারিস। সেখানে পাঁচজনের অনুরোধ-উপরোধে অমন দু-একটা দিন দেরি হতেই পারে।'

অবিনাশ বাড়ির ভিতরে যেতেই ব্রজবিলাস ইঙ্গিতে দীপ্তেন্দুকে কাছে ডাকলেন। বললেন,—'মহারানীর সঙ্গে তোমার কোনো কথা হয়েছে?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল দীপ্তেন্দু। বলল,—'কথা তো মাঝে মাঝেই হয় দাদু। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, জলপাইগুড়িতে ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে বুলু চলে এসেছে।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'সব জানি। চা-বাগানের একটা হাসপাতালে ও আগেই

চাকরি নেয়। শুনেছি শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজের জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করে ও হাসপাতালে নিজের কোয়ার্টার্সে গিয়ে ওঠে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'সে তো পুরনো কথা দাদু। তারপর ওর হাজব্যান্ড একদিন হাসপাতালে গিয়ে বুলুর সঙ্গে দেখা করেছিল। ওকে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য জেদাজেদি করে।'

'হ্যাঁ, তাও জানি।'

'কিন্তু বুলু শ্বশুরবাড়িতে আর ফিরে যেতে রাজী হয় নি বলে ওর নামে একটা উকিলের নোটিশ পাঠিয়েছিল।'

'উকিলের নোটিশ?' ব্রজবিলাস বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকালেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু জবাব দিল।

'কিসের নোটিশ?'

'Restitution of Conjugal life.–অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীর কাছে স্ত্রীকে ফিরে আসার নোটিশ।'

'কী আশ্চর্য!' ব্রজবিলাস অবাক হয়ে বললেন, —'অথচ দেখ, আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানি না।'

'আপনি জানলেও কোনো লাভ ছিল না দাদু।' দীপ্তেন্দু বিষয়টা ব্যাখ্যা করল। 'এরপরও বুলু শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে না চাইলে ওরা ডিভোর্সের মামলা করবে। স্ত্রী যখন স্বামীর সঙ্গে সহজ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী নয় তখন আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি জারি করতে আপত্তি করবে না।'

ব্রজবিলাস মুখ নীচু করে বললেন,—'শেষ পর্যন্ত তাই হবে! এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা আছে?'

দীপ্তেন্দুর ইচ্ছে হ'ল বলে, কোর্ট থেকে ডিভোর্সের ডিক্রি দিলে আমি ওকে আবার বিয়ে করব দাদু। কিন্তু অগ্নিবীণা তাকে ব্যস্ত হতে নিষেধ করেছিল। আগে তো ডিভোর্সের মামলা আদালতে পেশ হোক। তারপর এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করলেই হবে।

কিন্তু ব্রজবিলাস হঠাৎ নিজেই বললেন,—'আমার তো ইচ্ছে ছিল মহারানীকে তোমার হাতে তুলে দিই। তারপর বিধির নির্বন্ধ। নইলে তুমিই বা হঠাৎ ছাত্র-রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বে কেন? তারপর বিনা দোষে আদালতের সাজা। তিনমাস বিনা শ্রমে কারাবাস। আর তোমার জেল হয়েছে শোনার পর বৌমা এই বিয়েতে সম্পূর্ণ বেঁকে বসল। প্রায় অন্নজল ত্যাগ। অনেকটা বাধ্য হয়েই মহারানী শেষ পর্যন্ত মা-বাবার কথায় বিয়ে করতে রাজী হ'ল।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'ওসব কথা থাক দাদু। যা ঘটেছে সেটা তো আর বদলানো যাবে না। বরং ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে যদি ডিভোর্সের মামলা রুজু হয় তখন কী করবেন সেটাই এখন চিন্তা করা দরকার।'

ব্রজবিলাস হেসে জবাব দিলেন, —'এতে আর চিন্তার কী আছে? সৌম্যকান্তি যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়, তখন মহারানীর তরফ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও চেষ্টাই করা হবে না। ফলে আদালত একতরফা বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি জারি করবে। তাব মানে, The marriage shall be declared null and void.'

দরজার পর্দা সরিয়ে অগ্নিবীণা ঘরে পা দিতেই ব্রজবিলাস চুপ করে গেলেন। টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে বললেন,—'বাঁকুড়া সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ সেটাই ঠিক। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ডাঃ অবনী ভট্টাচার্যের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। যিনিই জিতুন দুজনের মধ্যে ভোটের খুব একটা ফারাক থাকবে বলে আমার মনে হয় না।'

অগ্নিবীণা টেবিলে জলখাবারের ডিশটা নামিয়ে রেখে বলল,—'দীপ্তেন্দুদা, আজ আর লুচি নয়। আপনার জন্য এগ-টোস্ট তৈরি করেছি।' তারপর চায়ের পেয়ালাটা ব্রজবিলাসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,—'চা কিন্তু হাফ-কাপ নয় দাদু।'

'তবে? ব্রজবিলাস মৃদু হাসলেন।

অগ্নিবীণা চোখ নাচিয়ে জবাব দিল,—'এর নাম ডবল-হাফ।'

দুপুরে, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, দীপ্তেন্দুকে একটু বিশ্রাম নিতে বললেন ব্রজবিলাস। অগ্নিবীণা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল,—'পাশের ছোট ঘরটায় আপনার বিছানা করে দিয়েছি। এখন অন্তত ঘন্টাখানেক শুয়ে থাকুন। ভরপেটে কোথাও যেতে হবে না। বিকেল হ'লে চা খেয়ে আপনার যেখানে খুশি যাবেন।'

ব্রজবিলাস নাতনিকে সমর্থন জানিয়ে বললেন,—'মহারানী তো ঠিকই বলেছে দীপ্তেন্দু। ছুটির দিনে দেরি করে খাওয়ার পর হাঁটাহাঁটি করাটা উচিত হবে না। অন্তত ঘন্টা দুই জিরিয়ে নাও। ততক্ষণে প্রায় চারটে বাজবে। তখন চা খেয়ে নিশ্চিন্তে যেতে পারবে।'

বিকেলে চা-পানের পর দীপ্তেন্দু ডাফ স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। অন্যদিনের মতো তাকে খানিকটা পথ এগিয়ে দেবার জন্য অগ্নিবীণাও ফুটপাতে পা রাখল। ব্রজবিলাস দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন,—'ইলেকশনের পর অবশ্যই একবার এসো দীপ্তেন্দু। আজ তো ভালো করে কথাই হ'ল না।'

বিবেকানন্দ রোডে পা দিতেই ডাফ স্ট্রীটের বাড়িটা পিছনে আড়াল হয়ে গেল। দীপ্তেন্দু বলল,—'তুমি আর কতটা রাস্তা আমার সঙ্গে হাঁটবে বুলু?'

'আর যাচ্ছি না।' অগ্নিবীণা নিশ্চল হ'ল। তারপর মুখ তুলে বলল,—'একটা কথা জিজ্ঞেস করব দীপ্তেন্দুদা?'

'নিশ্চয়। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস কর।'

'আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসা নিয়ে দাদু কি আপনাকে কিছু বলেছেন?

'তুমি কেমন করে জানলে?'

'সকালে জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢোকার সময় মনে হ'ল উনি সৌম্যকান্তির নাম নিয়ে কিছু বলছিলেন।'

দীপ্তেন্দু আর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল না। বলল,—'উনি তো সবই জানেন বুলু। আসলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার জন্যই দাদু উদ্বিগ্ন।'

অগ্নিবীণা শুধোল,—'আপনি কী বললেন?'

দীপ্তেন্দু উত্তর দিল,—'কী আর বলব? সৌম্যকান্তি যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করে তখন কী উপায় হবে সেটাই আলোচনা হচ্ছিল।'

অগ্নিবীণা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জানাল,—'এতে চিন্তাভাবনার কী আছে? আদালত যদি ডিভোর্স মঞ্জুর করে আমি তাতে একটুও অখুশি হবো না।'

বুধবার সাড়ে দশটা নাগাদ তার সহকর্মী মিলন সান্যাল আর সোমেশ্বরের সঙ্গে দীপ্তেন্দু বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে ক্যামেরাম্যান। গাড়ি স্টার্ট নিতেই সে বলল,—'হরিদাসের বাড়িটা কোথায় আমি কিন্তু জানি না।'

'সেটা জানার প্রয়োজন নেই আপনার।' মিলন সান্যাল আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল,—'আপনি কি ভাবছেন তমালকুমারের ঠিকানা না জেনেই আমি গাড়িতে উঠে বসেছি?'

সোমেশ্বর সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল। সে ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ হেসে জানাল,—'তমালকুমার থাকেন সুইন হো স্ট্রীটে। গড়িয়াহাটার অনেক আগেই সুইন হো স্ট্রীট। আমাদের পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

মিলন সান্যাল শুধোল,—'আপনার বন্ধুর গোপন খবর-টবর কিছু রাখেন?'

'না ভাই। সত্যি বলতে আমার সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ নেই।'

মিলন সান্যাল বলল,—'বাজারে একটা গুঞ্জন উঠেছে। ইদানীং তমালকুমারকে নাকি এক অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রায়ই এদিক-সেদিক ঘুরতে দেখা যায়।'

'জানি না।' দীপ্তেন্দু মুচকি হাসল। বলল,—'ওসব খবর আপনারা রাখবেন।'

'খবরটা সত্যি কিনা বন্ধুর কাছ থেকে জেনে আসুন না। ছাপতে পারলে যাকে বলে একটা ফাটাফাটি নিউজ। রীতিমত হই-চই শুরু হয়ে যাবে।'

কিন্তু দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল। বলল,—'না মশায়। ও সব আমার দ্বারা হবে না।'

বেল টিপতেই কেতাদুরস্ত বেয়ারা এসে তাদের ড্রইং রুমে বসাল। বলল,—'বসুন একটু। সাহেব কাকে টেলিফোন করছেন। কথা শেষ হলেই আসবেন।'

দীপ্তেন্দু সোফায় বসে তার বন্ধু হরিদাসের ফ্ল্যাটবাড়িটা দেখছিল। কী সুন্দর সাজানো-গোছানো ড্রইং রুম। দেয়ালে হাল্কা মভ্ কালার। শো-কেসে দেশ-বিদেশের নানা ধরনের পুতুল। দেয়ালে সাজানো দুটো সাঁওতালী মুখোশ তার খুব পছন্দ হ'ল।

মিনিট পাঁচ বাদেই তমালকুমার ঘরে এসে ঢুকল। হাতজোড় করে তাদের নমস্কার জানাল এবং সকলকে বসতে অনুরোধ করল। বকের পালকের মতো শাদা ধবধবে পাজামা আর সবুজ রঙের পাঞ্জাবী গায়ে। সে সামনে এসে দাঁড়তেই কী সুন্দর একটা মিষ্টি সুঘ্রাণ নাকে এসে লাগল। নিশ্চয় দামী ফরেন পারফিউম।

দীপ্তেন্দুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলল,—'তুই কিন্তু এখানে কাগজের লোক ন'স। ইউ আর মাই গেস্ট। ইন্টারভ্যু শেষ হলে তোকে ছাড়ছি না। আরো কিছুক্ষণ থাকতে হবে।' বাঁ চোখের ভুরুটা ঈষৎ তুলে বলল,—'এই ধর, ঘন্টা দুই। তারপর যেখানে যেতে চাস সেখানেই তোকে পৌঁছে দেব।'

দীপ্তেন্দু মৃদু আপত্তি জানাল,—'আমাকে তো আবার অফিসে ফিরতে হবে। রতিকান্ত বসু মানে আমাদের সম্পাদক যদি খোঁজ করেন?'

সোমেশ্বর বলল,—'সে ভাবনা আমাদের। অফিসে গিয়ে রতিকান্ত বসুকে আমরা জানিয়ে রাখব।' তারপর ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল,—'এখন তো সওয়া এগারোটার মতো বাজে। ধরুন ইন্টারভ্যু নিতে ঘন্টা দেড় লাগবে। তারপর আরো দু'ঘন্টা। অর্থাৎ তিনটে নাগাদ অফিসে ফিরতে পারবেন।'

মিলন সান্যাল খাতা-পেন্সিল হাতে ইন্টারভ্যুর কাজ শুরু করল। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা। দীপ্তেন্দুর হাতে এখন কী কী ছবি? হিন্দি চিত্রজগৎ থেকে কোনো অফার এসেছে কি না? সমুদ্র এবং তরঙ্গ ছবির জন্য খ্যাতনামা পারিচালক রামানন্দ রায় তাকেই নির্বাচিত করলেন কেন? প্রথম কোন নায়িকার বিপরীতে অভিনয় তার? শুটিঙের সময়কার দু-একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা শোনালে ভালো হয়। এবং সব শেষের প্রশ্নটি মোক্ষম। এই ক'বছরের সিনেমা-জীবনে তার কাউকে ভালো লেগেছে কি না?

দীপ্তেন্দু চুপ করে শুনছিল। হরিদাস ওরফে তমালকুমার কী সুন্দর সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। এখনই তার হাতে সাত-আটটা ছবি,—যার শুটিঙ চলছে। এর মধ্যে অন্তত দুটি বই আগামী পয়লা বৈশাখ মুক্তি পাবে। বম্বে থেকে দু'জন প্রযোজক-পরিচালক ইতিমধ্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সম্ভবত তার মধ্যে একজনের ছবিতে সে কন্ট্রাক্ট সই করতে পারে। সমুদ্র এবং তরঙ্গ ছবির গ্রাম্য-যুবকের চরিত্রে সেই সব থেকে মানানসই এবং উপযুক্ত ছিল। সম্ভবত সে কারণেই পরিচালক তাকে এই বইয়ের মুখ্য ভূমিকায় মনোনীত করেছেন।

আরো কিছু কথার উত্তর দেবার পর হরিদাস শেষ প্রশ্নটির দারুণ জবাব দিল।

বলল,—ছবিতে অভিনয় করার সময় সব নায়িকাকেই তার ভালো লাগে। কিন্তু

তারপর শুটিঙ শেষ করে বেরিয়ে এলেই আর কারো কথাই মনে থাকে না।

চা এবং জলযোগ সেরে মিলন সান্যাল এবং সোমেশ্বর বিদায় নিল। ক্যামেরাম্যান ইতিমধ্যে পটাপট ডজনখানেক ছবি তুলেছে। কাজ শেষ হতেই সে নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে বসেছিল। দীপ্তেন্দু বলল,—'কথাটা রতিকান্ত বসুকে গিয়ে বলবেন কিন্তু। আমি তিনটের মধ্যেই ফিরব আশা করছি।'

মিলন সান্যাল হেসে জবাব দিল,—'অত চিন্তা কিসের? সম্পাদককে আমি বুঝিয়ে বলব।' তারপর ইঙ্গিতে দীপ্তেন্দুকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে বলল,—'বরং সেই কথাটা বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে আসবেন। যাকে বলে ফ্রম হর্সেস মাউথ। যদি খবরটা বের করতে পারেন তাহলে, বুঝলেন কিনা, একটা ফাটাফাটি নিউজ। কাগজের সেল এক লাফে কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে জানেন?'

তার সহকর্মীরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল,—'এবার বল তোর কী কথা আছে। মিছিমিছি আমাকে আটকে রাখলি কেন?'

হরিদাস একগাল হেসে বলল,—'ওঁদের সামনে তোর সঙ্গে কথা বলা যায়? জানিস তো এই সব সাংবাদিকের সামনে মেপে মেপে কথা বলতে হয়। নইলে কখন তিলকে তাল করে বসবে।'

তার সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসল হরিদাস। বলল,—' তোকে দেখলে আমার বাঁকুড়া কলেজের দিনগুলো মনে পড়ে। রাত্তিরে হস্টেলের সুপার মিঃ স্যামুয়েল রাউন্ডে আসার আগে তোর ঘরে ঢুকে কম আড্ডা দিয়েছি?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'ওসব ভেবে তোর কী লাভ? তুই এখন অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিস। তবে হ্যাঁ, বলতে পারিস স্মৃতি সততই সুখের।'

হরিদাস আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে শুধোল, —'হ্যাঁরে, কণা দত্তকে তোর মনে আছে?'

'কেন থাকবে না?' দীপ্তেন্দু মুচকি হাসল। বলল, —'জীবনের প্রথম সহপাঠিনী।'

হরিদাস বলল,—'জানিস, কণা দত্ত আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল?'

'তোকে চিঠি?'

'হ্যাঁ। সাধারণত এসব ফ্যান লেটারে আমি চোখ বুলোই না। আমার সেক্রেটারীই এগুলো dispose করে। তাছাড়া হাতে অত সময় কোথায়? কিন্তু হঠাৎ Sender-এর জায়গায় কণা দত্তের নামটা পড়েই অবাক হয়ে গেলাম।'

'কণা দত্ত কী লিখেছিল?'

'তেমন Special কিছু নয়। আমিই যে তমালকুমার সেটা নাকি সে জানত না। হলে ছবি দেখতে এসেই আমাকে চিনতে পেরেছে। আমি রুপোলী পর্দার নায়ক হয়েছি জেনে চিঠিতে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছে। আর—'

'আর কী?'

'চিঠিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। লিখেছিল সময় করে তার বাড়িতে একদিন দেখা করতে। দরকারী কথা আছে আমার সঙ্গে।'

'যাস নি?'

'নাহ্। তার কারণ আমি খবর নিয়ে জানলাম কণা দত্তের সঙ্গে একটি পাঞ্জাবী ছেলের ভালবাসা হয়। তারপর ওরা বিয়ে করে। কিন্তু সে বিবাহ সুখের হয় নি। একই বাড়িতে মানে এক ছাদের নীচে ডা: কণা দত্ত এবং তার স্বামী আলাদাই থাকে। আলাদা ঘর, আলাদা বিছানা, আলাদা জীবন।'

'Very sad case.' 'দীপ্তেন্দু মন্তব্য করল। তারপর বলল, 'তবে এ রকম হয়। আসলে বিয়ে করার আগে ওই পাঞ্জাবী ছেলেটির সঙ্গে তার মিলমিশ হবে কি না সেটা যাচাই করে নেওয়া উচিত ছিল।'

সোফা ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে উঠে হরিদাস বলল,—'চল, চল। লাঞ্চের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'লাঞ্চ? কোথায়?' দীপ্তেন্দু যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল,—'আমি তো মেস থেকে খাওয়াদাওয়া করে বেরিয়েছি।'

'সে তো সকল দশটায়। কখন হজম হয়ে গেছে। নে উঠে পড়। ডোন্ট বি লেট।'

নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে হরিদাস চৌরঙ্গীর এক বিলাসবহুল শীতা তাপ-নিয়ন্ত্রিত হোটেলে এসে পৌঁছল। গাড়িটা একপাশে পার্কিং করে দুজনে লিফটে দোতলায় চলে এলো। আগে থেকেই আসন রিজার্ভ করা ছিল। রিসেপশনিস্টকে সে কথা বলতেই নির্দিষ্ট আসনে তাদের নিয়ে গিয়ে বসাল।

অর্ডার নেবার জন্য শ্লিপ-বুক হাতে হোটেলের কর্মচারী সামনে দাঁড়াতেই হরিদাস তাকে উদ্দেশ করে শুধোল,—'কী প্রেফার করিস বল? হুইস্কি না অন্য কিছু?'

দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল। বলল,—'আমি তো ড্রিঙ্ক করি না।

হরিদাস সশব্দে হেসে উঠল। বলল,—'ধুর! তাহলে তুই কী সাংবাদিকতা করবি? আগে ড্রিঙ্ক করতে শেখ। আচ্ছা শোন, তোকে বরং এক পেগ জিন দিতে বলি? ইটস্ এ লেডিজ্ ড্রিঙ্ক।'

কিন্তু দীপ্তেন্দু রাজী হ'ল না। মদ্যপান নৈব নৈব চ।

মুচকি হেসে হরিদাস বলল,—'আমার তো মনে হচ্ছে তোকে বোধহয় কেউ মদ খেতে বারণ মানে মাথার দিব্যি দিয়ে বসে আছে। তাহলে অবশ্য আমি জোর করব না। তাঁর দিব্যি বজায় থাক।' তারপর সামনের লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল,—'ম্যাকডাওয়েল ফর মি অ্যান্ড ওয়ান apple juice for my friend'.

খাওয়া প্রায় শেষ হবার মুখে দীপ্তেন্দু বলল,—' তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী বল?'

'বাজারে গুঞ্জন যে তোকে নাকি এক অভিনেত্রীর সঙ্গে এদিক-সেদিক ঘুরতে দেখা গেছে।'

হরিদাস রহস্য করে হাসল। বলল, 'এ রকম গুঞ্জন ছড়ালে নায়ক-নায়িকার Popularity বাড়ে। হিরো-হিরোইনদের সম্পর্কে দর্শকদের ঔৎসুক্য হয়।'

'তুই তাহলে ওটা অস্বীকার করছিস?'

'টোট্যালি। আসলে এসব বোগাস নিউজ। এর কোনো ভিত্তি নেই। হয়তো কোনো অভিনেত্রীর সঙ্গে শুটিঙের ফাঁকে গল্প করলাম। ব্যস! তাই নিয়ে গালগল্প তৈরি হয়ে গেল।'

রবিবার ইলেকশনের দিন দীপ্তেন্দুর নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল। সম্পাদকের কথা মতো ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে নিয়ে বুথ-পরিক্রমায় বেরিয়েছিল সে। চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধা পোলিং বুথে ঢুকেই রীতিমত সিরিয়াস ভঙ্গিতে শুধোলেন,—'হোয়্যার ইজ দি bullock?'

প্রশ্নটা শুনেই হকচকিয়ে যাবার কথা। বুথের ভিতর আবার bullock আসবে কোথা থেকে? আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। ওই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধা কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্ন জোড়াবলদে ছাপ দিতে চান। আর সেটা জানার পরই বুথে সে কী হাসির হররা।

আর একটি বুথে এক চীনা যুবতী ভোট দিতে আসতেই ক্যামেরাম্যান তার ভোটদানরতা ছবিটি তোলার জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের অনুমতি চাইল। অফিসারটি ভালো লোক। অনুমতি দিতে আপত্তি করলেন না।

শুধু একটা শর্ত। ভোটবাক্সের একদিকে ওই চীনা ভদ্রমহিলা আর অন্যদিকে তিনি দাঁড়াবেন। যাতে পরদিন কাগজে তার ছবিটাও ছাপা হয়। সেইভাবেই ক্যামেরা ক্লিক্ করল। এবং আশ্চর্য! পরদিন ওই ছবিটা কাগজের প্রথম পাতায় ফলাও করে প্রকাশিত হ'ল। কিন্তু ক্যামেরাম্যানের নিপুণ কারসাজী, ছবিতে প্রিসাইডিং অফিসার সম্পূর্ণ বাদ। শুধু ভোটের বাক্স আর তাতে ব্যালেট পেপার ফেলছেন ওই চীনা যুবতী।

পরদিন সন্ধ্যে থেকেই মফঃস্বলের ফলাফল আসতে শুরু করল। অফিসে একটা টান-টান উত্তেজনা। হঠাৎ রতিকান্ত বসুর খাস বেয়ারা তাকে খুঁজে বের করে বলল,—'চলুন চলুন। সাহেব আপনাকে এখুনি ডাকছেন।'

ব্যস্ত হয়ে দীপ্তেন্দু সম্পাদকের ঘরে গিয়ে ঢুকতেই রতিকান্ত বসু তার দিকে তাকিয়ে বললেন,

—'বসুন। একটা Surprising News আছে।'

দীপ্তেন্দু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাকিটুকু শোনার জন্য সাগ্রহে তাকাল।

রতিকান্ত বসু বললেন,—'আপনার সমীক্ষাই ঠিক। এইমাত্র খবর পেলাম। বর্ধমান কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী রাধারানী মহতাব জয়ী। বিনয় চৌধুরী পরাস্ত। রাধারানী মহতাব ভোট পেয়েছেন ৩৪৫৯০টি আর বিনয় চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট মাত্র ১৫৯৪১।

॥ নয় ॥

দীপ্তেন্দু কোনো মন্তব্য করবার আগেই সম্পাদক তাব দিকে তাকিয়ে বললেন, —'খবরটা শুনে আমি অখুশি আবার আনন্দিতও বলতে পার।'

'অখুশি কেন স্যার?' দীপ্তেন্দু সোজাসুজি প্রশ্ন করল।

সম্পাদক যেন ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, 'অখুশি এইজন্য যে বিনয় চৌধুরীর মতো একজন সৎ, নির্লোভ রাজনৈতিক কর্মী এবং দক্ষ সাংগঠনিক ভোটযুদ্ধে হেরে গেলেন। আসলে কী জানেন দীপ্তেন্দুবাবু? আমাদের দেশে এখনও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সুষ্ঠু এবং সঠিক প্রয়োগ হবার মতো জমি তৈরি হয় নি। আপনি চিন্তা করে দেখুন না এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আপনার যেমন একটি ভোট, তেমনি এই রিকশচালকেরও একটি ভোট। অথচ আপনি কত রাজনীতি-সচেতন আর এই রিকশচালক এসব বিষয়ে প্রায় অজ্ঞ এবং মিথ্যে বলব না ওর নিজস্ব মতামত নেই বললেও চলে। ফলে গণতন্ত্রের সঠিক প্রতিষ্ঠা এদেশে রূপায়িত হতে ঢের বাকি।'

দীপ্তেন্দু কোনো প্রতিবাদ না করেই বলল,—'তাহলে এই খবর শুনে আপনি আনন্দিতই বা হলেন কেন?'

'আনন্দিত আপনার কৃতিত্বে।' রতিকান্ত বসু প্রশংসার সুরে জানালেন, —'এখন তো বুঝতে পারছি আপনার নির্বাচনী পর্যালোচনা বা সমীক্ষার শেকড় কত গভীর ছিল। পছন্দ হয়নি বলেই সেটা ছেঁটে উড়িয়ে দেওয়া নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার কাজ হ'ত। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম আপনার এই নির্বাচনী প্রতিবেদন কাগজে ছাপব না, কারণ হারজিতের যে ইঙ্গিত আপনি দিয়েছিলেন সেদিন কলকাতায় বসে কারো পক্ষেই ওটা স্বীকার করে নেওয়া সহজ ছিল না।'

দীপ্তেন্দুর সঙ্গে কথাবার্তার মাঝখানে চিফ রিপোর্টার সুধাকান্তবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। তাকে দেখেই রতিকান্ত বসু শুধোলেন, —'কী মশায়, ইলেকশনের আর কিছু ফলাফল জানতে পারলেন?'

সুধাকান্ত বললেন, —'মফঃস্বলে কংগ্রেস এগিয়ে আছে। কলকাতায় ভবানীপুর

কেন্দ্রে নির্দলপ্রার্থী সিদ্ধার্থশংকর রায় তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রায় আড়াই হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন।'

দীপ্তেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল,—'আমি তাহলে আসি স্যার।'

'হ্যাঁ আসুন। আপাতত দু-তিন দিন নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে বাজার ডামাডোল, সমস্ত কেন্দ্রের নির্বাচনী খবর প্রকাশিত হলে আমরা ফের একটা সমীক্ষা প্রকাশ করব।'

দীপ্তেন্দু হল ঘরে ঢুকতেই নীলিমা দত্ত তাকে লক্ষ্য করে বললেন,—'এই যে দীপ্তেন্দু, বাঁকুড়ার খবর শুনেছ তো?'

'না নীলিমাদি। বাঁকুড়ার রেজাল্ট এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ।' নীলিমা দত্ত সহাস্যে জানালেন, —'বাঁকুড়ায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরাজিত।'

'তাই নাকি?' দীপ্তেন্দু সাগ্রহে শুধোল। বলল, —'নিশ্চয় ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য জয়ী হয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' নীলিমা দত্ত চোখ বড়ো বড়ো করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'তবে মার্জিনটা খুবই কম, মাত্র ৫৭৭ ভোটের ব্যবধানে হেরে গেছেন ডাঃ অনাথবন্ধু রায়।'

হলঘরটায় এখন কোণে-কোণে জটলা। টেলিপ্রিণ্টারে হঠাৎ একটা কাগজ উঠলেই সেটা নির্বাচন সংবাদ কি না জানবার জন্য ব্যস্ত ব্যগ্রতা। কেউ-বা একটা ছোট ট্রানজিস্টার চালিয়ে ইলেকশন বুলেটিন শোনার জন্য কান পেতে রয়েছে।

হঠাৎ রতিকান্ত বসুর খাস বেয়ারা এসে জানাল, —'সাহেব নীলিমাদিকে ডাকছেন।'

নীলিমা দত্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দীপ্তেন্দুর কৌতূহলী চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, —'যাই, কী হুকুম আবার শুনে আসি।'

বেশিক্ষণ নয়। মিনিট পাঁচেক বাদেই নীলিমা দত্ত ফিরে এলেন। এসেই দীপ্তেন্দুকে বললেন,—'চল আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?' দীপ্তেন্দু অবাক হয়ে তাকাল।

'প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার অফিসে।' নীলিমা দত্ত কোনোরকম ভনিতা না করেই জবাব দিলেন। বললেন, —'আমার সঙ্গে তোমাকেও যেতে বলেছেন।'

'আমাকে? কেন?' দীপ্তেন্দু ভুরু কোঁচকাল। শুধোল, —'প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার অফিসে কী দরকার নীলিমাদি?'

'তেমন কিছু নয়। আমার তো মনে হয় সামান্য ব্যাপার। টেলিফোনে জিজ্ঞেস করলেই হ'ত। কিন্তু রতিকান্ত বসুকে জান তো? ভীষণ খুঁতখুঁতে লোক, টেলিপ্রিন্টারে একটা ইলেকশন নিউজ এসেছে। ওটা একটু অস্পষ্ট এবং সংবাদটাও খুব clear নয়। সম্পাদক চান এই ব্যাপারটা আমরা একবার পি.টি. আই অফিস থেকে Verify করে আসি। তাছাড়া,—'

'তাছাড়া আবার কী?'

'আমাদের মেসিনে সব নিউজ ঠিকমত এসেছে কি না সেটাও একবার যাচাই করে নিতে বলেছেন।'

কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে নীলিমা দত্ত বললেন,—'দীপ্তেন্দু, চল কোথাও বসে একটু টিফিন করে নিই। সেই কোন সকালে দুটি ভাত খেয়ে বেরিয়েছি বল তো? এখন পেট যাকে বলে একেবারে চুঁই চুঁই করছে।' ফের দীপ্তেন্দুকে লক্ষ্য করে বললেন,—'তোমারও নিশ্চয় সেই অবস্থা?'

'বেশ তো চলুন।' দীপ্তেন্দু সায় দিল। তারপর নিজেই বলল, —'মোড়ের কাছে একটা ভালো রেস্তোরাঁ আছে। মেইনলি সাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড। ধোসা, ইডলি, মশলা ধোসা, ভাদা, আরো অনেক কিছু। শেষকালে ওদের সেই ডবল স্টেইনলেস স্টিলের পাত্রে হট্ কফি।'

নীলিমা দত্ত বললেন, —'তাই চল। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কিন্তু একটা ট্যাক্সি নিও। পি. টি. আই অফিস তো ধারে কাছে নয়। এখন আর বাসে উঠতে ইচ্ছে করছে না।'

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে বলে এখন ভেতরটা ফাঁকা। একপাশে পাখার নীচে বসল দুজনে। দীপ্তেন্দু হেসে জিজ্ঞেস করল, —'কী খাবেন নীলিমাদি?'

'তার মানে?' নীলিমা দত্ত মুচকি হাসলেন। রহস্য করে বললেন,—'তুমি খাওয়াবে নাকি?'

'হ্যাঁ, তাতে আপনার আপত্তি আছে?'

'আপত্তি থাকবে কেন? তবে যে বয়সে কোনো ছেলে একজন মেয়ের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢোকে, গল্পগুজব করে, তারপর মানিব্যাগ বের করে ছেলেটি বিল মিটিয়ে দেয়, সে বয়স কি আর আমার আছে দীপ্তেন্দু? তুমি বরং অগ্নিবীণাকে নিয়ে যখন এখানে আসবে তখন রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে দিও। আজ পেমেণ্টটা আমাকেই করতে দাও।'

দীপ্তেন্দু ঈষৎ হাসল। সে বুঝতে পারছিল অগ্নিবীণার নামটা তার অফিসে বেশ চাউর হয়ে গেছে। তাই সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলল, —'তাহলে দুটো মশলা ধোসা দিতে বলি নীলিমাদি? তার সঙ্গে হট্ কফি।'

মশলা ধোসা আসতেই দুজনে খাওয়া শুরু করল। প্রসঙ্গটা দীপ্তেন্দু এড়িয়ে যেতে চাইলে কী হবে? নীলিমা দত্ত আবার সেটা টেনে আনলেন। শুধোলেন, —'তোমার ওই বান্ধবী কি এখন মেডিক্যাল কলেজের হাউস-স্টাফ হয়ে আছে?'

'হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু ঘাড় হেলিয়ে জবাব দিল। 'তারপর নিজেই বলল,—'হাউস-স্টাফশিপটা কমপ্লিট করলেই বুলু গাইনি আর অবস্টেরিকসে এম. এস. পরীক্ষা দেবে।'

'তারপর? পড়া শেষ হলে কি আবার শ্বশুরবাড়ি মানে জলপাইগুড়ি ফিরে যাবে?'

দীপ্তেন্দু কী যেন উত্তর দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু জুৎসই কোনো জবাব তার মুখে এলো না।

নীলিমা দত্ত মুচকি হেসে শুধোলেন,—'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব দীপ্তেন্দু?'

'হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে।'

'ওই মেয়েটি মানে অগ্নিবীণাকে তুমি ভালবাস, তাই না?'

দীপ্তেন্দু একবার চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু কোনো উত্তর দিল না।

নীলিমা দত্ত বললেন,—'শুনেছি ওর বিয়ের আগেই তোমাদের ভালবাসা হয়েছিল। এবং সেই বিয়ে হতে কোনো বাধা ছিল না।'

দীপ্তেন্দু ভুরু কোঁচকাল। তার সম্বন্ধে নীলিমা দত্ত আরো কী খবর সংগ্রহ করে রেখেছে সেটা জানার জন্য সে কৌতূহলী হ'ল। তবে হ্যাঁ, নীলিমা দত্ত সত্যিই একজন ভালো রিপোর্টার। তার জীবনের প্রায় নির্জন একটা অধ্যায় আদ্যোপান্ত কেমন সংগ্রহ করে ফেলেছে।

দীপ্তেন্দু কিছু বলার আগেই নীলিমা দত্ত ফের জানালেন,—'বিয়েটা হয়নি তার কারণ এম. এ. পড়ার সময় তুমি ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলে। তারই জেরে একদিন ছোট্ট একটা ঘটনায় পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করল। ফলে তিনমাস বিনাশ্রমে কারাবাস। আর তাতেই মেয়ের মা বিয়ের নামে সম্পূর্ণ বেঁকে বসলেন। এই তো?'

দীপ্তেন্দু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল,—'আপনি তো দেখছি সব খবরই রাখেন।'

'রাখি মানে শুনেছি।' নীলিমা দত্ত রহস্য করে হাসলেন। বললেন,—'তুমি এখানে জয়েন করবার পরই এই কাগজের মালিক তোমার সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর নিয়েছিলেন। আর সেটাই এখানকার নিয়ম। কাগজের পলিসি, দৃষ্টিভঙ্গি, খবরাখবর সংগ্রহ করা এ সবের সঙ্গে তুমি কতখানি খাপ খাইয়ে নিতে পারবে সেটা নিশ্চয় জানা দরকার।'

কী ভেবে দীপ্তেন্দু হঠাৎ বলে ফেলল, —'আমি কিন্তু আপনার সম্বন্ধেও কিছু শুনেছি নীলিমাদি।'

'সেটা স্বাভাবিক। এই তো ছোট্ট একরত্তি অফিস। সব মিলিয়ে আমরা কতজনই বা এখানে কাজ করি। তাই একজনের হাঁড়ির খবর অন্যে সংগ্রহ করে রাখে।' দীপ্তেন্দু কোনো মন্তব্য করবার আগেই নীলিমা দত্ত বললেন,—'তুমি কী শুনেছ আমি জানি। কয়েক বছর হ'ল আমরা স্বামী-স্ত্রী এখন আর একসঙ্গে বাস করি না।' চোখ তুলে নীলিমা দত্ত দীপ্তেন্দুর দিকে তাকালেন। বললেন, 'একটি মেয়ের

সম্বন্ধে এর চেয়ে মুখরোচক খবর আর কী হতে পারে বল?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমি মনে করি ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক।'

নীলিমা দত্ত বললেন,—'সে কথা আর কজন বোঝে? জানো দীপ্তেন্দু, কয়েক বছর আগেও তো আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তখন আমাদের একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি ছিল। প্রায় রোজই উনি নিজে ড্রাইভ করে আমাকে অফিসের দরজায় নামিয়ে দিয়ে যেতেন। তখন অনেকেই আমাকে হিংসে করত। শুনেছি এই প্রেমপর্বকে লক্ষ্য করে কেউ কেউ আড়ালে নাকি আমাদের চখাচখী বলত। তারপর একদিন যা হবার তাই হ'ল। উনি আমাকে ছেড়ে অন্য একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে আলাদা থাকতে শুরু করলেন।'

দীপ্তেন্দু নীরবে শুনছিল। কোনো মন্তব্য করে নি। নীলিমা দত্ত বললেন, —'তুমি শুনেছ নিশ্চয় আমার স্বামী একজন নাম-করা সুরকার। জানলে হয়তো আরো অবাক হবে আমরা তিন-চার বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর বিয়ে করেছিলাম। তখন অবশ্য ওঁর এত নাম-ডাক হয় নি। তবে হ্যাঁ, রেকর্ড বেরিয়েছে। বছরখানেক ওর সঙ্গে ঘর-সংসার করার পর আমার পেটে সন্তান এলো। কোলে মেয়ে নিয়ে আমি মা হলাম। এদিকে বছর কয়েক যেতেই ওঁর খ্যাতি আর নাম ফিল্ম জগতে বেশ সাড়া ফেলে দিল। ইতিমধ্যে ওঁর অনেক ছাত্রছাত্রী হয়েছে। তারা গান শেখার জন্য বাড়িতে এসে ভিড় করত। তবে সপ্তাহে দু-দিন বড় জোর তিন দিনের বেশি উনি গান শেখাতেন না। একদিন হঠাৎ আমার চোখে পড়ল অঞ্জনা নামে ওঁর একটি ছাত্রী প্রায় সব দিনই ওঁর কাছে গান শিখতে আসছে। আর বেশ যত্ন নিয়েই উনি তাকে গান শেখাচ্ছেন। মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা খুব সজাগ জানবে। বিশেষ করে পুরুষের সম্বন্ধে। তখনই আমার মনে হয়েছিল অন্য ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অঞ্জনার ওপর উনি যেন একটু বেশি নজর দিচ্ছেন।' কথা বলার মাঝে নীলিমা দত্ত একবার কফির কাপে চুমুক দিলেন। তারপর নিজেই আবার শুরু করলেন,—'হঠাৎ একদিন ওদের সম্পর্কটা আমার চোখে ধরা পড়ে গেল। কী কারণে যেন বেলা দুটোয় অফিস ছুটি হয়ে গেছল। সেদিন তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। মেয়ে স্কুলে। কিন্তু দরজার সামনে পা রেখেই মনে হ'ল ভিতরে কারা যেন কথা বলছে। তাদের মধ্যে একজন মহিলা। অন্যজন পুরুষ। তবে তার গলাটা আমার খুব চেনা বলেই মনে হ'ল। সেদিন কিন্তু আমার সুরকার স্বামীর গান শেখানোর দিন নয়। মনের ভিতর একটা খটকার সৃষ্টি হ'ল। তাহলে এই অসময়ে কে আবার ওর কাছে বাড়িতে গান শিখতে এলো? ঘরে ঢোকার একটা চাবি আমার ব্যাগে সর্বদাই থাকত। উনি বাড়িতে না থাকলে সেই চাবিটা দিয়ে দরজা খুলে আমি ভেতরে ঢুকতাম। বেরিয়ে যাবার সময় উনি নেমপ্লেটের 'ইন'টা আড়াল করে 'আউট'টা বের করে দিয়ে যেতেন। ফলে ভেতরে মানুষটা আছে কিনা সেটা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে ছিল না।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে নীলিমা দত্ত আবার

বলে গেলেন,—'নিঃশব্দে দরজা খুলে আমি ভেতরে ঢুকলাম। গল্পে ওরা তখন এতই মত্ত যে আমার পায়ের শব্দও টের পায়নি। বাইরের গান শেখানোর ঘর নয়। কথা আসছিল আমাদের শোবার ঘর মানে বেড-রুম থেকে। পা টিপে টিপে এগিয়ে দরজার ফাঁকে চোখ রাখতেই আমার মাথাটা বন বন করে ঘুরে গেল। অঞ্জনা মানে ওই মেয়েটি বিছানায় শুয়ে আর আমার স্বামী আধশোয়া অবস্থায় ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে নরমগলায় কী যেন বলছে। বুঝতে বাকি রইল না। এ রকম ঘটনা এ বাড়িতে নতুন নয়। মাঝে মাঝেই ঘটে। এ সময় বাড়িটা একরকম ফাঁকা থাকে। কাজের মেয়েটি রান্নাবান্না সেরে বেলা বারোটা বাজলেই বাড়ি চলে যায়। পাঁচটার আগে আর ফিরে আসে না। সকাল দশটা বাজলেই মেয়ে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে স্কুল-বাসে ওঠে। সে ফেরে সাড়ে চারটের পর। সুতরাং দুপুরের এই সময়টা বিবাহ-বহির্ভূত নারীসঙ্গ আস্বাদনের পক্ষে এক সুবর্ণ সুযোগ।

দরজা খুলে ভেতরে পা রাখতেই আমার স্বামী এক লহমায় মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে গেল। অঞ্জনাও আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না। খাটের ওপর থেকে তার ব্যাগটা টেনে নিয়ে একরকম দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যেতেই আমি স্বামীর ওপর চড়াও হলাম। ঘৃণায় মুখ কুঁচকে বললাম, —'চমৎকার! তা ছাত্রীর সঙ্গে তোমার এই দেহ-সম্পর্ক কতদিনের?' আমার সুরকার স্বামী কিন্তু এই কুৎসিত মুখভঙ্গি দেখেও বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। শক্ত চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, —'কী আজেবাজে কথা বলছ?' আমি দ্বিগুণ চিৎকার করে উত্তর দিলাম, —'আজেবাজে কথা? তবু যদি না নিজের চোখে দুজনকে ওই অবস্থায় দেখতে পেতাম। চরিত্রহীন, লম্পট, দুশ্চরিত্র পুরুষ। আমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কথা বলতে লজ্জা করছে না?' আমি প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছি দেখে স্বামী এবার রণে ভঙ্গ দিলেন। খুব দ্রুত জামাকাপড় বদলে মনিব্যাগটা পকেটে ফেলে উনি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।' এরপর নীলিমা দত্ত হঠাৎ নিশ্চুপ হলেন। প্রায় মিনিটখানেক বাদে দীপ্তেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'স্বামীর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। আমার উপস্থিতিতে উনি আর কোনোদিন এ বাড়িতে পা দেন নি।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আচ্ছা নীলিমাদি আপনি তো বললেন দু-বছর চুটিয়ে প্রেম করে তারপর আপনারা বিয়ে করেছিলেন। তাহলে এই বিয়ে ভাঙল কেন?'

নীলিমা দত্ত বললেন,—'তার কারণ এই পৃথিবীতে সবই ভঙ্গুর। Nothing is permanent in this earth, not even love.'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আচ্ছা, যে মেয়েটির সঙ্গে আপনার স্বামীর ভালবাসা হয়েছিল অর্থাৎ সেই অঞ্জনা কি খুবই সুন্দরী?'

নীলিমা হেসে উঠলেন। বললেন, 'এই পৃথিবীতে সৌন্দর্যও ক্ষণস্থায়ী দীপ্তেন্দু। জানো বিয়ের আগে আমার স্বামী একদিন বলেছিলেন, আমি নাকি অসাধারণ সুন্দরী। ওর সেই কথাটা সেদিন শুনতে ভালো লেগেছিল এবং কেন জানি না সেটাই আমি সত্যি ভেবেছিলাম। আসলে নারী-পুরুষ কেউই এক পতি কিংবা

এক পত্নীতে সম্পূর্ণ সুখী নয়। আর শাস্ত্রে তো বলেছে, মনসা নারী বহুগামিনী। সেজন্যই পঞ্চস্বামী থাকতেও মহাভারতের দ্রৌপদী মনে মনে কর্ণকে পতিরূপে কামনা করেছিলেন। আমার সুরকার স্বামীরও আসক্তি হয়েছিল অঞ্জনার ওপর। ততদিনে রঙ-চটা প্রতিমার মতো আমিও ওর মনে ম্লান, ধূসর হয়ে গিয়েছি।'

দীপ্তেন্দু শুধোল, —'আপনাদের কি তাহলে ডিভোর্স হয়ে গেছে?'

'সে তো কবে। সম্পর্ক ভেঙে যাবার পর সেটা আঁকড়ে ধরে থাকার কোনো অর্থ হয় না দীপ্তেন্দু। তাই আদালতে ডিভোর্সের মামলা আমিই এনেছিলাম। বিশ্বাস কর বিচ্ছেদের ডিক্রিটা হাতে পাবার পর মনে হল বুকের মাঝখান থেকে যেন একটা পাষাণ সরে গিয়েছে।'

দীপ্তেন্দু সঙ্কোচের সঙ্গে জানাল,—'দু-একজন বলে এরপর আপনি নাকি একজন অধ্যাপকের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছেন।'

'এ খবরও পেয়েছ তুমি?' নীলিমা দত্ত মুচকি হাসলেন। বললেন,—'নাহ্! তোমাকে যতখানি নাবালক ভেবেছিলাম, তুমি কিন্তু তা নও।'

দীপ্তেন্দু কোনো জবাব দেবার আগেই নীলিমা দত্ত সহাস্যে জানালেন,—'এই পৃথিবীতে সব চেয়ে কষ্টের কী জানো দীপ্তেন্দু?'

'কী?' দীপ্তেন্দু জিজ্ঞাসু হ'ল। তারপর বলল, —'রোগ-অসুখ?'

'নাহ্।' নীলিমা দত্ত বললেন,—'সব চেয়ে কষ্টের কারণ হ'ল নিঃসঙ্গতা। এই পৃথিবীতে একা থাকাটাই সর্বাধিক দুঃখের। এজন্যই জীবজগতে সব প্রাণী সঙ্গী খোঁজে। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। তুমি যে অধ্যপকের কথা বলছিলে ওর সঙ্গে একটা ফাংশনে হঠাৎ পরিচয় হয়েছিল। হাসিখুশি সপ্রতিভ মানুষটি। সর্বদাই মজার কথা বলেন। মনে হ'ল আমারই বয়সী। পরে অবশ্য জেনেছিলাম উনি আমার চেয়ে চার বছরের বড়ো। প্রথম দর্শনেই ওকে ভালো লাগল। কী সুন্দর ঝকঝকে কথা। আর আমাকেও বোধহয় ওর পছন্দ হয়েছিল। ফলে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরি হয় নি। কিন্তু সমস্যাটা কী হ'ল জানো দীপ্তেন্দু? উনি বিবাহিত। একটি ছেলেও আছে। সে ক্লাস এইটে পড়ে। স্ত্রী দমদমের একটা গার্লস স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড-মিসটেস। সব দিক থেকেই হয়তো পরিপূর্ণ সংসার। তবু এতেও ওর মন ভরে নি। কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছিল। এর ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। আসলে নীতিবাগীশ মানুষেরা হয়তো এই ধরনের কথা শুনলে হৈ হৈ করে উঠবেন। কিন্তু মানুষের মনকে কি নীতি দিয়ে শাসন করা যায়?'

নীলিমা দত্ত আবার বললেন, —'সে কথা থাক। আমাদের গাঢ় বন্ধুত্ব আর ভালবাসার এতদিনে নিশ্চয় একটা সুন্দর পরিণতি হতে পারত। উনি কিংবা আমি দুজনেই মনেপ্রাণে তাই চেয়েছি। কিন্তু বাদ সাধছেন ওঁর স্ত্রী।'

'সেটা কী রকম?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

'সব জেনেও ভদ্রমহিলা ওকে ডিভোর্স দিতে রাজী নন। আসলে ডিভোর্স কিংবা জুডিসিয়্যাল সেপারেশান যাই বল তার জন্য একপক্ষকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে। এবং বলাবাহুল্য সেজন্য একটা আইনানুগ আর্জি করতে হয়। অবশ্য দু-

পক্ষই রাজী থাকলে একটা সময়সীমার মধ্যে জুডিসিয়্যাল সেপারেশান এবং তারপর ডির্ভোস দুই হতে পারে। কিন্তু ভদ্রমহিলা বেঁকে বসেছেন বলে এর কোনোটাই হতে পারছে না।'

দীপ্তেন্দু বলল, —'এ তো তাহলে দারুণ সমস্যা।'

'সমস্যা নিশ্চয়। তবে এমনিতে আমাদের কোনো অসুবিধে নেই। মাঝে মাঝেই আমরা এদিক-সেদিক বেড়িয়ে আসি। কিন্তু ওই যা বললাম ইচ্ছে থাকলেও আমাদের বন্ধুত্বের একটা পরিণতি হয় নি।'

'বিয়ে হলেই বা কী অসুবিধে ছিল নীলিমাদি?'

'বা রে! বিয়ে হয়েছে জানলেই তো ভদ্রমহিলা স্বামীর বিরুদ্ধে বাইগ্যামির চার্জ আনতেন। হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করা আইনগ্রাহ্য অপরাধ।'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীলিমা দত্ত এবার উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, —'পুরো একঘণ্টা কাবার। একবার গল্পে জমে গেলে আমার আর অন্য কথা খেয়ালই থাকে না। চল চল, পি.টি. আই অফিস থেকে কাজ সেরে আবার রতিকান্ত বসুকে সব বলতে হবে।'

দীপ্তেন্দু অফিসে ফিরতেই টেলিফোন অপারেটর বলল, —'এই যে দীপ্তেন্দুবাবু, ঘণ্টাখানেক আগেই এক ভদ্রলোক আপনার খোঁজ করেছিলেন।'

'তাই নাকি? কী নাম বলল?'

'নাম তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে উনি আপনার অ্যাড্রেসটা চাইছিলেন। সেটা অবশ্য আমি এসটাবলিশমেন্ট সেকশনে জিজ্ঞেস করে ওকে জানিয়ে দিয়েছি।' এক মুহূর্ত থেমে অপারেটর আবার শুধোল, —'কোনো অন্যায় করিনি তো?'

'অন্যায় কিসের?' দীপ্তেন্দু হেসে উঠল। বলল,—'তবে সচরাচর কেউ আমার ঠিকানা চায় না।'

ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করবার জন্য অপারেটর আবার বলল,—'আমার তো মনে হ'ল আপনার কোনো বন্ধু-টন্ধু ফোন করেছেন। মানে যেভাবে আপনার নাম ধরে অফিসে খোঁজ করছিলেন।'

সন্ধ্যের পর মেসে ফিরতেই অবশ্য ঘটনাটা পরিষ্কার হ'ল। ঘরে ঢুকতেই তার রুম-সঙ্গী তিনকড়ি হাজরা বলল, —'ও মশায় আপনার একটা চিঠি আছে।'

'আমার চিঠি?' দীপ্তেন্দু অবাক হ'ল।

তিনকড়ি হাজরা বলল, —'এটা অবশ্য ডাকে আসেনি।'

'তবে?'

'একটা লোক দিয়ে গেছে। মেসের দরজা থেকেই নাম ধরে আপনার খোঁজ করছিল। আপনি এই ঘরে থাকেন শুনে চিঠির খামটা আমার হাতে দিয়ে গেল।'

খামটা হাতে নিয়েই দীপ্তেন্দুর মনে একটা খটকা লাগল। হাত বুলিয়েই এনভেলাপটা বেশ দামী বলেই তার ধারণা হ'ল। খামের ওপর তার নাম লেখা

হস্তাক্ষরটা দীপ্তেন্দুর খুব পরিচিত বলে মনে হ'ল না। বিলম্ব না করে লেফাফার মুখটা ছিঁড়ে ভেতরের চিঠিটা সে টেনে বের করল। চোখ বুলোতেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে উঠল দীপ্তেন্দু। অন্য কেউ নয়। পত্রলেখক তার বন্ধু হরিদাস পাল,—এখন রুপোলী পর্দার নায়ক তমালকুমার।

চিঠিতে লেখা—

প্রিয় দীপ্তেন্দু,

ফোন করে জানলাম তুই অফিসের একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছিস। কখন ফিরবি কেউ জানে না। অথচ তোকে খুব দরকার। তাই অফিস থেকে তোর ঠিকানাটা নিয়ে আমার Personal assistantকেই চিঠি দিয়ে পাঠালাম।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম শোন। আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা একবার আমার ফ্ল্যাটে আসতে পারবি? এই ধর সাড়ে সাতটা নাগাদ। ইলেকশনের খবর তো প্রায় সব বেরিয়ে গেল। এখন আর তেমন কাজের চাপ আছে নাকি? থাকলেও আগামীকাল সন্ধ্যেয় তোকে যেমন করে হোক আমার কাছে আসতে হবে। নিশ্চয় জানতে চাইবি, কী এমন কথা যা শোনার জন্য আমাকে তড়িঘড়ি সাড়ে সাতটা নাগাদ তোর ওখানে পৌঁছতেই হবে? আছে, কথা আছে বন্ধু। কিন্তু সেটা তোকে সাক্ষাতেই বলব। শুধু একটা কথা জানিয়ে রাখি। এতদিন তোর কাছে যে কাহিনী গোপন রেখেছিলাম কালই সেটা শুনতে পাবি।

তাহলে আগামীকাল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়। ভালবাসা রইল।

ইতি

হরিদাস

সমস্তদিনে নির্বাচনের সব ফলাফলই প্রায় জানা গেল। কংগ্রেস যে আবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে চলেছে ভোটের ফলাফলের গতিপ্রকৃতি দেখে শুরুতেই তা আন্দাজ করা গিয়েছিল। ওরই মধ্যে কেতুগ্রামে আবদুস সাত্তারের পরাজয় এবং চুঁচুড়ায় ভূপতি মজুমদারের হার কংগ্রেসকে একটা বড়সড় ধাক্কা দিয়ে গেল। অবশ্য কলকাতায় কংগ্রেস ফের পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছে। বিধানসভার ছাব্বিশটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস চৌদ্দটি আসনে জয়ী হয়েছে।

সাড়ে সাতটার আগেই দীপ্তেন্দু চিত্রতারকার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। বসবার ঘরে ঢুকতেই আগের দিনের সেই লোকটি তাকে দেখেই বলল, —'আপনি তো দীপ্তেন্দুবাবু, তাই না?'

দীপ্তেন্দু ঈষৎ হেসে জবাব দিল,—'হ্যাঁ আমি।'

লোকটি বলল, —'আমিই গতকাল সন্ধ্যে নাগাদ আপনার পাথুরিয়াঘাটার মেসে গিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে যিনি একই ঘরে থাকেন তারই হাতে চিঠিটা

দিয়ে এসেছিলাম।'

লোকটির দিকে তাকিয়ে দীপ্তেন্দু বলল, —'ওহ! গতকাল সন্ধ্যের পর তুমিই তাহলে পাথুরিয়াঘাটার মেসে গিয়েছিলে?'

তার কণ্ঠস্বর শুনেই হরিদাস ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। বলল,—'এসে গিয়েছিস? আয় আয়। তোরই জন্য অপেক্ষা করছি।'

পরনে একটা সাদা পায়জামা আর গায়ে পাতলা সার্ট। অবিন্যস্ত চুল। আজ আর বেশবাসের বাহার নেই হরিদাসের। সেদিন কাগজের ফিল্ম-সম্পাদককে ইণ্টারভ্যু দেবে বলেই সে খানিকটা সাজগোজ করে বেরিয়ে এসেছিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে হরিদাস ভেতরে চলে গেল। বলল,—'চল, আমরা লিভিং রুমে গিয়ে বসি।'

ঘরের ভেতর সোফা সেটে গা এলিয়ে দিয়ে দীপ্তেন্দু বলল,—'নে বল এবার। এত জরুরী তলব কিসের?' মুচকি হেসে সে ফের যোগ করল,—'আচ্ছা, আমি কি তোর মতো একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি? বুঝতেই পারছিস একটা ছোটখাটো কাগজের অফিসে রিপোর্টারের চাকরি করি। সম্পাদকের মর্জি-মাফিক চলতে হয়। নিউজ এডিটরের কাজটাও তিনিই দেখেন কিনা। আর কাগজের অফিসের চাকরি মানে সেই উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে। রাত আটটায় হঠাৎ যদি একটা প্রেস কনফারেন্স ডেকে বসে তাহলে সেটা কভার করতে অফিস থেকেই একজন রিপোর্টারকে তখুনি ছুটতে হবে।'

হরিদাস মৃদু হেসে জানাল—'আপাতত আরো দুটো দিন তোকে আসতে বলব। কলেজের বন্ধুবান্ধব বলতে এখন কারো সঙ্গেই তেমন যোগাযোগ নেই। শুধু তুই ছাড়া। অথচ এই ব্যাপারে তুই না এলে মনটা খুব ফাঁকা লাগবে।'

দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে তাকাল,—'ব্যাপার কী বলতো? কেমন রহস্যের আড়াল থেকে কথা বলছিস। চিঠিতে লিখলি এতদিন কী একটা কাহিনী তুই গোপন রেখেছিলি আজ সেটাই আমাকে শোনাবি।'

হরিদাস হেসে বলল,—'সেজন্যই তো তোকে ডেকেছি। কাহিনীটা যে লতা পল্লবিত হয়ে এমন সুন্দর রূপ নেবে তাই তো কোনোদিন ভাবতে পারিনি। তখন মনে হয়েছিল জীবনে এমন অকিঞ্চিৎকর কত ঘটনাই তো ঘটে। বুদ্‌বুদের মতো সেটা আবার মিলিয়ে যায়।'

ভেতর থেকে হরিদাসের বেয়ারা ট্রেতে করে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা আর ডিশে করে কাজু বাদাম এনে সামনে রাখল।

হরিদাস বলল,—'আর কিছু দিতে বলব? তুই তো অফিস থেকে এসেছিস। নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?'

'না রে। সাড়ে চারটের সময় আমরা একবার টিফিন করি। সেজন্যই আর খেতে ইচ্ছা নেই।'

'ঠিক আছে।' হরিদাস বলল,—'আটটা বাজলেই আমরা সোজা হোটেলে চলে যাব। রাত্তিরে দুজনে একসঙ্গে ডিনার খাব।'

'না—না।' দীপ্তেন্দু প্রায় প্রতিবাদ জানাল। বলল,—'আমি তো মেসে নো মিল

করে আসিনি। ভাতের থালা নিয়ে ঠাকুর সাড়ে নটা অব্দি বসে থাকবে।'

'তাতে কী হয়েছে? তুই এখান থেকে তোর সেই মেসে একটা টেলিফোন করে জানিয়ে দে আজ রাত্তিরে তোর নো মিল হবে।'

দীপ্তেন্দু চুপ করে আছে দেখে হরিদাস আবার বলল, 'ওহ্! বুঝতে পেরেছি। তোর মেসে বোধহয় টেলিফোন নেই?'

দীপ্তেন্দু ছেলেমানুষের মতো হাসল। বলল,—'আমার মেসে অনেক কিছুই নেই হরিদাস। যেমন ধর আলাদা স্নানের কোনো ঘর নেই। উঠোনে একটা বিশাল চৌবাচ্চায় সকাল-বিকেল করপোরেশনের জল আসে, তাতেই চৌবাচ্চাটা প্রায় ভরে যায়। আর দড়ি-বাঁধা ছোট বালতি ডুবিয়ে সেই জল তুলে আমরা হড়হড় করে গায়ে মাথায় ঢালি। এভাবেই তো এতদিন চলে এসেছে।'

হরিদাসকে নীরব দেখে দীপ্তেন্দু আবার বলল,—'শৌচাগারে অবশ্য গঙ্গার কলের জল আসে। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টাই জল। আর মেসের একখানা ঘরে দুটো সীট। সীট মানে চৌকি। সেই চৌকির ওপর একটা পাতলা তোষক পেতে আমাদের বিছানা হয়।'

হরিদাস বলল,—'রোনাল্ডসে হস্টেলেও তো আমরা এরকমই থাকতাম।'

'নাহ্,' দীপ্তেন্দু আপত্তি করল। বলল,—'রোনাল্ডসে হস্টেল এত নোংরা ছিল না। আর কলকাতার মেসবাড়ি তো তুই কোনোদিন দেখিস নি। অবশ্য এখন আর তোর সেরকম অভিজ্ঞতা হবার কেনো সুযোগ নেই।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কয়েকটা কাজু বাদাম সে মুখে ফেলে দিল। দু-একবার চিবিয়ে বলল, —'ভারী সুন্দর টেস্ট তোর এই কাজুবাদামের। দু একটা প্রেস কনফারেন্সে আগেও খেয়েছি। তবে তোর জিনিসটাই আলাদা।'

হরিদাস হাসতে হাসতে বলল, 'ফোন করলেই নিউ মার্কেটের একটা দোকান থেকে ওরা এটা পাঠিয়ে দেয়। এগুলো গোয়ানীজ কাজু। কলকাতায় পার্টিতে বা প্রেস কনফারেন্সে যা দেয় সেগুলো হয় দীঘার না হলে উড়িষ্যার মাল। দেখলেই চেনা যায়,—সাইজে একটু ছোট হয়। তাছাড়া কোয়ালিটি কাজু ইণ্ডিয়া ফরেনে এক্সপোর্ট করে। শুনেছি কয়েক হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আসে।'

দীপ্তেন্দু এবার বলল,—'নে তোর কী কথা আছে শেষ কর। সাড়ে আটটা নাগাদ বেরুলেও আমার মেসে পৌছতে দশটা বাজবে।'

'এত চিন্তা কিসের?' হরিদাস ভুরু কোঁচকাল। বলল,—'তোকে মেসে পৌছে দিয়ে আসব।'

'না-না। তার প্রয়োজন নেই।' দীপ্তেন্দু বাধা দিল।

হরিদাস বলল,—'কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার গল্প শেষ হলে তোকে গাড়িতে করে মেসে নামিয়ে দিয়ে আসব।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'তাহলে তোর সেই গোপন কাহিনী শুরু কর।'

হরিদাস সলজ্জ হাসল। বলল,—'ব্যাপারটার শুরু কিন্তু অনেকদিন আগে। বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজে আমরা যখন আই., এসসি. পড়তে ঢুকলাম। সেই কৈশোর

পেরিয়ে যৌবনে উপনীত হওয়ার বয়সে বোধহয় যুবতী মেয়েদের প্রথম দর্শনেই ভালো লাগে। সহপাঠিনী হলে তার আকর্ষণ তো আরো বেশি। হয়তো সেই কারণেই কণা দত্তকে দেখে আমার ভালো লেগেছিল। ছিপছিপে পাতলা চেহারা, ফর্সা রঙ। দূর আকাশে উড়ন্ত চিলের ডানার মতো প্রসারিত ভ্রূ। কণা যেদিন প্রথম অধ্যাপকের পিছু পিছু ক্লাসে ঢুকল সেদিন আমি অনেকক্ষণ অন্যমনস্কতার ভান করে আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। ক্লাসে ছাত্রীরা তখন প্রফেসরের সঙ্গে লেকচার রুমে ঢুকত। আবার তার সঙ্গেই বেরিয়ে যেত। ফলে ক্লাসের আগে বা পরে ওর সঙ্গে দেখা বা কথা বলার কোনো সুযোগই ছিল না। শুধুমাত্র ক্লাসে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া ওর মুখোমুখি হবার অন্য কোনো উপায় খুঁজে পাইনি। তবু মাঝে মাঝে ঈশ্বরেরও করুণা হয়। আর সেরকমই একটা আশ্চর্যজনক ঘটনায় কণা দত্তের সঙ্গে আমার সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল।'

দীপ্তেন্দু একটু অবাক হয়ে শুধোল,—'সেটা কোথায়?'

'হ্যাঁ, সেও এমন এক জায়গায় যেখানে কণা দত্ত কিংবা আমাকে কারো চেনার কথা নয়।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দীপ্তেন্দু বলল,—'তাহলে? জায়গাটা কোথায়? শুনতে ভারি ইণ্টারেস্টিং লাগছে।'

হরিদাস বলল,—'অচানক ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কোথায় জানিস? গড়বেতা স্টেশনে।'

'গড়বেতা স্টেশনে?'

'হ্যাঁ, ওটা ওয়াটারিং স্টেশন। ওখানে গাড়ি জল নেয়। প্রায় পনের মিনিট দাঁড়ায়। দুপুরের গোমো প্যাসেঞ্জার ধরে আমি মেদিনীপুর যাচ্ছিলাম। এক আত্মীয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে। বর্ধমান থেকে বাবার আসা সম্ভব নয় বলেই নিমন্ত্রণ রাখতে আমাকে যেতে হয়েছিল। তখন কী ছাই জানি ওই ট্রেনে কণা দত্তও খড়্গপুরে যাচ্ছে।'

দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল,—'তোর সঙ্গে দেখা হ'ল কেমন করে? দুজনে কি একই বগীতে উঠেছিলি?'

'নাহ্।' হরিদাস মাথা নাড়ল।

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'তবে?'

হরিদাস হেসে জবাব দিল,—'সেও একটা অ্যাকসিডেণ্ট বলতে পারিস। গড়বেতা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই চা খেতে ইচ্ছে করল। কম্পার্টমেণ্ট থেকে নেমে আমি টি-স্টলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাশেই খাবার জলের ট্যাপ ওয়াটার। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি একটা ছোট্ট ওয়াটার জাগ্ হাতে নিয়ে কণা দত্ত সেখানে জল নিতে এসেছে। বাঁকুড়া থেকে এতদূরে এসে কণা দত্তের সঙ্গে এমনি হঠাৎ দেখা হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। কাছে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলার প্রবল ইচ্ছে হ'ল। প্রথমটা অবশ্য সঙ্কোচ ছিল। যদি সে আবার অন্যরকম কিছু ভাবে? শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে ওর কাছে পৌঁছে গেলাম। আমাকে দেখেই কণা

দত্ত ভুরু তুলে শুধোল,—'আপনি এখানে?' মৃদু হেসে জবাব দিলাম,—'এই গাড়িতে আপনার সহযাত্রী।' গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে আলাপ করছি বুঝেও কণা দত্ত কিন্তু ব্যাজার হ'ল না। উল্টে জিজ্ঞেস করল,—'কতদূর যাবেন?' বললাম, 'মেদিনীপুর। আর আপনি?' সে জবাব দিল আরো দু-একটা স্টেশন বেশি, —'খড়্গপুর।'

দীপ্তেন্দু বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে মজার ঢঙে জানাল,—'বলিস কী? এ তো জমজমাট ব্যাপার!'

হরিদাস বলল,—'জলের পাত্র পূর্ণ করতে ওর দু'মিনিটও লাগল না। ওর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ বের করতে বললাম,—'আসুন না, এক কাপ চা খাবেন।' একটা ঢোক গিলে হরিদাস ফের শুরু করল,—'কণা দত্ত কিন্তু আপত্তি করল না। বলল, তা খেতে পারি।' টি-স্টলটার কাছেই একটা প্রকাণ্ড ঘোড়ানিমের গাছের ছায়ায় দুজনে চায়ের কাপ হাতে দাঁড়ালাম। আকাশে একটা কালো মেঘ ভাসতে ভাসতে অন্য দিকে চলে গেল। বোধহয় আমাদের ওপর কিঞ্চিৎ দয়াপরবশ হয়ে আর বৃষ্টি ঢালল না। নইলে একবার জল পড়তে শুরু করলে দুজনে নিশ্চয় যে যার কামরার দিকে দৌড় দিতাম।' হরিদাস একবার দীপ্তেন্দুর মুখের দিকে তাকাল। ফের বলল,—'জানিস, কণা দত্ত আমাকে জিজ্ঞেস করল মেদিনীপুরে যাচ্ছি কেন? ওকে বললাম, একটা অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ রাখতে। মানে বর্ধমান থেকে বাবা আসতে পারবেন না বলেই আমাকে যেতে হচ্ছে, কণা দত্ত অবশ্য নিজেই বলল,—'আমি যাচ্ছি খড়্গপুরে মাসতুতো দিদির বাড়ি। একদিন বাদেই অবশ্য ফিরে আসছি।' ওকে বললাম, 'আপনার সঙ্গে আর কে যাচ্ছেন?' সে জবাব দিল,—'আবার কে যাবে?' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কণা দত্ত প্রায় কটাক্ষ করে বলল,—'রেজাল্ট ভালো হলে সামনের বছর মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ব। তখন তো আমাকে একাই যাতায়াত করতে হবে।'

চায়ের কাপ শেষ হয়ে গেল। ট্রেন ছাড়তেও আর দেরি নেই। এবার বগীর মধ্যে ঢুকতে হবে। কিন্তু তার আগে কণা দত্ত হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল। বলল,—'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। কিছু মনে করবেন না যেন।' আমি হেসে জবাব দিলাম,—'না-না। মনে করব কেন? আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।' কেমন তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কণা দত্ত বলল, 'ক্লাসে বসে মাঝে মাঝেই আমার দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন কেন?' বেশ বুঝতে পারলাম যে কণা দত্তের কাছে আমি ধরা পড়ে গেছি। আমতা আমতা করে জবাব দিলাম, 'না মানে তাহলে আর তাকাব না।' কণা দত্ত মুখ ফিরিয়ে বলল,—'আমি কি সেকথা বলেছি? তবে কলেজের মেয়েরা বিশেষ করে আরতিটা এই নিয়ে বড্ড হাসাহাসি করে।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'তারপর?'

হরিদাস বলল,—'তারপর হঠাৎ ট্রেনের হুইসিল বাজল। তাড়াতাড়ি আমরা দুজনে কম্পার্টমেণ্টে গিয়ে উঠলাম। কণা দত্তের কামরাটা ঠিক আমার পাশে নয়। তবে একটা বগীর পরে। ঘণ্টাখানেক বাদেই গাড়ি মেদিনীপুরে দাঁড়াল। এখানে

প্রায় পাঁচ মিনিট স্টপেজ। আমার সঙ্গে একটা ব্যাগ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেটা হাতে নিয়েই আমি ওর কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই কণা দত্ত দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। শুধোল,—'আপনি ফিরবেন কবে?' বললাম, 'কালই।' তারপর ঈষৎ হেসে যোগ করলাম, 'আপনার সঙ্গে বোধহয় এমনি একা একা আর কোনোদিন দেখা হবে না।'

দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল,—'শুনে ও কী জবাব দিল?'

হরিদাস বলল,—'আমার আশঙ্কাকে নাকচ করে দিয়ে সে জানাল, 'কেন দেখা হবে না? এরপর নিশ্চয় কলকাতায় পড়াশুনো করবেন। তখন পথেঘাটে, কফি হাউসে, রেস্তোরাঁয় অমন কতবার দেখা হতে পারে। আর দুজনেই যদি মেডিক্যাল কলেজে চান্স পাই তাহলে তো আর কোনো বাধাই রইল না।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'তাহলে বাঁকুড়ায় থাকতে ওকে আর কোনোদিন একা পাস নি?'

'নাহ্।' হরিদাস ছোট্ট জবাব দিল। কী ভেবে আবার বলল,—'মেডিক্যাল কলেজে দুজনে একসঙ্গে পড়ব এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আর পরীক্ষার যা রেজাল্ট হবে সে তো জানাই ছিল। ওই রেজাল্ট নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে চান্স পাওয়া নিতান্তই দুরাশা। তাছাড়া টেস্টে যা নম্বর পেলাম সেও তো তুই জানিস। ফিজিক্সে ঢ্যারা। থিয়োরেটিক্যালে মাত্র পঁয়তাল্লিশ। প্রিন্সিপ্যাল তোকে আর আমাকে একসঙ্গে তার ঘরে ডেকে পাঠালেন। তুই মোট এক'শ আটষট্টি নম্বর পেয়ে ফিজিক্সে ফার্স্ট হয়েছিস বলে। আর আমি টেস্টে ফিজিক্সে ফেল করেছি তাই।' একটা ঢোক গিলে হরিদাস জিভটাকে ফের সচল করে নিয়ে বলল,—'তোর দিকে তাকিয়ে প্রিন্সিপ্যাল কী বললেন মনে আছে? আঙুল দেখিয়ে বললেন,—একে দ্যাখ। ফার্স্ট হয়েছে বলে ওর পরীক্ষার ফি'জটা কলেজ থেকে মকুব করে দেওয়া হয়েছে। আর তুমি সেই পেপারে সামান্য পাশ মার্কটুকুও পেলে না। তোমার ভবিষ্যৎ যে কত অন্ধকার তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'ওসব কথা বাদ দে। আচ্ছা, আর. জি. করে ডাক্তারি পড়ার সময় কণা দত্তের সঙ্গে তোর আর দেখা হয় নি?'

'একবার হয়েছিল।' হরিদাস জবাব দিল। 'কলকাতায় এসে আমি কণা দত্তের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। আমার এক বন্ধু মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তার কাছে কণা দত্তের নাম করতেই সে বলল, ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের এক দাদার সঙ্গে মেয়েটা ঘুরে বেড়ায়। একদিন দুজনে নাকি বট্যানিকসে গিয়েছিল। ছেলেরাই দেখেছে।'

দীপ্তেন্দু শুধোল—'তোর সঙ্গে দেখা হতে কী বলল?'

'কী আবার বলবে? আর জি. করের এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একদিন মেডিক্যাল কলেজে গিয়েছিলাম। করিডোরেই হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, আপনি আর জি করে ভর্তি হয়েছেন? কিন্তু সেকেন্ড ডিভিসন পেয়ে ওখানে চান্স পেলেন কেমন করে? বললাম, পেয়েছি যে করেই হোক। কণা দত্ত মুচকি হেসে

মন্তব্য করল, জানি ওটা নমিনেশন। মেডিক্যাল কলেজেও এ রকম ব্যবস্থা আছে শুনেছি। এখানে বলে চিফ্ মিনিস্টারের কোটা। সেটা যোগাড় করতে পারলে তো এখানেই ভর্তি হতেন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'তোর গল্পটা বড় দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এবার শেষ কর।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে ফের যোগ করল,—'আমাকে তো আবার মেসে ফিরে যেতে হবে।'

হরিদাস কেমন বিষণ্ণ হাসল। বলল,—'সব কথা কি এক নিশ্বাসে বলা যায় দীপ্তেন্দু? বিশেষ করে সেই কাহিনী যদি বীণার তারের একটি বিলম্বিত লয়ে বাঁধা থাকে।' মাথার চুলগুলি আঙুল দিয়ে পিছনে ঠেলে সে আবার শুরু করল,— 'তারপর তো আমি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে পুরোপুরি ফিল্ম লাইনে চলে গেলাম। তাই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি। বাবার রাগ। প্রয়োজনে আমাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবার হুমকিও দিয়েছেন। কিন্তু ওরই মধ্যে আমার প্রথম ছবি শুভার সংসার বাজারে হিট করল, সুখ্যাতি পেল। আমি অবশ্য ছবির নায়ক ছিলাম না। তবু ওই ছবিতে আমার প্রচার এবং সুনাম দুই হ'ল।'

'তাহলে কণা দত্তের সঙ্গে আবার তোর দেখা হ'ল কবে?'

'দেখা হয় নি। তবে আমি ওর খোঁজখবর রাখতাম। হঠাৎ আমার এক পুরানো বন্ধুর কাছে শুনলাম। ডাক্তারি পাশ করে কণা দত্ত বাঙ্গুর হাসপাতালে জয়েন করেছে। তবে সে এখন আর কণা দত্ত নয়।'

'তাহলে?'

হরিদাস জবাব দিল,—'একটি পাঞ্জাবি ছেলেকে বিয়ে করে কণা দত্ত তখন কণা সিং হয়েছে। তোকে মিথ্যে বলব না, খরবটা শুনে আমি মুষড়ে পড়লাম। দু-তিন রাত্তির ভালো করে ঘুমোতে পারিনি। অথচ, ভেবে দ্যাখ, এতে আমার মন খারাপ করবার কী আছে? সেই অর্থে কণা দত্তের সঙ্গে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। যা ঘটেছিল, that was an one-side affair। তাছাড়া ফার্স্ট এম. বি. বি. এস পরীক্ষায় না বসে আমি তো ডাক্তারি পড়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক তখন চুকিয়ে দিয়েছি। আর ফিল্ম জগতে আমি নবাগত। নাম-ডাক দূরে থাক হাতে গোনা দু-তিনটে ছবিতে সাইড-রোল ছাড়া আমি আর বেশি কী করতে পেরেছি? সুতরাং আমার সম্বন্ধে কণা দত্তের তেমন আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিয়ে তো টেকে নি। তুই বলেছিলি একই ছাদের নীচে ওরা দুজনে আলাদা বাস করে। আলাদা ঘর, আলাদা বিছানা, আলাদা জীবন।'

হরিদাস বলল,—'হ্যাঁ, সেই কথাই তোকে বলেছিলাম। ছবি দেখতে এসে কণা দত্ত আমাকে চিনতে পারল। তারপর আমাকে ওর বাড়িতে যেতে লিখল। কিন্তু নানা দিক চিন্তা করে আমি সে পথ মাড়াই নি।'

'তাহলে?' দীপ্তেন্দু শুধোল,—'কণা দত্তের সঙ্গে তোর আর দেখা হয় নি?'

'দেখা হয়েছে বৈকি। আর সেটা জানাব বলেই তো তোকে আজ ডেকে পাঠিয়েছি।'

দীপ্তেন্দু চোখ বড়ো করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল।

হরিদাস বলল,—'কয়েকদিন বাদেই সকালবেলা আমার টেলিফোনটা ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলতেই টেলিফোনে নারী কণ্ঠ ভেসে এলো। প্রথমে মনে হ'ল কোনো ফিল্ম ফ্যান-ট্যান হবে। সিনেমা ম্যাগজিনের অফিস থেকে কৌশলে আমার পার্সোনাল নম্বরটা জোগাড় করেছে। একবার ভাবলাম লাইনটা ছেড়ে দিই। তারপর কী মনে হতে সাড়া দিলাম, —হ্যালো।

সে শুধোল, 'আপনি কি হরিদাসবাবু মানে তমালকুমার? ওর মুখে আমার পিতৃদত্ত নামটা শুনে কৌতূহল বাড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আমাকে চেনেন?' শুনে উপচে-পড়া ঝর্নার ধারার মতো সে একটানা অনেকক্ষণ হাসল। তারপর কথা কইল; 'চিনি বলেই তো টেলিফোন করলাম।' আমি কিছুটা অবাক। কে ফোন করল সাতসকালে? যে আমার মা-বাবার দেওয়া নামটা ভালোমত জানে। মেয়েলী ঢঙে সে শুধোল,—'আচ্ছা, অনেকদিন আগে গড়বেতা স্টেশনে এক অলস দ্বিপ্রহরে একটা প্রকান্ড নিমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে চা খাওয়ার কথা কি আপনার মনে পড়ে? আর বুঝতে অসুবিধে হয় নি। এ কণা দত্ত ছাড়া অন্য কেউ নয়। তবু জিজ্ঞেস করলাম 'আপনি কি মিসেস সিং মানে কণা সিং কথা বলছেন?' শুনে সে কিন্তু আবার হেসে উঠল। উপল বিকীর্ণ জলধারার মতো খিলখিল হাসি। বলল,—'আপনি তো দেখছি আমার সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন। তবে একেবারে সাম্প্রতিক মানে লেটেস্ট নিউজটা আপনার জানা নেই। সেটা হ'ল আমি এখন আর মিসেস সিং নই। আবার কণা দত্ত,—এই নামে ফিরে গিয়েছি।'

দীপ্তেন্দুর মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে হরিদাস বলল,—'মনের ভিতর হঠাৎ যেন একটা উথাল-পাথাল করা খুশির জোয়ার কানায় কানায় দুই কূল ছাপিয়ে গেল। কণা দত্ত নিজেই বলল, এখন তো আর আমার সঙ্গে দেখা করতে কোনো বাধা নেই। বললাম, নাহ্। গড়বেতা স্টেশনে সেই কুক্-কুক্ পাখি-ডাকা দুপুরটার পর আমি শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রহর গুনেছি। সে হেসে জবাব দিল, তাহলে আর দেরি কেন? আসুন না আজই বিকেলে কোথাও বসে জমিয়ে গল্প করি।'

হরিদাস বলল,—'জানিস দীপ্তেন্দু,—এক-একটা সময় আসে যখন মানুষের হঠাৎ ঈশ্বরের ওপর গভীর বিশ্বাস জন্মায়। ওর প্রস্তাব শুনে আমার সেই অবস্থা হ'ল। তাহলে এতদিন মনে মনে যা চেয়েছি, বীজের মতো যা অন্তরের গভীরে লুকোন ছিল আজ ঈশ্বরের কৃপায় তারই অঙ্কুরোদ্গম হতে চলেছে।'

দীপ্তেন্দু ওর পিঠ চাপড়ে বলল,—'কনগ্র্যাচুলেশনস্, ঈশ্বর দেখছি সব দিক থেকেই তোর ওপর সদয় হয়েছেন।'

'তা সত্যি', হরিদাস কেমন উত্তাপ ভরা গাঢ় কণ্ঠস্বরে তাকে সমর্থন জানাল। বলল,—'শোন। কণা দত্তকে তোর কথা বলেছি। মেডিক্যাল কলেজে কোন পেশেন্টকে নিয়ে যেন গিয়েছিলি। হাউস-স্টাফ হিসেবে ওই নাকি তাকে ভর্তি

করেছিল। ভদ্রমহিলা অবশ্য বাঁচেন নি। ভেরি স্যাড কেস।'

দীপ্তেন্দু জবাব দিল—'হ্যাঁ। উনি মাধুরীবৌদি। অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো যায় নি। টিউবে প্রেগন্যান্সি,—ফলে tube rupture করে।'

হরিদাস বলল,—'কণা দত্ত তোকে মিট করতে চায়। খুব শীগ্‌গীর। আমাকে বলেছিল, একদিন তোমার বন্ধুকে ডিনারে নিমন্ত্রণ কর। তিনজনে বসে খেতে খেতে খ্রীশ্চান কলেজের সেই হাসিতরল দিনগুলির স্মৃতিচর্চা করব।'

দীপ্তেন্দু আপত্তি করল,—'না-না। তাই কী হয়? তোর আর কণা দত্তের সঙ্গে আমি? ধুর! সে ভারি বিশ্রী হবে।'

'বিশ্রী কেন? পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সকলেরই দেখা করার ইচ্ছে হতে পারে। It's most natural। তাহলে টেলিফোনে জানাবি তুই কবে সময় দিতে পারছিস।'

'দেখি কবে পারি।' দীপ্তেন্দু আলগা কথা কইল।

'তার মানে? 'হরিদাস ভুরু কোঁচকাল। বলল—'ও রকম জবাব দিলে হবে না, একটু ভেবে দ্যাখ, সকলেরই তো একটা ডিউটি থাকে। যেমন ধর কণা দত্তকে মাঝে মাঝে হাসপাতালের ডিউটি-অফিসারের কাজ করতে হয়। সেদিন বাড়ি ফিরতে অনেক রাত্তির,—এগারোটা-বারোটা বেজে যায়। আর আমারও শুটিঙ থাকলে কি রাত নটার আগে বাড়ি ফিরতে পারব? সুতরাং পরশু দুপুরেই আমাকে টেলিফোনে করে জানাবি, কবে তুই ফ্রি আছিস।'

দীপ্তেন্দু বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে উঠি এবার।'

'উঠবি মানে? তোকে আমি মেসে পৌছে দেব বলেছি। এখন কটা বাজে দ্যাখ,—রাত নটা। ট্রাম-বাস ধরে তোর সেই পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে পৌছতে রাত্তির এগারোটা বাজবে সুতরাং কথা না বলে সোজা গাড়িতে গিয়ে বসবি।'

হরিদাসের ঝকঝকে নতুন স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডটা মেসের দরজায় দাঁড়াতেই ভেতরে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে হরিদাস বলল,—'এসেছি যখন, চল তোর রুমটা একবার ঘুরে যাই।'

হরিদাসকে ঢুকতে দেখে তিনকড়ি হাজরা বিছানা ছেড়ে উঠে বসল।

মুচকি হেসে দীপ্তেন্দু বলল,—'চিনতে পারছেন একে? ফিল্মস্টার তমালকুমার।'

তিনকড়ি হাজরা উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে নমস্কার করল।—বলল,—'আপনার মতো মানুষ এই মেসবাড়িতে এসেছেন, আমি তো ভাবতেও পারছি না স্যর।'

ইতিমধ্যে ঘরের দরজায় মেসের ঠাকুর, কাজের লোকের সঙ্গে দু-একজন বোর্ডারও উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। বেগতিক দেখে দীপ্তেন্দু তাড়াতাড়ি বলল,—'রাত অনেক হ'ল। তুই বরং এখন আয়। আর হ্যাঁ, পরশু তোকে নিশ্চয় টেলিফোন করে জানাব।'

বাইরে অপেক্ষমাণ গাড়িতে হরিদাসকে তুলে দিয়ে মেসে ফিরতেই তিনকড়ি হাজরা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল,—'আজ মেসবাড়িতে এ কাকে এনেছিলেন দাদা? আমি তো ভাবতেও পারিনি। তমালকুমারের সঙ্গে ইয়ে মানে আপনার এত খাতির।'

জীবন চক্রবর্তী ঘরের বাইরে থেকে টিপ্পনী কাটল,—'আপনি বরং বন্ধুকে বলে তিনকড়ি বাবুকে ফিল্মে একটা সুযোগ করে দিন।'

দীপ্তেন্দু হাসছিল। তিনকড়ি হাজরা বলল,—'ইচ্ছে করলে উনি সেটা পারেন বৈকি। তবে সত্যি বলি দাদা, গ্রামে থাকতে আমাদের বেওনিয়া যাত্রা পার্টিতে আমি সেনাপতির রোল করেছি।'

'আরিব্বাস! তাহলে তো আর কথাই নেই।' জীবন চক্রবর্তী সরস মন্তব্য করল। বলল,—'আপনি চেষ্টা করুন দীপ্তেন্দুবাবু। নিদেন পক্ষে একটা এক্সট্রার রোলে।'

বাইরে সমস্বরে একটা হাসির রোল উঠল।

শনিবার সকালেই দীপ্তেন্দুর একটা টেলিফোন এলো। অপারেটর তার খোঁজ করে বলল,—'নিন, কথা বলুন। উনি আপনাকে খুঁজছেন।'

সাড়া দিতেই অপরপ্রান্ত থেকে অগ্নিবীণা একটু রাগের সঙ্গে জানাল,—'কী ব্যাপার দীপ্তেন্দুদা? অফিসে আপনাকে তো পাওয়াই যায় না।'

'তাই নাকি? তুমি এর আগেও ফোন করেছিলে?'

'হ্যাঁ মশায়। একবার নয়, দুবার। পরশু এবং গতকালও। টেলিফোন করতেই অপারেটর উত্তর দিল, আপনি নাকি কাজে বেরিয়েছেন। তাই ওঁর পরামর্শ মতো আজ সাত সকালেই ফোন ধরেছি।'

দীপ্তেন্দু একটু হাসল। বলল, 'উপায় নেই বুলু। রিপোর্টারের চাকরি, তার কি কোনো কালাকাল আছে? প্রয়োজন হলেই ছুটতে হয়। সকালে অফিসে ঢুকে সম্পাদক কিংবা চিফ্ রিপোর্টারের কাছে খোঁজ নিই, কোথায় কোথায় যেতে হবে।'

টেলিফোনের তারে অগ্নিবীণার গলা ভেসে এলো। বলল,—'আমি ভেবেছিলাম নির্বাচনী ফলাফল বেরিয়ে গেলেই বুঝি আপনার কাজের চাপ কমে যাবে।'

'কাগজের অফিসে কাজের কি শেষ আছে বুলু?' দীপ্তেন্দু তাকে বোঝাল। বলল, 'যাক ওসব কথা। এখন দাদু কেমন আছেন বলো।'

'শরীর খুব যে একটা ভালো তা নয়। তবে মোটামুটি।' অগ্নিবীণা জবাব দিল। শেষে বলল,—'ভাবছি একবার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে মেডিসিনের ডিরেক্টর প্রফেসরকে দেখিয়ে তার একটা অ্যাড্‌ভাইস নেব। কিন্তু দাদু যে কথা শুনতেই চান না।'

জবাবে দীপ্তেন্দু কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই অগ্নিবীণা বলল,—'দাদুই আপনাকে ফোন করতে বলেছেন। অনেকদিন তো আসেন নি। তাই আগামীকাল রবিবার সকালে অবশ্যই যেতে বলেছেন।'

দীপ্তেন্দু ঈষৎ অভিমান এবং একটু মজা করে জানাল, 'দাদু বলেছেন, তুমি কিন্তু আমাকে যেতে বলনি বুলু।'

'আমাকেও মুখ ফুটে সে কথা বলতে হবে বুঝি? আশ্চর্য মানুষ আপনি দীপ্তেন্দুদা! এই সহজ কথাটা মুখে না বললে স্পষ্ট হয় না বুঝি?'

দীপ্তেন্দু তাড়াতাড়ি বলল, —'কিছু মনে ক'র না বুলু। ওটা তোমাকে রাগিয়ে

দেবার জন্য বলেছি। বিশ্বাস কর আমি আগেই ভেবেছি রবিবার সকালে তোমাদের বাড়ি যাব। দাদুকে সে কথা জানিও, কেমন?'

অগ্নিবীণা বলল,—'মেসে কিন্তু নো মিল করে আসবেন। ভুলে যাবেন না যেন।'

'এটাও কি দাদু বলে দিয়েছেন?' দীপ্তেন্দু ফের ওকে রাগাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু অগ্নিবীণা খোঁচাটা গায়ে মাখল না। সে হেসে উত্তর দিল, 'না মশায়। ধরে নিন ওটা আমি বলেছি, কিন্তু দাদু নেমন্তন্ন না করলে আপনি বুঝি এখানে খাবেন না?'

'কে বললে সে কথা?' দীপ্তেন্দু প্রায় প্রতিবাদ জানাল। বলল,—'তুমি ঠাট্টাও বোঝ না বুলু? দোহাই তোমার, এই নিয়ে দাদুকে কিছু বলতে যেও না যেন।'

'তাহলে ওই কথা রইল।' অগ্নিবীণা এক মুহূর্তে থামল। তারপর কিঞ্চিৎ অভিমান মিশ্রিত কণ্ঠে জানাল,—'আপনি আসুন দীপ্তেন্দুদা। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। দেখা হ'লে বলব।'

কী মনে হতে দীপ্তেন্দু শুধোল,—'তোমার নিশ্চয় কণা দত্তকে মনে আছে বুলু?'

'কণা দত্ত মানে? মেডিক্যাল কলেজের কণাদি? যিনি মাধুরীবৌদিকে ইমার্জেন্সি থেকে বেডে পাঠিয়ে ইমিডিয়েট অপারেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন?'

দীপ্তেন্দু সন্তুষ্ট হয়ে জানাল,—'তোমার দেখছি সব মনে আছে।'

'বারে! মনে থাকবে না কেন?' দীপ্তেন্দুর কথা শেষ হতেই অগ্নিবীণা আবার বলল,—'শেষ পর্যন্ত আমরা তো আর মাধুরীবৌদিকে বাঁচাতে পারি নি।'

'জানি।' দীপ্তেন্দু দুঃখের সঙ্গে কথা কইল। বলল,—'তোমরা তো আর চেষ্টার ত্রুটি করনি।'

অগ্নিবীণা শুধোল,—'কিন্তু কণাদির কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করছেন কেন? তার সঙ্গে কি আপনার কোথাও দেখা হয়েছে?'

'নাহ্। দেখা হয় নি।' দীপ্তেন্দু সংক্ষিপ্ত হতে চাইল। বলল,—'তবে সে, এক বৃত্তান্ত। দেখা হলেই জানতে পারবে।'

৷৷ দশ ৷৷

ডাফ স্ট্রীটের মুখে পৌঁছতেই দীপ্তেন্দু টের পেল ব্রজবিলাস সরকারের বৈঠকখানায় রীতিমত আড্ডা জমেছে। দরজার কাছে দাঁড়াতেই সে লক্ষ করল ঘরের ভেতর ব্রজবিলাস একা নন। আরো তিনজন রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন অবশ্য দীপ্তেন্দুর চেনা। উনি পরাশর দত্ত। বাঁকুড়ার একটি মফস্বলের কেন্দ্র থেকে সদ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন।

দরজার ফাঁকে দীপ্তেন্দুর মুখখানা ভেসে উঠতেই ব্রজবিলাস সহর্ষে ঘোষণা করলেন,—'আরে দীপ্তেন্দু যে, এসো, এসো। তোমার আসা-পথ চেয়েই তো আমরা বসে আছি।'

দীপ্তেন্দু ঘরে পা রাখতেই উপস্থিত অন্য দুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরাশর বললেন,—'একে নিশ্চয় চিনতে পারছ না তোমরা?' দুজনেই কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

ব্রজবিলাস নিজেই বললেন,—'এ হ'ল দীপ্তেন্দু,—দীপ্তেন্দু চট্টোপাধ্যায়। আমাদের গ্রামের ছেলে, রীতিমত মেধাবী ছাত্র ছিল। এখন বঙ্গভূমি কাগজের জার্নালিস্ট,—মানে সাংবাদিকতা করছে।'

কাগজের নাম শুনেই একজন অস্ফুটে বলল,—'বঙ্গভূমি কাগজ? আপনি ওখানে কতদিন আছেন?'

অন্যজন বলল,—'কতদিন আছেন একথা জিজ্ঞেস করছ কেন? কাগজটাই তো নতুন।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, নতুন বৈকি। আর নতুন কাগজ বলেই তো এখানে চাকরিটা পেলাম। তবে চাকরিতে আমার এখনও এক বছর পূর্ণ হয় নি।'

ব্রজবিলাস প্রশংসার সুরে বললেন,—'নতুন চাকরি হলে কী হবে? ওর যা রিপোর্টিং। নির্বাচনী সমীক্ষায় যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।'

পরাশর সহাস্যে বললেন,—'দেখলে তো দীপ্তেন্দু। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস এখনও কত জনপ্রিয়। এবারে মোট ১৫৭টি সীট কংগ্রেসের দখলে। অথচ ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ১৫০টির বেশি আসন পায় নি। তারপর ১৯৫৭ সালে আর মাত্র দুটি আসন বেশি। কিন্তু ১৯৫২ সনের ভোটে কংগ্রেসের জয়জয়কার বলতে পার। সাকুল্যে ১৫৭টি সীট।'

দীপ্তেন্দু ঈষৎ হেসে জানাল—'জনপ্রিয়তার নিরিখে শুধু কংগ্রেসই যে শক্তিমান হয়েছে তা কিন্তু নয় পরাশর দাদু। পশ্চিম বাংলার মাটিতে কম্যুনিস্টরাও যে তাদের শক্তি বাড়িয়ে চলেছে তা এক নজরেই বোঝা যায়। যেমন ধরুন ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কম্যুনিস্টরা বিধানসভায় পেয়েছিল মাত্র ২৮টি আসন। ১৯৫৭ সনে তা বেড়ে হয় ৪৬টি আসন। আর ১৯৫২ সালের ভোটে তা সহজেই অর্ধশতে পৌঁছে গেছে। এরপর ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কার শক্তি যে বেশি হবে তা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারবে।'

শুনে পরাশর হাসতে লাগলেন। বললেন, তুমি অবশ্য একটু বাম-ঘেঁষা দীপ্তেন্দু। কিন্তু কম্যুনিস্টরা যতই চেষ্টা করুক, পশ্চিম-বাংলা বিধানসভায় কংগ্রেস এখনও বহুদিন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে পারবে।'

ব্রজবিলাস বাধা দিয়ে বললেন,—'আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে অত হাল্কাভাবে নেওয়া উচিত হবে না। দেশে সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষ দিন দিন দানা বাঁধছে, আর তারই পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে বিপক্ষ দলগুলি। স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্তক্ষয়ী লড়াই ছাড়া পরবর্তী কালে কংগ্রেস আর তেমন কী করতে পেরেছে বলো? ফলে সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ। স্বাধীনতা আন্দোলনের দোহাই দিয়ে কতদিন আর ভোট চাইতে পারে দল? আর মানুষই বা সে কথায় ভুলবে কেন?'

তার সপক্ষে দীপ্তেন্দু আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘরে ঢুকে অগ্নিবীণা এমন একটা উত্তেজনাকর আলোচনায় জল ঢেলে দিল। বলল,—'যা হবার সেটা তো হয়েই গেছে দাদু। তোমরা জিতে গিয়েছ। এখন আর ওই হারজিতের কচকচানি করে কোনো লাভ আছে?' তারপর আড়চোখে দীপ্তেন্দুকে লক্ষ্য করে বলল, '—ভেতরে আপনার জলখাবার দেওয়া হয়েছে দীপ্তেন্দুদা। চলুন খেয়ে নেবেন।'

ব্রজবিলাস ঈষৎ হেসে জানালেন,—'কিন্তু মহারানী, তোমার পরাশরদাদু আর ওঁদেরও আর এক কাপ চা খাইয়ে দাও।'

'সেই সঙ্গে তোমাকেও হাফ-কাপ, তাই না দাদু?' অগ্নিবীণা ঘাড় ফিরিয়ে প্রায় কটাক্ষ করল। বলল,—'চিন্তা নেই। তিন কাপ চা এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর তোমার জন্যে শুধু ডবল-হাফ।'

দীপ্তেন্দু বাড়ির ভিতরে যেতেই অগ্নিবীণা তাকে প্রায় শাসন করে বলল,—'বাড়ি ঢুকেই আপনি ওদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠলেন? আচ্ছা, কংগ্রেস যদি এখনও বহুদিন রাজ্যের শাসন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকে, তাতে আপনার কী যায়-আসে বলতে পারেন? তাছাড়া কংগ্রেস কিংবা কম্যুনিস্ট যার হাতেই শাসন ক্ষমতা থাকুক না কেন, তাতে আপনার কিংবা আমার মতো সাধারণ মানুষের খুব যে একটা সুরাহা হবে বলে তো আমার মনে হয় না।'

দীপ্তেন্দু সে কথার জবাব না দিয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বসল। অন্যদিনের মতোই কাচের প্লেটে সাত-আটটা ফুলকো লুচি। তেল জবজবে বেগুন ভাজা। এক পাশে রসগোল্লা।

দীপ্তেন্দু মজা করে বলল,—'দুপুরের খাওয়াটা এখনই সেরে নিতে বলছ বুলু?'

'তার মানে?' অগ্নিবীণা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল। বলল,—'এই কটা লুচি খেলে আপনি বুঝি আর দুপুরে লাঞ্চ করতে পারবেন না?'

তাকে আশ্বস্ত করে অগ্নিবীণা আবার বলল,—'ঘড়ির দিকে একবার তাকান। এখন মোটে সাড়ে নটা বাজে। দুপুরের খাওয়া সেই বেলা একটার পর। ততক্ষণে এই কটা লুচি নিশ্চয় হজম হয়ে যাবে।'

দীপ্তেন্দুর খাওয়া শেষ হতেই অগ্নিবীণা বলল,—'আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, আর তাই নিয়ে একটু আলোচনা হওয়া দরকার।'

বেসিনের জলে মুখ ধুয়ে দীপ্তেন্দু তোয়ালেটা টেনে নিল। কথাটা অগ্নিবীণার মুখ থেকে আলগোছে বেরিয়ে এলেও বিষয়টা যে সিরিয়াস তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না তার।

অগ্নিবীণা ইঙ্গিতে তাকে সেই পড়ার ছোট্ট ঘরটায় নিয়ে গেল। টেবিলে কিছু ডাক্তারির বইপত্র ছড়ানো। বোঝা গেল এই ঘরেই অগ্নিবীণা এখনও পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে অগ্নিবীণা অনুরোধ করল,—'বসুন।'

দীপ্তেন্দু চেয়ারে বসেই বলল,—'কী কথা যেন বলতে চেয়েছিলে?'

অগ্নিবীণা অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল,—'সৌম্যকান্তি আমাকে একটা চিঠি লিখেছে।'

'তাই নাকি?' দীপ্তেন্দু অস্ফুটে শুধু এইটুকু বলল,—'এতদিন বাদে সৌম্যকান্তি মানে—'

অগ্নিবীণার স্বামী তার বউকে চিঠি লিখেছে শোনার পব কী বলা উচিত দীপ্তেন্দু সেটাই ভেবে পাচ্ছিল না।

অগ্নিবীণা আবার বলল,—'চিঠিখানা আপনি দেখবেন?'

'আমি?' দীপ্তেন্দুকে হঠাৎ যেন নার্ভাস দেখাল। সে আগের মতোই ইতস্তত করে বলল,—'ইয়ে মানে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর চিঠি আমি দেখব? মানে ওই চিঠিটা পড়া কি উচিত হবে আমার?'

'ইচ্ছে করলে আপনি দেখতে পারেন।' অগ্নিবীণা একটা সিরিয়াস ভাব করে তাকাল। শেষে বলল,—'চিঠি পড়ে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এই মানুষটাই রাত দুপুরে আকণ্ঠ মদ গিলে মাতাল হয়। গভীর নিশীথে নিঃশব্দে স্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে সকলের অগোচরে রক্ষিতার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'চিঠিতে এসব কথা নিশ্চয় লেখা নেই?'

'তাই কখনও থাকে?' অগ্নিবীণা বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল। বলল,—'চিঠিটা পড়েই দেখুন না স্ত্রীব জন্য কত ভালবাসা আর দরদ ভদ্রলোকের হৃদয়ে লুকোন আছে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'গোটা চিঠিটা পড়ার চেয়ে তুমিই ওর কিছু অংশ না হয় পড়ে শোনালে।'

'তার কোনো দরকার নেই।' অগ্নিবীণা বাধা দিয়ে বলল,—'আমি চিঠিটা রেখে গেলাম। এই ঘবে বসে আপনি ওটা পড়ে নিন। তারপর আমার কী করা উচিত সেটাই আলোচনা করা যাবে।'

টেবিলের ওপর লেফাফাখানি চাপা দিয়ে রেখে অগ্নিবীণা বেরিয়ে গেল। দীপ্তেন্দু প্রথমে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল। পরস্ত্রীর চিঠি পড়া তার উচিত হবে কি না এই চিন্তাটাই অন্ধকার রাত্রে দোদুল্যমান গাছের ছায়ার মতো বারবার তার মনে উঁকি দিয়ে ফের সরে যাচ্ছিল। কিন্তু মনের অদম্য কৌতূহল বেশিক্ষণ তাকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দিল না। তারপর হঠাৎ একসময় সব সঙ্কোচ কাটিয়ে দুই আঙুলের সাহায্যে খামের ভেতর থেকে অগ্নিবীণাকে লেখা তার স্বামীর পত্রখানি সে বের করে আনল। সুন্দর নীল রঙের কাগজে প্রায় দেড় পাতা ধরে লেখা চিঠি, যাকে নাকি অনায়াসে প্রেমপত্র বলা চলে। নেহাৎ সৌম্যকান্তির লেখা অক্ষরগুলি একটু বড়ো। নইলে এই চিঠিখানা পড়তেই দীপ্তেন্দুর বেশ খানিকটা সময় লাগত। দীপ্তেন্দু পড়ছিল—

প্রিয়তমাসু,

কলকাতায় গিয়ে অব্দি তুমি কোনো চিঠি দাও নি। ঠিকাদারির কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে এর আগে আমারও পত্র লেখা হয় নি। প্রায় বছরখানেক হতে চলল তুমি জলপাইগুড়ির বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছ। প্রথমে চা বাগানের হাসপাতালে কোম্পানীর কোয়ার্টার্সে। তারপর কলকাতায় গিয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট করবে বলে

চাকরি থেকে দু-বছরের স্টাডি লিভ নিয়ে তোমাদের ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে আছ।

তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমি কিছু কথা বলতাম। যে কারণে হঠাৎ একদিন সকালে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া স্থির করলে তা আমরা কিছুটা অনুমান করেছিলাম। কিন্তু মনে একটা আশা ছিল যাবার আগে তুমি নিশ্চয় এই বিষয়ে মা কিংবা আমার সঙ্গে একটা আলোচনায় বসবে। তার পরিবর্তে সিদ্ধান্তটা নেহাৎই একতরফা হল এবং আমাদের কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তুমি সেটাই করে বসলে।

আমাদের ধারণা হঠাৎ উত্তেজনার বসে তুমি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ। এবং তোমাকে বুঝিয়ে বললেই হয়তো তোমার মনের পরিবর্তন হবে। এবং তখন নিশ্চয় তোমার জলপাইগুড়ি ফিরে আসতে আর কোনো আপত্তি থাকবে না।

মা বলেন, এক সঙ্গে রাখলে দুটো বাটিতেও ঠোকাঠুকি লাগে। তা স্বামী-স্ত্রী তো জলজ্যান্ত মানুষ। তাদের মধ্যে মতের অমিল কিংবা ভুল বোঝাবুঝি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না।

তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় রইলাম। এক একসময় তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। আশা করি এই চিঠি পড়ার পর তুমি আর আমাকে ভুল বুঝবে না।

ভালবাসা আর তোমার রক্তিম দুই গণ্ডে প্রেমের চুম্বন।

ইতি
তোমার স্বামী
সৌম্যকান্তি

চিঠিখানা একবার নয়, দুবার পড়ল দীপ্তেন্দু। অগ্নিবীণা ঠিকই বলেছে, এই চিঠি পড়লে কারো মনে হবে না যে তার স্বামী রাত দুপুরে একটা বেহেড মাতাল হয়ে ওঠে কিংবা গভীর নিশীথে স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে অন্য নারীর সঙ্গে মদির আসক্তিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। বরং তার স্বামী যে একজন সহৃদয়, স্ত্রীর প্রতি দায়বদ্ধ পুরুষ, হঠাৎ কোনো ভুল করে বসলেও সেটা মিটিয়ে নিতে প্রয়াসী, চিঠিতে চোখ বুলোলেই তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

চিঠিখানা লেফাফার ভেতর ঢুকিয়ে দীপ্তেন্দু এসব কথাই চিন্তা করছিল। হঠাৎ কার পায়ের শব্দ কানে যেতেই চোখ তুলে তাকিয়ে সে দেখল, অগ্নিবীণা লঘুচরণে ঘরে এসে ঢুকেছে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অগ্নিবীণা সোজাসুজি প্রশ্ন করল,—'চিঠিখানা পড়েছেন?'

একটু ইতস্তত করে দীপ্তেন্দু জবাব দিল,—'হ্যাঁ, পড়ে ফেললাম।'

'কেমন লাগল চিঠিখানা?' অগ্নিবীণা ফের জিজ্ঞেস করল।

'খুব সুন্দর।' দীপ্তেন্দু সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল,—'আমার তো মনে হয় নিজের অন্যায় আচরণের জন্য ভদ্রলোক এখন

অনুতপ্ত এবং সে কারণে তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।'

অগ্নিবীণা চোখ কুঁচকে তার দিকে এক পলক তাকাল। বলল,—'কেউ যদি শুধু চিঠিটা পড়ে সৌম্যকান্তির সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে চায় তাহলে আপনি যা বলেছেন তার মুখ থেকেও হয়তো সেটাই শুনব। কিন্তু দীপ্তেন্দুদা, শেকস্‌পীয়ের সেই যে বলে গেছেন মুখ দেখে মনের কথা আঁচ করবার মতো কোনো বিদ্যে আজও আবিষ্কৃত হয় নি। আর স্রেফ চিঠি পড়ে একটা মানুষের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা তো আরো দুরূহ কাজ। জানেন তো, সৌম্যকান্তির সঙ্গে আমি তিন বছরেরও বেশি ঘর-সংসার করেছি। ওর প্রতিটি পদক্ষেপ, চলাফেরা, কথা বলার ভঙ্গি সব করতলের অসংখ্য রেখার মতো আমার চেনা হয়ে গেছে। রাত দুপুরে বেহেড মাতাল হয়ে স্ত্রীকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করার মতো, ক্ষমাপ্রার্থী হওয়াও ওর কাছে একটা গতানুগতিক ব্যাপার।'

'তাহলে ওর এই প্রস্তাবে তুমি রাজী নও অগ্নিবীণা?'

'আদৌ না। তার কারণ ওই মানুষটাকে আমি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত চিনি। এখন ওর কথা মতো জলপাইগুড়িতে ফিরে গেলে, চিঠিতে ও যা লিখেছে তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে নিজরূপ ধারণ করতে ওর সাতটা দিনও সময় লাগবে না।'

দীপ্তেন্দু চিঠিসুদ্ধ খামটা অগ্নিবীণার হাতে দিল। বলল, 'রাখ এটা।' তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোল,—'এই চিঠির কথা আর কেউ জানে?'

'আর কেউ মানে?'

'দাদু।' দীপ্তেন্দু ছোট্ট জবাব দিল।

'নাহ্।' অগ্নিবীণা বলল,—'এ চিঠির কথা দাদুকে আর জানাইনি। তবে আমার মনে হয় দাদুকেও ওরা একটা চিঠি দিয়েছে।'

'সেটা তুমি কেমন করে জানলে? দাদু কিছু বলেছেন?'

'নাহ্। তবে দুটো চিঠি একই সঙ্গে সকালের ডাকে এসেছিল। একটার ওপর আমার নাম লেখা। অন্যটায় দাদুর। তখন অবশ্য দাদু বাড়িতে ছিলেন না। বোধহয় মেডিসিন শপে গিয়েছিলেন। আমার চিঠিটা হাতে নিয়ে আমি চলে আসি। দাদুকে লেখা চিঠিখানা টেবিলেই পড়ে ছিল। ফিরে এসে দাদু নিশ্চয় সেটা পেয়েছেন।'

'দাদু ওই চিঠিটা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেন নি?'

'নাহ্।' অগ্নিবীণা মাথা নাড়ল। বলল, 'তবে ওই চিঠিখানাও যে জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

'কেমন করে?'

'কারণ খামটার ওপর জলপাইগুড়ি পোস্ট অফিসের শীলমোহর মারা ছিল।'

দীপ্তেন্দু ঈষৎ গম্ভীর মুখে কী যেন চিন্তা করছিল।

অগ্নিবীণা মুচকি হেসে বলল,—'ছাড়ুন ওসব কথা। আচ্ছা, সেদিন হঠাৎ কণাদির নামটা কেন জিজ্ঞেস করলেন বলুন তো?'

প্রসঙ্গ পাল্টাতেই দীপ্তেন্দু যেন একটু হাল্কা বোধ করল। বলল,—'তুমি তো

জানো কণা দত্ত বাঁকুড়া কলেজে আমার সহপাঠিনী ছিল। তবে মফস্বলের কলেজ। তাই ছেলেমেয়েদের মেলামেশার কোনো সুযোগই ছিল না। অথচ আমার এক বন্ধু তখন থেকেই ওকে মনে মনে ভালবাসত। ক্লাসে মাঝে মাঝেই একদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাই নিয়ে ক্লাসে একটা গুঞ্জনও হত। শেষ পর্যন্ত দুজনের একদিন দেখা হল গড়বেতা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে।'

'বলেন কী!' অগ্নিবীণার দুটি চোখ কৌতূহলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ঠিক তাই।' দীপ্তেন্দু জবাব দিল। বলল,—'ওয়াটারিং স্টেশন। ইঞ্জিন জল নেয়। তাই গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। একই গাড়িতে যাচ্ছিল দুজনে। ছিল আলাদা বগীতে। স্টেশনে আমার বন্ধু নেমেছিল চা খেতে। আর কণা দত্ত এসেছিল ট্যাপ ওয়াটার থেকে ওর জগে জল ভরতে।'

'তারপর?' অগ্নিবীণা শুধোল,—'এ তো ভারি মজার কাহিনী।'

'হ্যাঁ। দেখা হবার পর দুজনের আলাপ-সালাপ, গল্প-সল্প সবই হল। একটা নিমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে চা খেল দুজনে। ট্রেন ছাড়তেই ফের যে যার বগীতে চলে গেল। তবে বাঁকুড়ায় ফিরে ওদের আর কথাবার্তা হয় নি। কলেজের পড়া শেষ হতেই কণা কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে ঢুকল। আব আমার বন্ধু আর. জি, করে। কলকাতায় এসে দু-একবার কণার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করে ছিল সে। কিন্তু আলাপ-পরিচয় তেমন দীর্ঘ হয় নি। তারপর আর একটা ব্যাপার ঘটল। আমার বন্ধুর আর ডাক্তারি পড়া হয় নি। সে মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে অন্য লাইন ধরল।'

'অন্য লাইন মানে?'

'সে কথায় পরে আসছি।' দীপ্তেন্দু জবাব দিল। বলল, 'ডাক্তারি পাশ করে কণা দত্ত একটা পাঞ্জাবী ছেলের প্রেমে পড়েছিল। এবং পরে তাব সঙ্গে ওর বিয়েও হয়। কিন্তু সে বিয়ে টেকে নি। বেশ কিছুদিন প্রায় ছাড়াছাড়ি থাকার পর ওদের ডিভোর্স মঞ্জুর হয়েছে। ইতিমধ্যে কণা দত্ত অনেকটা আশ্চর্যজনকভাবে আমার বন্ধুকে আবার আবিষ্কার করল। এখন দুজনের ফের দেখাশোনা, ভাব-ভালবাসা সবই শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে বন্ধু আমাকে একদিন ডিনারে আমন্ত্রণ করেছে। বলা বাহুল্য ডিনার-টেবিলে কণা দত্তও উপস্থিত থাকবে।'

'বাব্বা।' অগ্নিবীণা গালে হাত রেখে বলল,—'কণাদির পেটে পেটে অ্যাতো। এ যে এক মধুর প্রেম-কাহিনী। তা আপনার সেই বন্ধুটির নাম কী?'

'নাম?' দীপ্তেন্দু ভুরু কুঁচকে বলল, 'ওর পিতৃদত্ত নামটা শুনলে তুমি নিশ্চয় ওকে চিনতে পারবে না। তবে ওর আরো একটা নাম আছে। সেই নামটা উচ্চারণ করলেই শুধু তুমি কেন, দেশের বহু মানুষ ওকে এক ডাকেই চিনবে।'

'কী যে সব বলছেন? এতো রহস্য করলে আমি ব্যাপারটা কেমন করে বুঝব?'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'ঠিক আছে। ওর দুটো নামই তোমাকে বলছি। প্রথম নামটা হরিদাস পাল। যেটা ওর পৈতৃক নাম। স্কুল-কলেজের খাতায় ওর এই নামটাই লেখা আছে।'

'আর দ্বিতীয় নামটা?' অগ্নিবীণা সাগ্রহে শুধোল।

দীপ্তেন্দু বলল,—'দ্বিতীয় নামটা হল তমালকুমার। এখন এই নামেই ওর পরিচয়।'

'তমালকুমার মানে?' অগ্নিবীণা ভুরু কোঁচকাল। বলল, —'আপনি কি ফিল্ম-স্টার তমালকুমারের কথা বলছেন?'

'ঠিক তাই। তুমি তাহলে ওকে চিনতে পেরেছ। ডাক্তারি পড়া ছেড়ে ও শেষ পর্যন্ত রুপোলি পর্দার হাতছানিতেই চলে গেল।'

'চিনতে পারব না কেন?' অগ্নিবীণা মুখিয়ে উঠল।

বলল,—'সমুদ্র আর তরঙ্গ ছবিতে কী wonderful অভিনয় তমালকুমারের। আমার বন্ধুরা তো ওর নামে অজ্ঞান।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'অথচ ফিল্মে যাওয়ার জন্যই ওর বাবা একসময় ওকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ও তাতে দমেনি। ফিল্মে যাবে বলে মনঃস্থির করে ফেলেছিল।'

অগ্নিবীণা বলল,—'আপনি কিন্তু একটা অন্যায় করেছেন দীপ্তেন্দুদা।'

'কী?'

'তমালকুমার আপনার ক্লাস-ফ্রেন্ড, তার সঙ্গে আপনার এত বন্ধুত্ব এটা কিন্তু আগে জানান নি।'

দীপ্তেন্দু হাসতে লাগল। বলল,—'আমাদের কাগজের সিনেমা-এডিটরও এই কথা বলেছিল। আচ্ছা হরিদাস যে একসময় আমার সঙ্গে পড়ত এটা কি ফলাও করে বলবার মতো কথা নাকি? নেহাৎ কণা দত্ত মাঝখানে এসে পড়েছে আর তাকে তুমি ভালোরকম চেন, তাই গল্পটা বলে ফেললাম।'

'আপনি নিশ্চয় বন্ধুর নিমন্ত্রণ রাখতে ডিনারে যাবেন? সেখানে কণাদিও থাকছেন।'

'হ্যাঁ। না গেলে হরিদাস ছাড়বে না।' দীপ্তেন্দু জবাব দিল। হেসে বলল,—'আমার কাছ থেকে একরকম কথা আদায় করে নিয়েছে।'

অগ্নিবীণা বলল,—'কণাদির কপাল ভালো। ডিভোর্সের পর পুরানো বন্ধুর সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয়েছে।' মুচকি হেসে ফের জানাল,—'আমার তো মনে হয় দুজনের বিয়ে হবে।'

দীপ্তেন্দু মন্তব্য করল,—'জন্ম-মৃত্যু আর বিবাহের কথা কে বলতে পারে? আর শুভবিবাহে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। আমার তো মনে হয় বিয়েতে দুজনেই নিমন্ত্রণ পাব।'

দুপুরে খাওয়ার পর ব্রজবিলাস তাকে আড়ালে বললেন,—'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল দীপ্তেন্দু। একবার দেখা ক'রো।'

'নিশ্চয় দাদু। সে কথা আবার বলতে।'

হাল্কা একটা ঘুম দিয়ে দীপ্তেন্দু যখন উঠে বসল তখন ঘড়িতে প্রায় তিনটে বাজে। ব্রজবিলাসের দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার অভ্যেস নেই। দীপ্তেন্দুর মনে হ'ল অগ্নিবীণা নিশ্চয় তার শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে সকালের খাটাখাটুনির ক্লান্তি দূর করছে। নিঃশব্দে শয্যা ছেড়ে উঠে সে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে ব্রজবিলাসের সামনের একটা চেয়ার দখল করে বসল।

মুখ তুলে তাকে দেখেই ব্রজবিলাস মৃদুকণ্ঠে বললেন, —'তোমার সঙ্গে একটা আলোচনা ছিল দীপ্তেন্দু।'

'কী ব্যাপার দাদু?' দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে কথা কইল। 'কী নিয়ে আলোচনা?'

ব্রজবিলাস কোনো ভনিতা না করেই বললেন,—'আজ সকালের ডাকে জলপাইগুড়ি থেকে একটা চিঠি এসেছে। সেটা আমাকেই লেখা।'

দীপ্তেন্দু বুঝতে পারল তার ধারণা অমূলক নয়। এই চিঠিটার ব্যাপারেই যে ব্রজবিলাস তার সঙ্গে কথা বলতে চান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকটা অজ্ঞতার ভান করে দীপ্তেন্দু জিজ্ঞেস করল,—'চিঠিটা আপনাকে কে লিখেছেন দাদু?'

দুপুরবেলা বৈঠকখানা ঘরে বসে ব্রজবিলাস একটা দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিলেন। সেটা সরিয়ে রাখতেই খামের একটা চিঠি দীপ্তেন্দুর নজরে পড়ল। চিঠিখানা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে ব্রজবিলাস বললেন,—'এটা সৌম্যকান্তির মা মানে মহারানীর শাশুড়ি লিখেছেন।'

দীপ্তেন্দু লেফাফাটি হাতে নিতেই ব্রজবিলাস ফের বললেন, —'তুমি চিঠিখানা পড়ে দ্যাখ না।'

'আমি পড়ব?' দীপ্তেন্দুকে ঈষৎ সঙ্কুচিত মনে হ'ল। ধীরে ধীরে সে বলল,—'মানে, সেটা কি উচিত হবে দাদু।'

ব্রজবিলাস সহাস্যে বললেন,—'দেখ দীপ্তেন্দু, অন্য কাউকে নিশ্চয় এ চিঠি পড়তে দিতাম না। কিন্তু তুমি একরকম আমাদের পরিবারেরই লোক। মহারানীকে তোমার হাতে দিতে পারলে আজ তুমি এ বাড়ির পরমাত্মীয় হতে। কিন্তু সে যখন হয় নি তখন আর দুঃখ করে লাভ নেই। তবে মহারানীর ব্যাপারে কোনো চিঠিপত্র এলে তুমি নিশ্চয় সেটা পড়ে দেখতে পার।'

দীপ্তেন্দু আর কথা বাড়াল না। সে লেফাফার ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে পড়তে শুরু করল।

অগ্নিবীণার শাশুড়ি লিখেছেন,—

মাননীয় মেসোমশায়,

আপনাকে এই চিঠি লিখতে হ'ল একটি বিশেষ কারণে। আপনি তো সবই জানেন। তবু গৌরচন্দ্রিকার মতো কী যে ঘটেছিল তা সংক্ষেপে আপনাকে জানিয়ে রাখছি।

আপনার নাতজামাই একজন বড় মাপের ঠিকাদার। শুধু জলপাইগুড়ি নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং সিকিম আর ভুটানেও তার কণ্ট্রাক্টরির কাজ চলে। ওর বাবা মানে আমার স্বামী বেঁচে থাকতে ওকে ব্যবসার নানা ঝুটঝামেলার এত ধকল সইতে হয় নি। কিন্তু পিতৃবিয়োগের পর সমস্ত কাজ-কারবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে ওকে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়।

আপনি নিশ্চয় বোঝেন, এই ধরনের ব্যবসা চালাতে ওপরমহলের লোকেদের সঙ্গে একটা সুন্দর সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন। তার জন্য নানারকম পথও রয়েছে। আমি স্বীকার করছি, এসব কারণেই সৌম্যকান্তিকে সুরাপান করতে হয়। এবং বলা বাহুল্য বাড়িতেও তার এক-আধটু রেশ চলে। এইসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার নাতনি একদিন রাত্তিরে তুলকালাম কাণ্ড করে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়েও তাকে নিরস্ত করা যায় নি। পরদিন সকালেই সে জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এবং চাকুরিস্থলে অর্থাৎ টি-গার্ডেনসের কোয়ার্টার্সে গিয়ে ওঠে।

আমার প্রথমে মনে হয়েছিল উত্তেজনার বশে সে যা করে ফেলেছে দুদিন বাদেই তার জন্য অনুতাপ আসবে। তখন হয়তো বাড়ি ফেরার জন্য তার মন চঞ্চল হবে। আর মেয়েমানুষ কি কখনও স্বামী-সংসার ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারে? অনেকটা সে রকম ভেবেই কিছুদিন বাদে সৌম্যকান্তিকে টি-গার্ডেনসের ওই হাসপাতালে পাঠাই। যাতে বউমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে আবার বাড়িতে নিয়ে আসে। আমি শুনেছি সৌম্যকান্তি চেষ্টার ত্রুটি করে নি। এমন কী হাতজোড় করে স্ত্রীর কাছে ক্ষমাও চেয়েছিল। কিন্তু আপনার নাতনি ভাঙবে তবু মচকাবে না। সত্যি কথা বলতে, এমন ট্যাঁটা মেয়েছেলে আমি জন্মে দেখিনি।

এরপর বাধ্য হয়েই আমাকে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উকিলের নোটিশ পাঠাতে হয়। স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন পালন করতে তার এই অনীহার কারণ কী? আদালতের কাছে আমাদের প্রার্থনা ছিল যাতে অবিলম্বে সে বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু আপনার নাতনি এই অনুরোধে কর্ণপাত করেনি।

এরকম অবস্থায় ডিভোর্স অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদই একমাত্র পথ। ছেলের পুনরায় বিবাহ দিতে আমিও বদ্ধপরিকর। যে মেয়ে জিদ করে স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে তাকে আবার ফিরে আসার জন্য তোষামোদ করার কী প্রয়োজন? আর মেয়েমানুষের মন না মতি। আমার তো মনে হয় বিয়ের আগে আপনার নাতনির অন্য কারো সঙ্গে ভালবাসা ছিল। সে রকম উড়ো কথাও আমার কানে এসেছে। যে কোনো কারণেই হোক ওর সেই প্রেম পরিণতি লাভ করে নি। এখন সৌম্যকান্তির সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'লে সেই বাসনা চরিতার্থ হওয়া সম্ভব।

মুস্কিলটা কী জানেন? সৌম্যকান্তি আপনার নাতনিকে এখনও ভুলতে পারে নি। স্ত্রীর ওপর তার বরাবরই একটা দুর্বলতা ছিল। এবং আজও সেটা রয়েছে। এজন্যই বিবাহ-বিচ্ছেদে তার আগ্রহ নেই। উল্টে আমার ছেলে এখনও বিশ্বাস

করে অগ্নিবীণা একদিন মত বদলাবে। যে মন তাকে স্বামীর দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে কুমন্ত্রণা দিয়েছে সেই মনই তাকে আবার স্বামীর কাছে টেনে আনবে।

আমার ইচ্ছে নাতনিকে আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন। স্ত্রী-পুরুষের ঝগড়া-ঝাঁটি কোন সংসারে নেই? তার জন্য কি কেউ ঘর জ্বালিয়ে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়? আপনার নাতনি রাজী হ'লে সৌম্যকান্তিকে আমি কলকাতায় পাঠিয়ে দেব। যাতে কয়েকটা দিন কলকাতায় ঘুরে বেড়িয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সে আবার জলপাইগুড়ি ফিরে আসতে পারে।

আমি জানি বৌমা এখন ডাক্তারির আর একটা বড় পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমার মত না থাকলেও পড়াশোনা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে সৌম্যকান্তির কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ছুটিছাটায় দু-চা'রদিনের জন্য তো শ্বশুরবাড়িতে আসা চলে। তারপর না হয় পরীক্ষা শেষ হলে পাকাপাকিভাবে জলপাইগুড়িতে স্বামীর কাছে এসে থাকবে।

সমস্ত ব্যাপার আপনাকে অবহিত করে উত্তরের আশায় রইলাম। আপনার শরীর কেমন আছে জানাবেন। এই বয়সে আর রাজনীতি নিয়ে নাই বা দৌড়ঝাঁপ করলেন। সারাজীবন দেশের জন্য আপনি তো কিছু কম করেন নি!

প্রণাম জানবেন। আমার বেয়াই মশায়কে নমস্কার জানাবেন। তার কুশল কামনা করি।

ইতি
সৌম্যকান্তির মা।

দীপ্তেন্দু চিঠিখানা পড়া শেষ করতেই ব্রজবিলাস জিজ্ঞেস করলেন,—'চিঠি পড়ে কি মনে হ'ল তোমার?'

'না, মানে, এখন কী করা উচিত আমি সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।' দীপ্তেন্দু আমতা আমতা করল।

ব্রজবিলাস বললেন, 'এ চিঠির আমি কী জবাব লিখি বলতো? মহারানী আবার শ্বশুরবাড়িতে মানে জলপাইগুড়ি ফিরে যাবে কি না সেটা একমাত্র সেই বলতে পারে। আমি বড়জোর তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখব।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আপনি যে এই চিঠি পেয়েছেন অগ্নিবীণা কি সেটা জানে?'

'নাহ্। মানে এখনও তাকে বলা হয় নি। আর বলার সময়ই বা পেলাম কই? সকালে পরাশর এবং তার সঙ্গে আরো দু-তিনজন এসেছিল। বেলা এগারোটা পর্যন্ত তো ওরাই গল্পগুজব, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে গেল। তারপর স্নান-টান, খাওয়া-দাওয়া এসব শেষ করতেই দুপুর গড়াল। তখনই অবশ্য ভেবে রেখেছিলাম চিঠিটার ব্যাপারে আগে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'অবিনাশকাকা মানে অগ্নিবীণার বাবাকে এ বিষয়ে কিছু জানাবেন?'

ব্রজবিলাস বিষণ্ণ হাসলেন। বললেন,—'এটাই বোধহয় আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। এ বাড়িতে এতকাল আমার কথাই শেষ কথা বলে সবাই ধরে নিয়েছিল। শুধু একবার মাত্র তার ব্যতিক্রম হয়। আমি বৌমার কথায় সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে মহারানীর বিয়ে দিতে বৌমা যখন বেঁকে বসলেন, প্রায় অন্নজল ত্যাগ করে রইলেন, তখন বৌমার ওপর আমি আর জোর করিনি। জলপাইগুড়ির অভিজাত পরিবারে বিয়ে হয়ে গেল মহারাণীর। ছেলে ইঞ্জিনিয়র,—বাপের ঠিকাদারি আর চা-বাগানের পয়সা। কিন্তু সেই বিয়ের ধূমধাম, সাধ-আহ্লাদ যে এত তাড়াতাড়ি মুখ থুবড়ে পড়বে আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি। আর অবিনাশের কথা জিজ্ঞেস করছ? আমার ওপর সে কোনোদিন একটি কথাও বলেনি। ফলে চিরকালই সে বাপের কথায় হাত তুলে এসেছে। আজ মিছিমিছি এই নিয়ে তার মতামত চাইতে গেলে তাকে অকারণ বিব্রত করা হবে।'

দীপ্তেন্দু হঠাৎ বলল, —'আমার মনে হয় এই চিঠির কথা অগ্নিবীণা জানে।'

'তাই নাকি?' ব্রজবিলাস ভুরু তুলে শুধোলেন,—'তুমি কেমন করে বুঝলে?'

'অগ্নিবীণা আমাকে সব কথা বলেছে। হয়তো আপনাকেও পরে জানাত। সকাল থেকে লোকজনের আসাযাওয়া, তাদের চা-জলখাবার দেওয়া, তারপর মধ্যাহ্ন ভোজনের দেখভাল করা এসব নিয়েই ব্যস্ত ছিল বলে আর আপনাকে বলতে পারে নি।'

ব্রজবিলাস সন্তোষ প্রকাশ করে শুধোলেন,—'তা কী কথা সে বলেছে তোমাকে?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আজ সকালের ডাকে জলপাইগুড়ি থেকে দুটো চিঠি এসেছিল।'

'দুটো চিঠি?'

'হ্যাঁ, একটা আপনার নামে। আর একটা—।'

'আর একটা কার নামে?' ব্রজবিলাস ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'ওটা অগ্নিবীণাকে লেখা। মানে ওর স্বামী চিঠিটা লিখেছে।'

'তাই নাকি?' ব্রজবিলাস কী যেন চিন্তা করলেন। পরে শুধোলেন,—'এ কথা মহারানী বলেছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ' দীপ্তেন্দু অকপটে স্বীকার করল।

ব্রজবিলাস ফের জিজ্ঞেস করলেন,—'চিঠিতে সৌম্যকান্তি কী লিখেছে তা কি তোমাকে বলেছে মহারানী?

দীপ্তেন্দু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল,—'হয়ে, মানে।'

ব্রজবিলাস ভুরু তুলে ওর মুখের দিকে তাকালেন।

দীপ্তেন্দু এবার সঙ্কোচ কাটিয়ে বলে ফেলল, —'অগ্নিবীণা মানে বুলু চিঠিটা আমাকে পড়তে দিয়েছিল।'

'তাই নাকি?' ব্রজবিলাস কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তাহলে তো চিঠির কথা তুমি সবই জান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু ধীরে ধীরে বলল,—'চিঠিতে ওর স্বামী ওকে আবার জলপাইগুড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। আর অগ্নিবীণা রাজী থাকলে ভদ্রলোক খুব শীগগীর একবার কলকাতায় এসে ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফের জলপাইগুড়ি নিয়ে যাবে।'

ব্রজবিলাস ঈষৎ গম্ভীর গলায় বললেন,—'সৌম্যকান্তির চিঠি পড়ে কী বুঝলে? মহারানীকে জলপাইগুড়ি নিয়ে যাবার জন্য সে খুব ইচ্ছুক?'

'হ্যাঁ, ইচ্ছুক বৈকি। অন্তত চিঠি পড়ে আমার তাই মনে হ'ল। বারবার চিঠিতে সে কথা লিখেছে।'

ব্রজবিলাস বললেন, 'কিন্তু মহারানীর মতামতটা কী সেটা কিছু জানতে পেরেছ?'

দীপ্তেন্দু কোনো জবাব দেবার আগে ব্রজবিলাস নিজেই বললেন,—'সৌম্যকান্তির মায়েরও তাই ইচ্ছে। চিঠি পড়ে নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছ?'

দীপ্তেন্দু চুপ করে রইল। কোনো মন্তব্য করল না।

ব্রজবিলাস বললেন,—'আমার তো মনে হয় না এত তাড়াতাড়ি মহারানী তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে একটা রফা করতে রাজী হবে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন দাদু। রফা তো দূর অস্ত। অগ্নিবীণা এখনই ওর স্বামীর চিঠির একটা জবাব দিতেও রাজী নয়।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'মুস্কিলটা হ'ল আমার। সৌম্যকান্তির মাকে আমি কী জবাব দিই বলতো? মহারানী আর জলপাইগুড়ি ফিরে যেতে রাজী নয় একথা লিখলে কি ভালো শোনাবে? একটা উপায় অবশ্য আছে। চিঠির কোনো জবাব না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। কিন্তু সেটা অভদ্রতার নামান্তর।'

ইতিমধ্যে অগ্নিবীণা কখন ঘুম থেকে উঠে চা বানিয়ে নিয়ে এসেছে ব্রজবিলাস খেয়াল করেন নি। ধূমায়মান চায়ের কাপ ট্রেতে সাজিয়ে তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে দীপ্তেন্দু সহাস্যে বলল, —'তোমার চায়ের কাপটার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম বুলু। ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা না খেলে আমার শরীরের ম্যাজম্যাজানি যেতে চায় না।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ব্রজবিলাস বললেন,—'আজকের চা-টা খুব সুন্দর হয়েছে মহারানী। এটা চায়ের গুণ না হাতের গুণ?' তারপর মুচকি হেসে দীপ্তেন্দুকে লক্ষ্য করে চুটকি মন্তব্য করলেন,—'তুমি কী বলো দীপ্তেন্দু?'

আলোচনাটা মুহূর্তে লঘু হয়ে গেল। আর এক চুমুক চা পান করে দীপ্তেন্দু বলল,—'আমার তো মনে হয় এটা চায়ের গুণ কিংবা হাতের গুণ কোনোটাই নয় দাদু। আসলে এ হ'ল ওর হাসির গুণ।'

ব্রজবিলাস হাসতে হাসতে বললেন,—'দীপ্তেন্দু কিন্তু ঠিকই ধরেছে মহারানী। তুমি যেদিন মুখ ভার করে থাক, সেদিন চাটাও কেমন ভারী-ভারী বিস্বাদ লাগে। আর যেদিন তোমার ঠোঁটের ডগায় হাসির ঝিলিক ফোটে সেদিন চায়ের পাত্রটাও যেন ছলছলিয়ে হেসে ওঠে।'

অগ্নিবীণা ফিরে দাঁড়াল। বলল,—'ব্যাপার কী দাদু? আজ হঠাৎ রাজনীতি ছেড়ে কাব্য শুরু করেছ। আমি তো ভেবেছি মুখ্যমন্ত্রী এবার কাকে তাঁর মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেবেন তাই নিয়ে বুঝি দীপ্তেন্দুদার সঙ্গে এক প্রস্থ ঢালাও আলোচনা করছ।'

অগ্নিবীণা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দীপ্তেন্দু বলল,—'আমি এবার উঠি দাদু। লেখালিখির অনেক কাজ পড়ে আছে। বরং সময় পেলেই আবার আসব।'

দীপ্তেন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল দরজার কাছে অগ্নিবীণা দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই সে বলল,—'চলুন দীপ্তেন্দুদা। আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

দীপ্তেন্দু মৃদু আপত্তি জানাল। বলল,—'মিছিমিছি আবার আমার সঙ্গে হাঁটবে বুলু!'

'হাঁটলেই বা। আমার কোনো অসুবিধে নেই।' অগ্নিবীণা সোজাসুজি জবাব দিল।

বাড়ি ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে গেল দুজনে। তারপর অগ্নিবীণা বলল,—'এখানে একটু দাঁড়ান দীপ্তেন্দুদা। আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

তার সঙ্গে কিছুটা পথ হেঁটে যাওয়ার কারণটা দীপ্তেন্দু এতক্ষণে বুঝতে পারল। সে জবাবে শুধোল,—'কী কথা বুলু?'

'এতক্ষণ দাদু কী বলছিলেন আপনাকে? দু-একটা টুকরো কথা অবশ্য আমার কানে এসেছে।'

প্রসঙ্গটা লুকিয়ে কোনো লাভ নেই বুঝতে পেরে দীপ্তেন্দু মুখ খুলল। বলল,—'জলপাইগুড়ি থেকে যে চিঠি দুটো এসেছে উনি সে বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করছিলেন।'

'দুটো চিঠি যে এসেছে উনি সেটা জানতেন?'

'নাহ্। তোমার চিঠিটার কথা আমিই বলেছি ওঁকে।'

'চিঠিতে সৌম্যকান্তি কী লিখেছে দাদুকে তাও নিশ্চয় বলেছেন?'

'হ্যাঁ। ভদ্রলোক তোমাকে জলপাইগুড়ি ফিরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন। তোমার সম্মতি পেলেই উনি কলকাতায় এসে তোমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেখানে নিয়ে যাবেন।'

'কিন্তু আমি তো আর জলপাইগুড়ি ফিরে যেতে রাজী নই দীপ্তেন্দুদা। আমার

মতামত কী, দাদু নিশ্চয় আপনাকে সে কথা জিজ্ঞেস করেছেন?'

'অবশ্য। তবে তুমি যে ইতিবাচক উত্তর দেবে না সেটা উনি অনুমান করেছেন। আমিও সে কথাই জানিয়েছি। বলেছি জলপাইগুড়ি যাওযা দূরে থাক, এ চিঠির জবাব দিতেই অগ্নিবীণা রাজী নয়।'

'শুনে দাদু কী বললেন?'

'বললেন সেটাই তার সমস্যা। মহারানী জলপাইগুড়ি যেতে নারাজ, এ কথা চিঠিতে লিখলে নাকি ভালো শোনাবে না। আবার চিঠির জবাব না দিলেও সেটা অভদ্রতার নামান্তর হবে।'

অগ্নিবীণা বলল, —'দাদু এ চিঠির একটা জবাব ঠিকই দেবেন। সেটা আমি জানি। কারণ কেউ চিঠি লিখলে দাদু কখনও তার উত্তর না দিয়ে থাকতে পারেন না, আর আমার শাশুড়িমাতা তো কুটুম্ব মানুষ। তাকে বিমুখ করা কি দাদুর পক্ষে সম্ভব?'

দীপ্তেন্দু চুপ করে শুনছিল। কোনো মন্তব্য করল না।

অগ্নিবীণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল,—'আমার একটা কথার জবাব দেবেন দীপ্তেন্দদা?'

'কী কথা বুলু?'

'আপনি কি চান আমি জলপাইগুড়ি ফিরে যাই?'

এরকম একটা প্রশ্ন শুনে দীপ্তেন্দু হকচকিয়ে গেল। সে একটা ঢোক গিলে জিভটাকে ফের সচল করে নিয়ে বলল,—'ইয়ে, মানে, আমাকে একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'বা রে!' অগ্নিবীণা ভুরু কোঁচকাল। দীপ্তেন্দুকে প্রায় কটাক্ষ করে বলল,—'আপনার মতামতের মূল্য নেই বুঝি? তাহলে ক'দিন আগেই যে বলছিলেন সৌম্যকান্তির সঙ্গে ডিভোর্স হ'লে আমাকে আবার বিয়ে করবেন। ওটা বুঝি কথার কথা? কিন্তু আমি জলপাইগুড়ি ফিরে গেলে সেটা কি আর সম্ভব হবে?'

দীপ্তেন্দু মুখ তুলে সোজাসুজি তাকাল। কিন্তু কোনো উত্তর দিল না।

অগ্নিবীণা বাঁকা হেসে বলল,—'পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে দীপ্তেন্দুদা যা চাইলে পাওয়া যায় না। শক্ত হাতে সেটা আদায় করে নিতে হয়।'

দীপ্তেন্দু ওর কথার কোনো জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না।

অগ্নিবীণা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল,—'নির্জনে বাড়ির লোকের চোখের আড়ালে অন্ধকারে একটি মেয়েকে লুকিয়ে আদর-সোহাগ করলেই কি তাকে পাওয়া যায়? ওটা সাময়িক ব্যাপার। পুরুষমানুষের হয়তো তাতে কামনা মেটে। কিন্তু মেয়েটি অধরাই থেকে যায়।'

দীপ্তেন্দু কোনো কথা বলছে না দেখে অগ্নিবীণা এবার হেসে ফেলল। মেয়েরা

আসলে প্রকৃতির জাত। ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। এই মুহূর্তে মুখখানি মেঘলা দিনের মতো কালো, মলিন। আবার খানিক বাদেই সেই মেয়ে শরতের ফটফটে নীল আকাশ।

দীপ্তেন্দুকে লক্ষ্য করে অগ্নিবীণা বলল,—'আজেবাজে কত কী কথা বলে ফেললাম আপনাকে। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই আলোচনার কোনো মানে হয়? এসব কথা থাক দীপ্তেন্দুদা। এখন বলুন আপনি আবার কবে আসছেন।'

দীপ্তেন্দু ম্লান হেসে বলল,—'দেখি আবার কবে আসতে পারি।'

'উহুঁ। ওরকম জবাব দিলে চলবে না, আপনাকে সামনের রবিবারেই আসতে হবে।'

দীপ্তেন্দু চুপ করে আছে দেখে সে আবার বলল,—'বা রে! এর মধ্যে আপনার ওই বন্ধু মানে ফিল্ম-স্টার তমালকুমার আর কণাদির নিমন্ত্রণে ডিনার খেতে যাবেন না? তখন কী কথা হ'ল আর এতদিন বাদে আপনাকে দেখে কণাদি কী বললেন
১ সেটা জানতে আমার ইচ্ছে করবে না?'

'বেশ তো। এর মধ্যে যদি দেখা হয় তাহলে নিশ্চয় বলব।'

অগ্নিবীণা মুচকি হেসে বলল,—'আমার কী মনে হয় জানেন?'

'কী?'

'কণাদি আপনার ওই বন্ধু মানে ফিল্ম-স্টার তমালকুমারকে বিয়ে করবে।'

দীপ্তেন্দু এবার হাসল। বলল,—'বিয়ে করবে বলেই তো তোমার কণাদি কলকাতা হাতড়ে তমালকুমারকে খুঁজে বের করেছে।'

॥ এগারো ॥

বিয়ের ঘোষণাটা সেদিনই হরিদাসের মুখে সে শুনবে আশা করেছিল। বুধবার হরিদাস অফিসে টেলিফোন করেছিল তাকে। বলল,—'ব্যাপার কী? তুই যে হঠাৎ ডুমুরের ফুল হয়ে গেলি?'

'তার মানে?' দীপ্তেন্দু ভালোমানুষের মতো প্রশ্ন করল।

হরিদাস পাল্টা জবাব দিল—'মানে আবার কী? এই কদিনের মধ্যেই সব ভুলে গিয়েছিস। তোর সঙ্গে কথা ছিল না একদিন আমাদের দুজনের সঙ্গে ডিনারে যাবি? টেলিফোন করে তারিখটা জানাবি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। মনে পড়েছে এবার।' দীপ্তেন্দু কিছুটা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কথা কইল। বলল,—'ব্যাপারটা কী জানিস? এর মধ্যে একদিনও সময় করে উঠতে পারিনি, তাই—'

হরিদাস হেসে বলল,—'আর কত অজুহাত দিবি বাবা? কথায় বলে,—'যখন

ডানহাত কিংবা বামহাত কোনোটা দিয়ে আটকানো যায় না তখন মানুষ অগত্যা অজুহাত বের করে।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে সে ফের মন্তব্য করল,—'আমার তো মনে হয় তোর আসলে কণার কাছে যেতেই আপত্তি। অথচ ও বেচারী তোর সঙ্গে দেখা করবে বলে উদগ্রীব হয়ে আছে।

দীপ্তেন্দু ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বলল,—'তোর যত বাজে কথা। ঠিক আছে, আগামী শনিবার আমি রাজী আছি। তোরা ফ্রি থাকলে সেদিনই উই ক্যান মিট সামহোয়্যার।'

হরিদাস সম্মতি জানাল। বলল,—'তাই হবে। শনিবারই তাহলে একসঙ্গে কোথাও বসা যাবে।'

'কিন্তু কোথায় তোর সঙ্গে দেখা করব সেটা বল?'

'কেন? আমার বাড়িতে চলে আয়। আটটা বাজলেই তিনজনে বেরিয়ে পড়ব।'

শনিবার সাড়ে সাতটা নাগাদ দীপ্তেন্দু হরিদাসের ফ্ল্যাটে চলে এলো। তাকে দেখেই হরিদাস সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলল,—'ভেতরে চল। কণা তোর জন্যই অপেক্ষা করছে।'

দীপ্তেন্দু ঘরে পা দিতেই কণা দত্ত চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার জানাল। দীপ্তেন্দুও প্রতিনমস্কার করে বলল,—'আমাকে চিনতে পারছেন তো?'

'কেন চিনতে পারব না?' কণা ঠোঁট টিপে মুচকি হাসল। বলল,—'তবে চেহারাটা অনেক বদলে গেছে। বাঁকুড়া কলেজে পড়ার সময় কত ছেলেমানুষ মনে হ'ত।'

দীপ্তেন্দু অপাঙ্গে দেখছিল ওকে। অলস নায়িকার মতো কণা দত্ত তার সামনে দাঁড়িয়ে। পরনে সবুজ সিল্কের শাড়ি। স্লিভলেস ব্লাউজ। সুডৌল ফর্সা দুই বাহু। কণা দত্তও কম বদলায় নি। তখন মফস্বলে-পড়া এক কিশোরী। হয়তো তার বছর দুই আগে শাড়ি ধরেছে। আজকের কণা দত্তের মতো চেহারায় এত চেকনাই হয় নি। সে ছিল উপলবিকীর্ণ ঝর্ণার জলধারার মতো। শীর্ণ, তবে ধীরে ধীরে নানা জলস্রোত তার সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে। আর আজকের কণা দত্ত দুই কূল ছাপিয়ে-ওঠা এক পরিপূর্ণ যুবতী নারী।

চেয়ারে বসে কণা দত্ত বলল,—'কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা। উঃ! যেন ভাবাই যায় না।' একটু দূরে দাঁড়িয়ে হরিদাস মন্তব্য করল,—'তাও কি আসতে চায়? আমাকে টেলিফোন করে তারিখ জানাবে বলে সেই যে গঙ্গার শুশুকের মতো ডুব দিল আর ভেসে ওঠার নাম নেই। শেষ পর্যন্ত ফোন করেই ওকে অফিসে ধরতে পারলাম। তারপর অবশ্য অনেক চেষ্টা করে তোমার সামনে এনে হাজির করেছি।'

দীপ্তেন্দু সাফাই গাইল,—'আরে বাবা আমি কি তোর মতো ফিল্মস্টার? একটা ছোট সংবাদপত্রের সাংবাদিক। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ কী না করতে হয়?' তারপর কণা দত্তের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল,—'আচ্ছা আপনিই বলুন, নানা কাজে সময় পাইনি বলেই তো ওকে টেলিফোন করতে পারিনি?'

'সে তো নিশ্চয়।' কণা দত্ত মুচকি হেসে অনুরোধ করল,—'আপনি ওই সোফার চেয়ারটায় ভালো করে বসুন তো।'

মিনিট দশ বাদেই ওরা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হরিদাস বলল,—'হ্যাঁ রে, সাড়ে দশটা নাগাদ তোকে মেসে পৌঁছে দিলেই তো হবে? সদর দরজা আবার বন্ধ করে দেবে না তো?'

দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল। বলল,—'না-না। সে ভয় নেই। মেসে নো মিল করবার সময় বলে এসেছি দরজাটা যেন খোলা রাখে। সাড়ে দশটা কিংবা এগারোটা যত রাত্তিরই হোক মেসে ঢোকার সময় আমি খিল তুলে দেব।'

চৌরঙ্গীর এক শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নামী হোটেলের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। উর্দিপরা বেয়ারা এসে সেলাম জানাতেই হরিদাস সামনের লনের একপাশে গাড়িটা পার্কিং করে এলো।

দোতলায় রেস্তোরাঁ অ্যাণ্ড বার। লিফটে করে তিনজনে ওপরে এসে উঠতেই ওয়েটার এগিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করে একটা টেবিলে এনে বসাল। সবিনয়ে জানতে চাইল ড্রিঙ্কস কী সার্ভ করবে?

দুটি মেনুকার্ড সামনেই পড়েছিল। একটি পানীয়ের, অন্যটি খাবারের। হরিদাস ড্রিঙ্কসের কার্ডে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেটি কণা দত্তকে এগিয়ে দিল। আড়চোখে একবার দীপ্তেন্দুর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,—'তুই তো আবার ধোয়া তুলসীপাতা। এসব নিশ্চয় চলবে না?'

কণা দত্ত চোখ দুটি প্রায় কপালে তুলে বলল,—'অবাক করলেন! হার্ড ড্রিঙ্কস্ আপনার চলে না বুঝি?'

'কী জানি কেন খায় না।' হরিদাস হাসতে হাসতে মন্তব্য করল,—'সাংবাদিক মাল ছোঁবে না ওকে দেখেই তো প্রথম জানলাম। আমার কী মনে হয় জানো? কেউ বুঝি ওকে মাথার দিব্যি দিয়ে মদ খেতে বারণ করে গেছে।'

হরিদাসের কথা শুনে বাদ্যযন্ত্রের একটি সুমিষ্ট রাগিণীর মতো কণ দত্ত খিল খিল করে হেসে উঠল, চোখের তারায় বিচিত্র রহস্য ফুটিয়ে শুধোল,—'আপনার সেই বান্ধবীর খবর কী?'

'বান্ধবী মানে?' গেলাসে ছোট্ট একটু সিপ্ করে হরিদাস অপাঙ্গে কণা দত্তের মুখের দিকে তাকাল।

'কেন? দীপ্তেন্দুবাবুর কাছে তুমি কোনোদিন অগ্নিবীণার নাম শোন নি?'

'অগ্নিবীণা! সে আবার কে?' দীপ্তেন্দু বিস্ময়ের সঙ্গে কথা কইল। তারপর বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলল,—'কী রে দীপ্তেন্দু? ডুবে ডুবে জল খাস নাকি? কই, এর কথা তো আমাকে বলিসনি?'

দীপ্তেন্দু চুপ করে আছে দেখে কণা দত্ত জবাব দিল,—'ওর পরিচয় আমি দিচ্ছি। অগ্নিবীণা মেডিক্যাল কলেজের স্টুডেন্ট। দু-বছরের জুনিয়র আমার চেয়ে। আমি যখন গাইনির হাউস-স্টাফ, দীপ্তেন্দুবাবু তখন ওর এক আত্মীয়াকে নিয়ে এলেন এমার্জেন্সিতে। কী নাম যেন ভদ্রমহিলার? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অগ্নিবীণা বলেছিল মাধুরী-বৌদি,—পুরো নামটা সম্ভবত মাধুরী সেন। সত্যি বলতে ভদ্রমহিলাকে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করার জন্য অগ্নিবীণা বারবার বলছিল। ওর অনুরোধেই আমি তখুনি এর্মাজেন্সি থেকে ওকে বেডে দেবার ব্যবস্থা করি। তারপর কল বুক পাঠিয়ে আর. এস. কেও visit করতে বলি। It was a case of Tubular Pregnancy. সেই রাত্তিরেই অপারেশান করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। সম্ভবত Ectopic rupture করেছিল। এবং সেই শকেই উনি মারা যান।' মুখ তুলে কণা দত্ত জিজ্ঞেস করল,—'কী দীপ্তেন্দুবাবু? কেসটা এই রকমই তো হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু মাথা নীচু করে জবাব দিল, বলল,—'আপনারা অনেক চেষ্টা করেও মাধুরীবৌদিকে বাঁচাতে পারেন নি।'

হরিদাস মুচকি হেসে শুধোল,—'কিন্তু অগ্নিবীণা? তার কী হ'ল বল। আমরা সেটা শুনতেই interested.'

'কী আবার হবে?' দীপ্তেন্দু কেমন দার্শনিকের মতো জবাব দিল। বলল,—'ডাক্তারি পাশ করবার পর ওর বিয়ে হয়ে গেছে।'

'বিয়ে হয়ে গেছে?' কণা দত্ত একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,—'কোথায়?'

'জলপাইগুড়িতে। সেখানেই একটা টি-গার্ডেনসের হসপিট্যালের মেডিক্যাল অফিসার।'

'এখনও কি সেই চাকরি করছে?'

'নাহ্। হাউস-স্টাফশিপ কমপ্লিট করবে বলে আপাতত মেডিক্যাল কলেজেই রয়েছে। শুনেছি এরপর গাইনি আর অবস্টেরিকসের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষায় বসবে।'

হরিদাস ওর বাহুতে একটা আলতো চাপড় মেরে বলল,—'তবে তো ভাই, তুমি বান্ধবীর হাল-হকিকৎ সব খবরই রাখ।'

দীপ্তেন্দু মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলল,—'এটা আবার একটা খবর নাকি? ওর দাদু বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ব্রজবিলাস সরকারের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের পরিচয়। অগ্নিবীণা যে জলপাইগুড়ি থেকে এসে মেডিক্যাল কলেজে হাউস-স্টাফশিপ

কমপ্লিট করছে সেটা তার মুখ থেকেই শুনেছি।'

কণা দত্ত বলল,—'ঠিক আছে। অগ্নিবীণা যখন মেডিক্যাল কলেজে রয়েছে তখন নিশ্চয় একদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

হরিদাস শুধোল,—'মেয়েটির সঙ্গে তোর কেমন করে পরিচয় হ'ল।'

'বা রে! ব্রজবিলাস সরকার মানে ওর দাদু তো আমাদের গ্রামেরই মানুষ। তবে বুলু অর্থাৎ অগ্নিবীণার অবশ্য পাঁচালের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই। কলকাতাতেই জন্ম। পড়াশুনো সব এখানেই হয়েছে। আমার সঙ্গে সেই রকমই পরিচয়।'

কণা দত্ত বলল,—'আমি কিন্তু অন্যরকম ভেবেছিলাম। মাধুরী সেন মানে ওই ভদ্রমহিলা মারা যাবার পর আপনি খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলেন। তখন অগ্নিবীণাই আপনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। দেখে মনে হয়েছিল, দুজনের মধ্যে গভীর ভালবাসা। ওর যে আবার অন্যত্র বিয়ে হতে পারে এটাই আমার চিন্তায় আসেনি।'

হরিদাস বলল,—'ওসব কথা থাক। লেট আস এনজয়। তোর আপেল জুস তো শেষ। আর একটা দিতে বলি?'

দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল। বলল,—'পাগল নাকি? এরপর তো আবার খাবার আছে। তুই বরং আর এক পেগ্ হুইস্কির অর্ডার দে।'

কণাকে লক্ষ্য করে হরিদাস বলল,—'তুমিও তাহলে আর এক পেগ জিনস্ নাও। মোটে তো দু-পেগ খেয়েছ।'

কণা দত্ত কিন্তু হরিদাসের প্রস্তাবকে আমল দিল না। বলল,—'আজ আর ড্রিঙ্কস্ থাক। তুমি বরং এবার খাবারের অর্ডার দাও। রাত্তিরও হয়েছে। দীপ্তেন্দুবাবুকে আবার পাথুরিয়াঘাটায় ছেড়ে আসতে হবে।'

আহার পর্ব সাঙ্গ হতেই কণা দত্ত একবার টয়লেটে গিয়ে ঢুকল। সেই ফাঁকে দীপ্তেন্দু শুধোল,—'এই , তোদের বিয়েটা কবে হচ্ছে বল? এখন তো আর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে কোনো বাধা নেই।'

হরিদাস ঈষৎ হাসল। বলল,—'আইনঘটিত কোনো বাধা অবশ্য নেই। কিন্তু বিয়েটা এখনই সেরে ফেলতে কণার একটু আপত্তি আছে।'

'আপত্তি কিসের?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

হরিদাস ম্লান হেসে বলল,—'ঘরপোড়া গোরু কিনা, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। ওর ইচ্ছে বছরখানেক দুজনে freely মেলামেশা করি। বিয়ের সিদ্ধান্তটা তারপর নিলেই সব দিক থেকে ভালো হবে। এই সময়ের মধ্যে একে অপরকে ভালোভাবে জানতে পারব। আর দোষগুণেই তো মানুষ। শেষপর্যন্ত adjustment হবে কিনা সেটাও তো যাচাই করে নেওয়া উচিত।'

দীপ্তেন্দু রীতিমত অবাক হয়ে বলল,—'তার মানে আরো এক বছর তোরা

এমনিভাবে কাটাবি?'

'হ্যাঁ। ফরেনে তো এসব আকছার হয়। পাঁচ-সাত বছর একসঙ্গে থাকার পরও কেউ কেউ বিয়ে করে।'

'কিন্তু তোরা তো আব একসঙ্গে মানে একই ছাদের নীচে বাস করবি না?'

'নাহ্। স্টে-টুগেদার এদেশে তেমন চালু হয়নি। তবে কণার যা বক্তব্য তার সঙ্গে আমি অনেকটা একমত। প্রেম করেই যখন বিয়ে করব তখন বছরখানেক না হয় বোঝাবুঝিতে কাটল।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আচ্ছা, যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর আগে বিয়ে হয়েছিল, উনি তো পাঞ্জাবী। মেডিক্যাল কলেজে কি দুজনেই একসঙ্গে পড়ত?'

হরিদাস মাথা নাড়ল। বলল,,—'ওই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ডাক্তার হতে যাবে কেন? He is a businessman. কলকাতায় এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা। কণার সঙ্গে কোন ফাংশনে যেন আলাপ। তারপর ঘনিষ্ঠতা,—ভদ্রলোকের নাম অর্জুন সিং। কণার মুখেই শুনেছি খুব হ্যাণ্ডসাম দেখতে। ফলে কণা ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তাব্পব একদিন বিয়ে হ'ল। কিন্তু জানিস তো, চাঁদের একটা দিকেই আলো, অন্যদিকটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিয়ের পর সেদিকটায় নজর পড়তেই কণা শিউরে উঠল। বিয়ের আগেই অমৃতা সিং নামে এক বিবাহিতা পাঞ্জাবী ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ব্যবসার কাজে অমৃতার স্বামীকে প্রায় দিল্লী যেতে হ'ত। সেখানে পাঁচ-সাত কখনও আট-দশদিনও কাটিয়েছে। আর এই সময়টা কণার হাজব্যাণ্ডের বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হ'ত। একটু একটু করে কণার কাছেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে অমৃতা সিং বাড়িতে টেলিফোন করত। কখনও কণাকেই বলত,—ভাবীজী, মেহেরবাণী করকে অর্জুন সিংজীকো থোড়া লাইন দিজিয়ে।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'ওদের বিবাহিত জীবন কতদিন স্থায়ী হয়েছিল?'

'বড়জোর দেড়-দু-বছর। তারপর কণা নিজেই সরে এলো। কিছুদিন একই বাড়িতে দুজনে আলাদা থাকছিল। আর, এই সময়টাই কণার সব চেয়ে দুঃখে এবং কষ্টে কেটেছে।'

'কষ্টে কেন?'

হরিদাস ম্লান হেসে বলল,—'জানিস দীপ্তেন্দু, পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা বড়ো ভঙ্গুর। একবার ভাঙতে শুরু করলে আর জোড়া লাগানো যায় না। তবে মেয়েরা অবশ্য আশ্রয় হারাবার ভয়ে স্বামীর গালমন্দ, অনৈতিক আচরণ, এমন কী মারধোর হজম করেও পড়ে থাকে। আর শেষদিকে অর্জুন সিং তাই শুরু করেছিল। মত্ত অবস্থায় কণার গায়ে হাত তুলতেও তার বাধত না। একদিন নাকি নেশা করে রাগারাগির পর মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটা ওর ডান পায়ের উরুর ওপর

কয়েক সেকেণ্ড চেপে ধরেছিল। যন্ত্রণায় কণা তখন অজ্ঞানের মতো হয়ে যায়। নেহাৎ চাকরি-করা ডাক্তার মেয়ে। তাই পরদিনই স্বামীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে বাড়িভাড়া নিয়ে অন্যত্র উঠে গিয়েছিল।'

টয়লেট থেকে কণা বেরিয়ে আসতেই হরিদাস ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল,—'সাড়ে দশটা বাজতে চলল। এবার যাওয়া যাক। আগে পাথুরিয়াঘাটায় দীপ্তেন্দুকে নামিয়ে দিয়ে আসি। তারপর তোমাকে drop করে আমার বাড়ি পৌছতে প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজবে।'

পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট এরই মধ্যে সুনসান নির্জন। শুধু এক রিকশচালক সওয়ারি-বিহীন একটা রিকশ নিয়ে রাস্তায় বাথাতুর কাতরানি তুলে তার গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। মেসের দরজার কাছে গাড়ি দাঁড়াতেই দীপ্তেন্দু নেমে পড়ল। খোলা দরজা দিয়ে কণাও বেরিয়ে এসে বলল,—'এটাই আপনার মেস বুঝি?'

চালকের আসনে বসে হরিদাস মন্তব্য করল,—'ভেতরে যেতে চাও? ঘুম ভাঙা চোখে তোমাকে দেখলে ওর রুম-মেট তিনকড়ি হাজরা নির্ঘাত কোনো ফিল্মের হিরোইন ভেবে বসবে।'

দীপ্তেন্দু তাকিয়ে দেখছিল কণাকে। হরিদাস মিথ্যে বলেনি। সবুজ সিল্কের শাড়ি পরনে। গায়ে স্লিভলেস ব্লাউজ। জামার পিছনে অর্ন্তবাসের আড়ালে ওর দুটি ভরাট স্তন। ব্রার স্ট্র্যাপ দুটো পাহাড়ের গা থেকে নেমে আসা দুটি উপনদীর মতো পিছনে কোথায় যে মিলিত হয়েছে, সামনে থেকে সেটা বোঝা দুষ্কর।

হরিদাস বলল,—'গাড়িতে উঠে ব'স। এত রাত্তিরে ওর ঘরে গিয়ে দাঁড়ালে তিনকড়ি হাজরা হয়তো তোমাকে আকাশের হুরী-পরীও ভাবতে পারে।'

গাড়ি হুস করে বেরিয়ে যেতেই দীপ্তেন্দু মেসে ঢুকে গেল।

সোমবার দুপুর নাগাদ অফিসের টেলিফোন যন্ত্রটা বেজে উঠতেই দীপ্তেন্দু রিসিভার তুলে সাড়া দিল। তার গলা শুনে অপারেটর বলল,—'মিঃ চ্যাটার্জী, আপনার ফোন।'

অপরপ্রান্তে অগ্নিবীণা, সে রহস্য করে হেসে বলল, —'খবর কী দীপ্তেন্দুদা? কণাদির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

দীপ্তেন্দুর খটকা লাগল। সে বলল,—'আশ্চর্য! তোমার কথা শুনলে মনে হয় দেখা হওয়ার খবরটা তুমি আগাম জানতে পেরেছ।'

'আগে বলুন, দেখা হয়েছে কি না?' অগ্নিবীণার কণ্ঠে সেই রহস্য আবার প্রকাশ পেল।

দীপ্তেন্দু ঈষৎ গম্ভীর গলায় জানাল,—'হ্যাঁ, দেখা হয়েছে।'

অগ্নিবীণা শুধোল,—'আমি কেমন করে জানলাম বলুন তো?'

'বা রে! আমি থট রিডিং জানি নাকি যে হাত গুনে তোমার মনের কথা টের পাব?'

শুনে অগ্নিবীণা খিলখিল করে হাসল। বলল,—'জানেন, কণাদি আজ সকালেই মেডিক্যাল কলেজে এসেছিল। গাইনি ওয়ার্ডে ঢুকেই আমাকে খুঁজে বের করল। তারপর একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল,—'দীপ্তেন্দু চ্যাটার্জীকে তুমি চেন নিশ্চয়? এখন বঙ্গভূমি কাগজের রিপোর্টার। সেই যখন আমি এখানে হাউস স্টাফ ছিলাম তখন উনি একজন পেশেণ্টকে নিয়ে এসেছিলেন না?' ওর কথা শুনে দুটো জিনিস পরিষ্কার বুঝলাম। এক কণাদির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে। দুই, আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথাটা ওর কাছে ভাঙেন নি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'একদিনেই কি সব কথা বলতে আছে বুলু?'

'না জানিয়ে অবশ্য ভালোই করেছেন। তবে কণাদি একটা-কিছু সন্দেহ করেই এসেছিল। আর মেয়েদের কৌতূহল বোঝেনই তো? তাই ব্যাপারটা জানার জন্য খুব চাপাচাপি করে গেল। কিন্তু আমি ওর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'শুনেছ নিশ্চয় এখনই ওরা বিয়ে করবে না। অন্তত একটা বছর অন্তরঙ্গ মেলামেশা করে দুজনেই উভয়কে বুঝে নিতে চেষ্টা করবে। তারপর নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুবে।'

অগ্নিবীণা বলল,—'এক হিসেবে সেটাই ভালো দীপ্তেন্দুদা। আর কণাদি জীবনের একটা তিক্ত অধ্যায় তো ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছে। সেজন্যই বোধহয় এখন মেপে মেপে পা ফেলতে চায়।'

সংক্ষিপ্ত হবার জন্য দীপ্তেন্দু বলল,—'অনেক কাজ পড়ে আছে বুলু। লাইনটা এখন ছাড়ি।'

'বেশ। কিন্তু আপনি কবে আসছেন?'

'যাব একদিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'গতকাল অর্থাৎ রবিবারে আপনি আসেন নি। আমি কিন্তু আশা করেছিলাম দীপ্তেন্দুদা।' শেষের দিকে অগ্নিবীণার কণ্ঠস্বর বেশ নরম শোনাল। কেমন ভিজে গলায় সে বলল,—'বুঝতে পারেন না কেন, রবিবার হলেই সকাল থেকে আমার চোখ দুটো কেবলি পথের দিকে চলে যায়।'

'ঠিক আছে। পারলে এই রবিবারেই তোমাদের বাড়ি যাব।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দীপ্তেন্দু কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনটা খুব খারাপ লাগছিল। সামনে তাকিয়ে দেখল নীলিমা দত্তের সীটটা খালি। রতিকান্ত বসু নিশ্চয় কোথাও পাঠিয়েছেন। তাই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। টেলিফোনটা নামিয়ে রাখার পর তার মানসিক পরিবর্তন নিশ্চয় নীলিমা দত্তের

নজর এড়াত না। কিন্তু এখন সে ভয় নেই। টেলিফোনটা কার, কোথা থেকে এলো এরকম কোনো অশোভন প্রশ্নের জবাব এই মুহূর্তে তাকে দিতে হবে না।

॥ বারো ॥

সপ্তাহের বাকি কটা দিন কাজেকর্মের ভেতর কাটল। মাঝে একদিন রতিকান্ত বসু তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'পশ্চিম বাংলায় ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা একটা প্রতিবেদন ছাপতে চাই। গতবারের কোন কোন মন্ত্রী বাদ পড়লেন, নতুন কারা এলেন আলোচনায় অবশ্য এ সবের উল্লেখ থাকবে।'

দীপ্তেন্দু মুখ তুলে কী যেন বলবার চেষ্টা করতেই রতিকান্ত বসু বললেন,—'বুঝতে পেরেছি, প্রতিবেদন লিখতে গেলে তোমার পুরানো কাগজের দরকার। কিন্তু আমাদের অফিসের লাইব্রেরিতে ১৯৫৭ সালের কাগজ থাকার কথা নয়। কারণ তখন বঙ্গভূমি কাগজের জন্মই হয় নি। তুমি বরং একটা কাজ করো। এসপ্ল্যানেডে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর একটা ছোট সেকশন আছে। ওখানে পুরানো সংবাদপত্র যত্ন করে রাখা হয়। সময় করে একবার সেখানে গিয়ে তোমার যা প্রয়োজন সেটা নোট করে নিয়ে এসো।'

সে নিজের সীটে এসে বসতেই নীলিমা দত্ত শুধোলেন,—'সম্পাদক তোমাকে কেন ডেকেছিলেন দীপ্তেন্দু? নিশ্চয় কোনো নতুন কাজ দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে ফের নতুন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। এই বিষয়েই উনি একটা নিবন্ধ ছাপতে চান। সেটাই তৈরি করতে বললেন।'

'তাহলে লেগে পড়। তোমার অবশ্য এসব লেখার হাত আছে। সেজন্যই কাজটা উনি তোমাকে দিয়েছেন।'

দীপ্তেন্দু চেয়ারে বসে কাজে মন দিতে যাবে এমন সময় তাদের কাগজের ফিল্ম জার্নালিস্ট মিলন সান্যাল এসে হাজির। বলল,—'ব্যাপার কী? আপনার বন্ধু তমালকুমারের সম্বন্ধে অনেক খবর শোনা যাচ্ছে মশায়।'

দীপ্তেন্দু ভালোমানুষের মতো মুখ তুলে তাকাতেই সে আবার বলল,—'দেখে মনে হচ্ছে আপনি কিছু জানেন না।'

'বা রে! জানব কেমন করে? খবরটা কী সেটাই তো বলেন নি।'

'কী আর বলব? আপনার বন্ধু মানে তমালকুমারকে এখন প্রায়ই এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে চৌরঙ্গী অথবা পার্ক স্ট্রীটের নামী রেস্তোরাঁয় দেখা যায়।'

'তাই বুঝি?' দীপ্তেন্দু অজ্ঞানতার ভান করল।

মিলন সান্যাল বলল,—'আপনি অবাক করলেন মশায়। তমালকুমার আপনার এত বুজম্ ফ্রেণ্ড। অথচ তার এই প্রেমলীলার বিন্দুবিসর্গও আপনাকে বলে নি।'

দীপ্তেন্দু কোনো জবাব দিল না। আরো কিছু শোনার জন্য সাগ্রহে তাকাল।

মিলন সান্যাল বলল,—'মেয়েটি অবশ্য ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীর নয়। শুনেছি একজন ডাক্তার। কোন হাসপাতালের সঙ্গে যেন attached.'

দীপ্তেন্দু মুচকি হেসে বলল,—'আপনি বরং ভদ্রমহিলার সঙ্গেই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন। তাহলেই ভেতরের খবর সব জানা যাবে।'

মিলন সান্যাল মাথা নাড়ল। বলল,—'তার চেয়ে বরং আপনিই একবার বন্ধুর কাছ থেকে ঘুরে আসুন। মেয়েটি কে, তার সঙ্গে হঠাৎ কোথায় পরিচয় হ'ল, ইয়ে, মানে তমালকুমার ওকে বিয়ে করবে কি না এই স্কুপ নিউজগুলো পেলেই আমরা কাগজে ছাপব। আর ভদ্রমহিলার একটা ছবি, সে একরকম জোগাড় হয়ে যাবে।'

দীপ্তেন্দু ঈষৎ হেসে জানাল,—'আপাতত আমি খুবই ব্যস্ত। সম্পাদক একটা প্রতিবেদন লিখতে বলেছেন। উনি শীগগীর সেটা ছাপতে চান। তাছাড়া এসব ব্যক্তিগত বিষয়ে হরিদাসকে কিছু জিজ্ঞেস করা কি শোভন হবে মিলনবাবু?'

অনিচ্ছুক ঘোড়াকে টানতে টানতে হয়তে পুকুরে নিয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু তাকে জল খাওয়ানো যায় না। সেটা বুঝতে পেরেই মিলন সান্যাল আর দীপ্তেন্দুকে বিরক্ত করল না। একটা হতাশ ভঙ্গি করে সে ধীরে ধীরে নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

রবিবার সকালে পাথুরিয়াঘাটার মেস থেকে যখন সে ডাফ স্ট্রীটে এসে পৌঁছল তখন ঘড়িতে নটা বাজে। বৈঠকখানা ঘরে ব্রজবিলাস সরকারকে না দেখে দীপ্তেন্দু একটু অবাক হ'ল। ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতেই অগ্নিবীণা পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো। বলল,—'এসে গিয়েছেন তাহলে।' তারপর একগাল হেসে জানাল,—'আজ কিন্তু খুব early.'

'তাই বুঝি? এখন তো মনে হচ্ছে দেরি করে এলেই ভালো ছিল। তাহলেই বোধহয় তুমি খুশি হতে।'

'আশ্চর্য মানুষ আপনি।' অগ্নিবীণা মুখখানা ঈষৎ গম্ভীর করে বলল,—'আমি কি সে কথা বলেছি?'

দীপ্তেন্দু কোনো জবাব না দিয়ে শুধোল,—'দাদু কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?'

অগ্নিবীণা বলল,—'সকালে কে একজন দাদুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাকে সঙ্গে নিয়েই তো কংগ্রেস অফিসে গেলেন। তখন সাড়ে সাতটা হবে। ঘণ্টা

দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসার কথা।'

'আমি যে আসব সে কথা বলেছিলে তাকে?'

'হ্যাঁ।' অগ্নিবীণা ঘাড় হেলিয়ে ইতিবাচক ভঙ্গি করল।

বলল,—'এলেই আপনাকে চা-জলখাবার দিতে বলে গেছেন। আপনি একটু বসুন না দীপ্তেন্দু দা। আমার মনে হয় সাড়ে নটার মধ্যেই দাদু ঠিক ফিরে আসবেন।'

ঘরের ভেতর টেবিলে চা আর জলখাবার দিয়ে অগ্নিবীণা তাকে ডেকে নিয়ে গেল। আজ আর লুচি বেগুনভাজা নয়। কিসমিস আর কাজুবাদাম দিয়ে মোহনভোগ তৈরি করে তাকে খেতে দিয়েছে অগ্নিবীণা। পাশেই ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা। চেয়ারে বসে দীপ্তেন্দু শুধোল, 'অবিনাশকাকা কোথায়? তাকেও তো দেখছি না।'

অগ্নিবীণা বলল,—'বাবা বাজারে গিয়েছেন। এই তো খানিক আগে বেরোলেন। মনে হয় তারও ফিরতে দশটা বাজবে।'

দ্রুত একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দীপ্তেন্দু বলল,—'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী কথা?'

'মানে, তুমি যদি কিছু মনে না কর।' দীপ্তেন্দু ফের সঙ্কোচ প্রকাশ করল।

'এত ভণিতা কেন করছেন বলুন তো? কী এমন কথা যা বলতে গিয়ে আপনাকে ঢোক গিলতে হচ্ছে।'

এবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে দীপ্তেন্দু বলল,—'সৌম্যকান্তিবাবুর চিঠির কোনো জবাব দিয়েছিলে?'

'এই কথা?' অগ্নিবীণা ভ্রু বাঁকিয়ে মুচকি হাসল। বলল,—'ওর চিঠির জবাব দিলে সেটা হয়তো আপনাকে একবার দেখিয়ে নিতাম।'

'না, মানে, আমি সেকথা বলিনি বুলু।' দীপ্তেন্দু সাফাই গাইল।

অগ্নিবীণা ঈষৎ হেসে জানাল,—'আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন দীপ্তেন্দুদা? ওর চিঠির উত্তর দেব মনে করলে সেটা নিশ্চয় আপনাকে পড়তে দিতাম না।'

দীপ্তেন্দু কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর বলল,—'দাদু কি তোমার শাশুড়িকে চিঠির জবাব দিয়েছেন?'

'আমার তাই মনে হয়।' অগ্নিবীণা একটু চিন্তা করে বলল। শেষে জানাল,—'তবে ওটা আমার অনুমান।'

মোহনভোগের প্লেটটা নিঃশেষ করে দীপ্তেন্দু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। বলল,—'দাদু ফিরে এসে হয়তো আমাকেই জিজ্ঞেস করবেন সৌম্যকান্তিবাবুকে তুমি কোনো চিঠি লিখেছ কি না?'

'সেজন্যই কি আমাকে প্রশ্নটা করেছিলেন?'

'না-না তা নয়।' দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল। বলল,—'আচ্ছা, দাদু এই কথাটা তোমার

কাছে জানতে চান নি?'

'নাহ্। তার কারণ দাদু কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও নাক গলান না। নেহাৎ এটা তার মহারানীর জীবনের একটা বিতর্কিত অধ্যায়। তাই বোধহয় আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।'

চা-পান শেষ করেই দীপ্তেন্দু উঠে দাঁড়াল। বলল,—'আমি বরং বৈঠকখানা ঘরে বসি। তুমি কাজ গুছিয়ে চলে এসো।'

অগ্নিবীণা যা বলেছিল তাই ঠিক। সাড়ে নটা বাজতেই ব্রজবিলাস ফিরে এলেন। তাঁর দীর্ঘ দেহ, দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে পা দিতেই দীপ্তেন্দু সহর্ষে বলল,—'আসুন দাদু। আপনার অপেক্ষায় আছি।'

ব্রজবিলাস চেয়ারে বসে প্রথমেই শুধোলেন,—'তুমি চা-জলখাবার খেয়েছ তো?'

'খেয়েছি বৈকি।' দীপ্তেন্দু হেসে জানাল। বলল, —'কিন্তু তার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

'তাঁর কাঁধের চাদরটা চেয়ারের হাতলে রেখে ব্রজবিলাস বললেন,—'তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল আমার।'

'কী কথা দাদু?' দীপ্তেন্দু শুধোল, 'কোনো সিরিয়াস বিষয়?'

'না মানে কথাটা তেমন সিরিয়াস নয়। তবে জানতে চাইছি।' ব্রজবিলাস ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলেন,—'মহারানী কি ওর স্বামীকে চিঠির জবাব দিয়েছে?'

'আপনার কী মনে হয় দাদু?'

ব্রজবিলাস চিন্তিত মুখে বললেন, —'আমার অনুমান, চিঠির জবাব সে দেয়নি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আপনার ধারণাই ঠিক। কিন্তু এই কথাটা তো ওকেই সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে পারতেন দাদু।'

'নাহ্ দীপ্তেন্দু। সেটা ঠিক হ'ত না। আসলে ব্যাপারটা খুব sensitive. আর তোমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তোমার পক্ষে এই ব্যাপারটা জানা যত সহজ, আমার পক্ষে সেটা তত কঠিন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কিন্তু আপনি তো তার শাশুড়িকে চিঠির উত্তর দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। না লিখে উপায় ছিল না। তার কারণ চিঠির উত্তর না দিলে কুটুম্বের সঙ্গে একটা অভদ্রতা করা হ'ত।'

'চিঠিতে কী লিখলেন জানতে পারি দাদু?'

'স্বচ্ছন্দে। লিখলাম, আপনার পুত্রবধূ যখন ডাক্তারির স্নাতকোত্তর পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন আরো কিছুদিন তাকে পড়াশুনো নিয়ে কলকাতায় থাকতে দিন।'

দীপ্তেন্দু কী যেন ভাবছিল।

ব্রজবিলাস ফের বললেন,—'ব্যাপারটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল দীপ্তেন্দু। মহারানী

আর শ্বশুরবাড়ি যেতে চায় না। আবার সৌম্যকান্তি মানে আমাদের নাতজামাই ওর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনতেও রাজী নয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্রজবিলাস মন্তব্য করলেন,—'তাহলে মহারানীর বাকি জীবনটা কি এমনি একা-একাই কাটবে?'

বৈকালিক চা-পানের পর দীপ্তেন্দু পাথুরিয়াঘাটার মেসে ফেরার জন্য বেরুল। অন্য দিনের মতো অগ্নিবীণা তাকে এগিয়ে দিতে এলো। ডাফ স্ট্রীট পিছনে ফেলে বিবেকানন্দ রোডে পা দিয়ে সে বলল,—'কণাদির সঙ্গে আর দেখা হয়েছে আপনার?'

'নাহ্। আর দেখা হ'ল কই? তবে—'

'তবে কী?'

দীপ্তেন্দু মুচকি হেসে জানাল,—'খবরের কাগজের লোকেরা ওদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছে।'

'কেন?'

'বা রে! ওদের দুজনকে মাঝে মাঝেই পার্ক স্ট্রীট অথবা চৌরঙ্গীর নামী-দামী হোটেলেও দেখা যায়। তাই নিয়ে যা হয়। গুঞ্জন শুরু হয়েছে।'

'এ তো ভারি মজার ব্যাপার।' অগ্নিবীণা সুন্দর একটি ভ্রূভঙ্গি করল। বলল, 'কিন্তু বছরখানেকের আগে ওরা তো সেটল করতেও চায় না।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'ফিল্মস্টারদের ব্যাপারই আলাদা। নইলে কি আর ওদের সেলিব্রিটি বলে?'

ট্রামলাইনের কাছে এসে দীপ্তেন্দু দাঁড়াল। বলল,—'তুমি এবার ফিরে যাও বুলু। আমি রাস্তা পেরিয়ে জোরে হাঁটব।'

আড়চোখে এক পলক তাকে লক্ষ করে অগ্নিবীণা বলল,—'আপনাকে এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করব দীপ্তেন্দুদা?'

'কী কথা বলো।'

'সৌম্যকান্তির চিঠির জবাব আমি দিয়েছি কি না, এই কথাটা হঠাৎ আপনার মাথায় এলো কেন?'

দীপ্তেন্দুর চোখের তারায় পলকের জন্য একটা ছায়াপাত হ'ল। সে ঢোক গিলে জিভটাকে ফের সচল করে নিয়ে জবাব দিল,—'ও কিছু নয়। এমনি মনে হ'ল তাই।'

অগ্নিবীণা কেমন অদ্ভুত হাসল। বলল,—'এমনি নয় দীপ্তেন্দুদা। আপনার মনে বোধহয় একটা সন্দেহ ছিল। সৌম্যকান্তির চিঠির জবাব দিয়ে যদি আবার জলপাইগুড়ি ফিরে যাই?'

দীপ্তেন্দু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। কোনো প্রতিবাদ করল না।

অগ্নিবীণা বলল,—'জলপাইগুড়ি নিশ্চয় যেতে হবে। তবে সেটা সৌম্যকান্তির জন্য নয়। আমার চাকরিটা তো সেখানেই। তাই পরীক্ষা শেষ হলে না গিয়েও উপায় নেই।' কেমন ম্লান হাসল অগ্নিবীণা। তারপর বলল,—'আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছেন? Between Scylla and Charybdis. এক একসময় মনে হয় সৌম্যকান্তির হাত থেকে বুঝি আমার নিস্তার নেই।'

রাস্তা পেরিয়ে দীপ্তেন্দু পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের পথ ধরল। আর অগ্নিবীণা নির্বাক পুতুলের মতো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। দীপ্তেন্দুর অপসৃয়মান দেহটা পথের জনারণ্যে মিলিয়ে যেতেই সে আবার পিছন ফিরল।

মাস কয়েক পর। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। রোদ এখনও নিরুত্তাপ নয়। দুপুরের দিকে বেশ গরম লাগে।

অফিসে যেতেই দীপ্তেন্দু শুনল কী একটা বিষয় নিয়ে তুমুল তর্ক চলছে। দীপ্তেন্দু তার সীটে গিয়ে বসতেই নীলিমা দত্ত বলল,—'সাঙ্ঘাতিক খবর। নেফা অঞ্চলে চীনাদের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ। অন্তত সতেরজন ভারতীয় সৈন্য হত।'

॥ তেরো ॥

রতিকান্ত বসু বললেন,—'সমস্যাটা তো ম্যাকমোহন লাইন নিয়ে। ভারত এবং চীন দুই দেশের মধ্যে ওটাই যে সীমারেখা তাই তো কেউ কেউ স্বীকার করতে চাইছেন না।'

চিফ রিপোর্টার সুধাময়বাবু বললেন,—'ম্যাকমোহন লাইন ব্রিটিশের সৃষ্টি। তখন চীন এমন শক্তিশালী ছিল না। অনেকের ধারণা ইংরেজরা সে সময় নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো ম্যাকমোহন লাইন তৈরি করেছিল। ফলে এই কাল্পনিক সীমান্ত রেখাটি চীন দেশের বহু অংশকে তার মূল ভূখণ্ডে অর্ন্তভুক্ত করেনি।'

মিলন সান্যাল বলল,—'ম্যাকমোহন লাইন নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক উত্তেজনাপূর্ণ অধিবেশন হয়েছে। এবং সেই অধিবেশনে ম্যাকমোহন লাইনই যে দুই দেশের মধ্যকার সীমারেখা,—এই প্রস্তাব মাত্র একটি ভোটের আধিক্যে গৃহীত হয়। তার অর্থ এই যে প্রস্তাবটি সর্বসম্মত নয়। এর বিরুদ্ধে সরব ছিলেন কম্যুনিস্ট পাটির কিছু প্রথম সারির নেতা। তারা এই প্রস্তাব পাশ করানোর চেয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যাতে এর একটা নিষ্পত্তি হয় তার ওপরই গুরুত্ব দেন।

সোমেশ্বর ব্যানার্জী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে বলল,—'ভারতীয় এলাকা চীনা কবলমুক্ত কববার নির্দেশ দিয়ে নেহেরুজী সিংহল যাত্রা করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সীমান্ত যুদ্ধ যদি আরা ব্যাপক আকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণমেনন কি অবস্থার সামাল দিতে পারবেন?'

পিনাকী খাসনবীশ কাগজের একজন সাব-এডিটর। মিতভাষী, তবে সামনাসামনি নিজের অভিমত প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না। সে সম্পূর্ণ নিজস্ব ঢঙে ঈষৎ গম্ভীর গলায় বলল,—চীনের প্রকৃত ভূখণ্ড যাই হোক, পরে মাঞ্চুরিয়া, সিনকিয়াং এবং তিব্বত দখল করে সে মহাচীনে পরিণত হয়েছে। এখন আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড গ্রাস করতে সে উদ্যত।'

দীপ্তেন্দু ইচ্ছে করেই কোনো মতামত প্রকাশ করেনি। সব শেষে সে বলল,—'যুদ্ধ এমনি চলতে থাকলে ভারত সরকার হয়তো জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারে।'

দীপ্তেন্দু যা বলেছিল শেষপর্যন্ত তাই ঘটল। সমস্ত অক্টোবর মাস ধরে যে সীমান্ত যুদ্ধ চলছিল তারই ফলশ্রুতি হিসেবে অক্টোবরের ছাব্বিশ তারিখে সমগ্র ভারতে প্রথমবার জরুরী অবস্থা ঘোষিত হ'ল। এটি অবশ্যই ৩৫২ ধারার প্রয়োগ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার এক সংবিধান প্রদত্ত প্রয়াস।

রতিকান্ত বসু বললেন,—'ভারতরক্ষা আইনের বলে পার্টির বেশ কয়েকজন নেতাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। হয়তো আরো ধরপাকড় হবে।'

মিলন সান্যাল বলল,—'পি, টি, আই আজই খবর দিয়েছে ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করে চীনা সৈন্য নানা স্থানে প্রবেশ করেছে। ওয়ালং আর জং'এ তুমুল সংঘর্ষ।'

পিনাকী খাসনবীশ জানাল,—'নেফায় চীনারা নতুন রণাঙ্গন খুলে বড় কামান এবং স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র সহযোগে আক্রমণ শুরু করেছে।'

কয়েকদিনের মধ্যেই কংগ্রেস ময়দানে বিশাল জনসভার ডাক দিল। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বস্ব পণ। প্রায় লক্ষাধিক লোকের দুর্জয় ঘোষণা। দেশাই স্বর্ণবণ্ড চালু করলেন।

নেফায় নিত্যনতুন সীমান্ত সংঘর্ষের সময় দীপ্তেন্দু বেশ কিছুদিন ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে যায় নি। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই অগ্নিবীণা তাকে টেলিফোন করে বলল,

—'ব্যাপার কি দীপ্তেন্দুদা? আপনি কি আমাদের ভুলে গেলেন নাকি?'

দীপ্তেন্দু হাসতে হাসতে বলল,—'আশ্চর্য! ভুলে যাব কেন? তবে দেশের পরিস্থিতি দিন দিন কেমন হচ্ছে তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ?'

'আমার অত বুঝে কাজ নেই।' অগ্নিবীণা ঠোঁট উল্টিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের

ভঙ্গিতে তার যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করে বলল,—'আপনি কবে আসছেন বলুন। পরশু রবিবার আসবেন তো?'

'যেতে চেষ্টা করব।' দীপ্তেন্দু আশ্বাস দিল।

অগ্নিবীণা বলল,—'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। রবিবার সকালে আপনার আসা চাই। উঃ! কী ডেঞ্জারাস লোক আপনি দীপ্তেন্দুদা। প্রায় এক মাস ডুব মেরে বসে আছেন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি রবিবার যাচ্ছি। এর অন্যথা হাবে না। হল তো?'

অগ্নিবীণা হেসে উঠল। শেষে যোগ করল,—'কথাটা যেন মনে থাকে মশায়।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে তার সীটের দিকে এগোতেই নীলিমা দত্ত বললেন,—'চীনারা ক্রমেই এগিয়ে আসছে দীপ্তেন্দু। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড চাপে ভারতীয় সেনারা দামচক ত্যাগ করে পিছিয়ে এসেছে। টেলিপ্রিণ্টারে এই মাত্র কী খবর এলো জানো?'

'কী খবর নীলিমাদি?' দীপ্তেন্দু সাগ্রহে তাকাল।

'কৃষ্ণমেনন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব থেকে অপসারিত। আপাতত নেহেরুজীই ডিফেন্সের কাজকর্ম দেখছেন। তবে অন্য কেউ শীঘ্রই প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব পেতে পারেন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে আমাদের বোধহয় আরো অস্ত্রের প্রয়োজন। তুরস্ক নাকি দূরপাল্লার হাউইটজার কামান দিতে সম্মত হয়েছে। ভারতের সাহায্যে প্রথম দফা মার্কিন সমরাস্ত্রের সম্ভার শীঘ্রই এসে পৌঁছবে।'

নীলিমা দত্ত বলল,—'পরিস্থিতি যে কী চেহারা নেবে এই মুহূর্তে কেউ তা বুঝে উঠতে পারছে না। ভয় হয় শেষ পর্যন্ত এটাই না একটা বড়সড় যুদ্ধের আকার নেয়।'

রবিবার সকালে ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়েছিল দীপ্তেন্দুর। এখন কাগজের অফিসে সীমান্ত-যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো খবরে কারো উৎসাহ নেই। তাই পি. টি. আই, রয়টার আর টেলিপ্রিণ্টারে আসা সমর-সংবাদ ভিন্ন অন্য নিউজের প্রতি খোদ সম্পাদকেরও অনীহা। তবু শনিবার বিকেলে হরিদাসের টেলিফোন পেয়ে সে একটু অবাক হ'ল। রিসিভারটা তুলতেই তারের অপরপ্রান্ত থেকে হরিদাস বলল,—'কোথায় থাকিস আজকাল? টেলিফোন করলেই তোদের অপারেটারের সেই এক জবাব,—উনি কাজে বেরিয়েছেন।'

দীপ্তেন্দু হেসে জবাব দিল,—'কাজে তো বেরুতেই হবে। চাকরিটা যখন রিপোর্টারের। আর রিপোর্ট সংগ্রহ করে আনাই তো আমার কাজ।'

হরিদাস বলল,—'ছুটির দিনে কি করিস? এই তো আগামীকাল রবিবার।

বিকেলে চলে আয় আমার এখানে।'

'তোর ওখানে যাওয়া মানেই তো রাত্তিরে ডিনার।'

'হ্যাঁ। সেটা তো অবশ্য।'

'তোর গার্ল-ফ্রেণ্ড আই মিন কণা দত্তও নিশ্চয় কমপ্যানি দেবেন।'

'Oh Sure!' হরিদাস সোৎসাহে জবাব দিল। শেষে বলল,—'কেন? ওর কমপ্যানি তোর ভালো লাগে না?'

'বারে! ভালো লাগবে না কেন? আমি কি সে কথা বলেছি?'

'তবে চলে আয়। কাল সন্ধ্যে ছটায়। এখানে ঘণ্টা দুই জমিয়ে আড্ডা দিয়ে তারপর পার্ক স্ট্রীট কিংবা চৌরঙ্গীর কোনো হোটেলে গেলেই হবে।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'কিন্তু কাল অসম্ভব।'

'কেন? অন্য কারো সঙ্গে appointment আছে?' হরিদাস সন্দিগ্ধ হল।

দীপ্তেন্দুর একবার ইচ্ছে করল সত্যি কথাটা ওকে বলে। আগামীকাল সকালে অগ্নিবীণা তাদের ফ্ল্যাটবাড়িতে তার পথ চেয়ে বসে থাকবে। রবিবার সমস্ত দিন ডাফ স্ট্রীটের ওই বাড়িতে কাটবে তার। দাদু অর্থাৎ ব্রজবিলাস সরকারের সঙ্গে নানা আলোচনা, অবিনাশ কাকার সঙ্গে কুশল বিনিময়। সকালে জলখাবার, দুপুরে লাঞ্চ, তারপর বৈকালিক চা-পান সেরে সে আবার ট্রামলাইন পেরিয়ে বিবেকানন্দ রোড ধরে পাথুরিয়াঘাটার মেসে যাবার জন্য হাঁটতে শুরু করবে। সমস্ত দিনটা অগ্নিবীণার মধুর সান্নিধ্যে কাটবে তার। কখনও কপট বিরক্তিতে ওর মুখ ভার হয়ে উঠবে। কখনও বা চোখের তারায় খুশির ঝিলিক। কখনও সে হাসিতে ডগমগ। সিক্ত বসনে কলসী কাঁখে ঘরেফেরা গ্রাম্যবধূর ভরা কুম্ভ যেমন ছলছলিয়ে ওঠে অনেকটা তেমনি। এমন একটা আনন্দঘন পরিবেশ ছেড়ে হরিদাস আর কণা দত্তের কাছে যাবার কথা ভাবতেই তর মন বিদ্রোহ করে উঠল।

সে রিসিভারে মুখ রেখে বলল,—'আসলে কি হয়েছে জানিস? চীন-ভারত সম্পর্কের ওপর আমাকে একটা নিবন্ধ লেখার দায়িত্ব দিয়েছেন সম্পাদক। সেটা লিখতে হলে একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যাওয়া প্রয়োজন। ভাবছি আগামীকাল দুপুরটা লাইব্রেরীতেই বইপত্তর ঘেঁটে কাটাব।'

হরিদাস ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে জানাল,—'তাই বলে রবিবার ছুটির দিনটাও অফিসের কাজ নিয়ে পড়ে থাকতে হবে?'

দীপ্তেন্দু হেসে জবাব দিল,—'এটাকে অফিসের কাজ বলে ভাবছিস কেন? চীন-ভারত সম্পর্কের আজ যে অবনতি হয়েছে তারও তো একটা প্রেক্ষাপট বা ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে। বইপত্তর-নথি ঘেঁটে সেটা খুঁজে বের করাও কম রোমাঞ্চকর নাকি?'

হরিদাস হাসছিল। বলল,—'তুই অবশ্য চিরকালই বইয়ের পোকা। কিন্তু সেই

অভ্যেসটা যে এখনও ছাড়তে পারিস নি, সেটাই আজ বুঝতে পারছি।'

ডাফ স্ট্রীটে যাবার পথে তার হঠাৎ একজন লোককে দেখে খুব চেনা-চেনা মনে হল। কোথায় যেন আলাপ হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। অনেকসময় এরকম হয় তার। মুখ দেখে খুব চেনা-চেনা, পরিচিত লাগলেও লোকটিকে সে কিছুতেই মনে করতে পারে না। ইংরাজীতে বোধহয় একেই বলে,—Sorry, I Cannot place you. লোকটিও অন্তত দু-তিনবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে শেষে হেসে ফেলল। দীপ্তেন্দু খানিকটা আমতা -আমতা করে শুধোল,—'ইয়ে, মানে আমাকে চেনেন নাকি?'

'বারে! আমাকে ভুলে গেলেন বাবুজী?' লোকটি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল। তারপর নিজেই হো-হো করে হেসে উঠল। তার এই ঝকমকে হাসি প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ার মতো দীপ্তেন্দুর মনের আবছা আলো-আঁধারি ভাবটা মুহূর্তে দূর করল। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে তার। মধ্যপ্রদেশ থেকে কলকাতা ফেরার সময় এর সঙ্গেই তো একই কামরায় এসেছিল সে। তার সম্বন্ধে কত খোঁজখবর নিয়েছিল ভদ্রলোক। জামসেদপুরে তাকে পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খাইয়েছে। তারপর হাওড়া স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নামার পরও জিজ্ঞেস করেছিল,—'কলকাতায় সে কোথায় উঠবে?'

দীপ্তেন্দু সলজ্জ মুখে বলল,—'আপনাকে দেখে সত্যিই চিনতে পারিনি মহাবীরপ্রসাদবাবু। আমার ভুল হয়েছে। প্লিজ্ এক্সকিউজ মি।'

মহাবীরপ্রসাদ দিলখোলা, স্ফূর্তিবাজ লোক। ঈষৎ হেসে বললেন,—'এর জন্য আপনাকে সরমাতে হবে না বাবুজী। ভুল তো অমন হতেই পারে। ট্রেনে এক রাত্তির আসা। তারপর আরো কতদিন কেটে গেল বলুন। আর আমিই কি আপনাকে প্রথমে চিনতে পেরেছি? কিন্তু তারপর আপনার এই বাদামী ফ্রেমের চশমাটা দেখে সব মনে পড়ে গেল।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'এদিকে কোথায় এসেছিলেন মহাবীরপ্রসাদজী? আপনার গদী তো সেই হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীটে। বোধহয় উনত্রিশ নম্বর বাড়ি,—তিন তলায় গদী।'

মহাবীরপ্রসাদ সহাস্যে বললেন,—'বাড়ির নম্বরটা দেখছি ভোলেন নি বাবুজী। আর তিনতলায় গদী, সে কথাও বিলকুল মনে রেখেছেন। শুধু একটা কথা মনে ছিল না আপনার।'

'কি কথা?'

'কথা মানে একটা ছোট দুখ্ বাবুজী।'

'কিসের দুঃখ মহাবীরপ্রসাদজী?

'আপনি গদীতে একদিন আসবেন বলেছিলেন। কিন্তু এলেন না। বিলকুল ভুলে গিয়েছেন।'

দীপ্তেন্দু ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে জানাল,—'কিছু মনে করবেননা মহাবীরপ্রসাদজী। কাজেকর্মে আর ফুরসৎ পাইনি। নইলে মাঝে মাঝে আপনার কথা মনে পড়েছে বৈকি। ইচ্ছে থাকলেও শেষপর্যন্ত আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।'

মহাবীরপ্রসাদ আগরওয়াল তাকে প্রায় হাত ধরে একটা ছোট রেস্তোরাঁয় নিয়ে এলেন। বললেন,—'রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি গপ্-সপ্ হয় বাবুজী? বসুন দু-কাপ চা নিয়ে এখানে দশ মিনিট কথা বলি।'

দীপ্তেন্দু ব্যস্ত হচ্ছিল। ঘড়ির কাঁটা কখন যে সাড়ে নটা পেরিয়ে গেছে সে খেয়াল করে নি। তার বারবার অগ্নিবীণার মুখখানা মনে পড়ছিল। দশ মিনিট গল্পসল্প করার ফাঁকে চা-পান সেরে এখান থেকে বেরোতেই দশটা বাজবে। তারপর ডাফ স্ট্রীটে পৌঁছতে সওয়া দশটা তো নির্ঘাত হবে। অগ্নিবীণার সঙ্গে সামনা সামনি দেখা হলে সে নিশ্চয় ছেড়ে কথা কইবে না। নটার বদলে সওয়া দশটা পর্যন্ত সে কোথায় ছিল তার কৈফিয়ত দিতে দীপ্তেন্দুকে হয়তো গলদঘর্ম হতে হবে।

চায়ের কাপে চুমক দিয়ে মহাবীরপ্রসাদ শুধোলেন,—'এখন কি কাজ-কাম করছেন বাবুজী?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমি একটা খবরের কাগজের অফিসে জার্নালিস্ট মানে সাংবাদিকতা করি।'

'সাংবাদিক মানে পত্রাকার?' মহাবীরপ্রসাদ ব্যাখ্যা করার ঢঙে কথা কইলেন। তারপর মন্তব্য করলেন,—'এ তো ভালো কাম বাবুজী।'

তাড়াহুড়োতে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে দীপ্তেন্দুর হঠাৎ জিভ পুড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,—'আপনার কাজ-কারবার কেমন চলছে মহাবীরপ্রসাদজী?'

'ভালো বাবুজী, খুব ভালো।' তারপর মুখ নামিয়ে ঈষৎ চাপা গলায় তিনি বললেন,—'এদিকে কেন এসেছিলাম জানেন?'

'কেন?' দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে তাকাল।

মহাবীরপ্রসাদ বললেন,—'একটা রিটেল শপ করবার ধান্দায় আছি। সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের ওপর একটা ঘরের খোঁজ পেয়েছিলাম। আজ সেটা দেখে গেলাম বাবুজী। এখন ভাবছি ছোট ভাইটাকে ওই রিটেল শপে বসিয়ে দেব। ওরও তো কিছু কাজ-কাম করা চাই।'

মহাবীরপ্রসাদ শুধোলেন,—'আপনি এখন কোথায় আছেন বাবুজী?'

'পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে,—আমার সেই পুরানো মেসে। কলকাতায় ফিরে ওখানেই একটা সীট পেয়ে গেলাম।'

'খুব ভালো কথা।' মহাবীরপ্রসাদ হাসতে হাসতে হঠাৎ একটু রহস্য করে বললেন,—'কিন্তু আপনারও এবার একটা বিয়ে-শাদি করা দরকার। চাকরি-বাকরি

করছেন।'

'ও সব পরে হবে।' দীপ্তেন্দু সরাসরি তার মত অগ্রাহ্য করল। বলল,—'আপাতত হাতে অনেক কাজ। রিপোর্টারের চাকরি করি তো। এক-একসময় নাওয়া-খাওয়ার ফুর্সৎ পাই না।'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে দীপ্তেন্দু উঠে দাঁড়াল। বলল,—এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ তাহলে চলি। তারপর ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল—'একটু লেট হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, যান আপনি। ফির কোই রোজ মিলেঙ্গে।' সহাস্যে তাকে বিদায় জানিয়ে মহাবীরপ্রসাদ আবার বললেন,—'কিন্তু গদীতে আপনাকে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে বাবুজী। এবার আর ভুলে যাবেন না যেন।'

'না-না, বারবার ভুল হবে কেন?' দীপ্তেন্দু ব্যস্তভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। তাপরর গতিবেগ প্রায় দ্বিগুণ করে লম্বা লম্বা পা ফেলে ডাফ স্ট্রীটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

॥ চৌদ্দ ॥

বৈঠকখানা ঘরে ব্রজবিলাস সরকার বসে। তার পাশে পরাশর। দীপ্তেন্দুকে অভ্যর্থনা করে দুজনেই বললেন,—'আরে এসো এসো দীপ্তেন্দু।' সে ঘরে ঢুকতেই ব্রজবিলাস ঈষৎ চিন্তিতমুখে বললেন,—'অনেকদিন তোমার দেখা নেই। তাই মহারাণীকে বলছিলাম একবার কাগজের অফিসে টেলিফোন করে খোঁজ নিতে। তা শরীর-টরীর ভালো আছে তো তোমার?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। শরীর ঠিক আছে। আসলে কাজকর্মের চাপে এখানে আসার ফুর্সৎ পাই না দাদু। তবে এবার আসতে সত্যি বড্ড দেরি হয়ে গেল। প্রায় তিন-সপ্তাহ এ-মুখো হইনি।'

হঠাৎ কুশল-প্রসঙ্গ ছেড়ে পরাশর বর্তমান সমস্যার ভেতরে ঢুকতে চাইলেন। দীপ্তেন্দুকে বললেন,—'সাংবাদিক হিসেবে ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের কি পরিণতি হবে বলে তুমি মনে কর?'

ব্রজবিলাস বাধা দিয়ে বললেন,—'এ আবার একটা কথা হ'ল নাকি তোমার? আচ্ছা, এ প্রশ্নের ওই বা কী জবাব দেবে? গণৎকার হলে না হয় ছক-টক, রাশিচক্র দেখে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করত।'

পরাশর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'অবস্থা খুব ভালো নয় হে দীপ্তেন্দু। আজকের কাগজটা নিশ্চয় দেখেছ? Bomdila has fallen to the

Chinese. তারপর সে-লা গিরিবর্তও চীনাদের কুক্ষিগত।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'সে যা হবার হবে। তবে আমার বিশ্বাস সীমান্ত ছাড়িয়ে এ যুদ্ধ কখনও মূল ভূখণ্ডে বিস্তারলাভ করবে না।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'ওয়াই বি চ্যবন এখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।' চীনাদের মোকাবিলায় ভারতীয় সেনা আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ মনে হলেও যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বদলাবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

দরজায় অগ্নিবীণা এসে দাঁড়াতেই আলোচনায় একটা ছেদ পড়ল। দীপ্তেন্দু মুখ তুলে সেদিকে তাকালে সে নিরুত্তাপ কণ্ঠে জানাল,—'আপনাকে ভেতরে জলখাবার দেওয়া হয়েছে দীপ্তেন্দুদা। এখন খাবেন চলুন।'

ব্রজবিলাস আর কোনো ওজর না করে বললেন, —'তবে তো উপায় নেই ভাই। এ হ'ল মহারাণীর হুকুম। ওকে যেতে দাও পরাশর। হুকুম তামিল না হলে বলা যায় না একটা অনর্থও ঘটতে পারে।'

পরাশর বললেন,—'আমি এবার উঠি হে ব্রজবিলাস। বেলাও হল। বিকেলে একবার কংগ্রেস অফিসে যাবার ইচ্ছে। পারতো সন্ধ্যে নাগাদ তুমিও এসো।'

দরজার বাইরে থেকেই অগ্নিবীণা তার কথার জবাব দিল। বলল,—'দাদুর শরীরটা ভালো নেই পরাশরদাদু। আজ বিকেলে আর বাইরে যেতে দেব না। মনে হয় একটা চাপা ঠাণ্ডা লেগেছে। হঠাৎ যদি সেটা বেড়ে যায় তাহলে রাত্তিরে জ্বরও আসতে পারে।'

পরাশর পিছন ফিরে বললেন,—'তাহলে আর বেরিয়ে কাজ নেই তোমার। এ যখন ডাক্তার মহারাণীর হুকুম। না মেনে তো উপায় নেই। সত্যিই তো, হঠাৎ যদি আবার ঠাণ্ডা লেগে যায় তাহলে রাত্তিরে জ্বরজাড়ি কী না হতে পারে বলো?'

অগ্নিবীণার পিছনে দীপ্তেন্দু ঘরের ভেতরে পা রাখল। টেবিলের ওপর একটা প্লেটে সদ্য ভাজা পরোটা আর আলুচচ্চড়ি রাখা ছিল। পাশেই একটা চীনামাটির বাটিতে দুটি রসগোল্লা।

দীপ্তেন্দু চেয়ারে বসতেই অগ্নিবীণা জিজ্ঞেস করল,—'আজ আপনার আসতে এত দেরি হ'ল যে।'

দীপ্তেন্দু পরোটার একটা টুকরো ছিঁড়ে মুখে দেবার আগে বলল,—'জানো রাস্তায় আজ হঠাৎ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। ওর সঙ্গে দুটো কথা বলতে গিয়েই যা দেরি।'

'ভদ্রলোকটি কে?' অগ্নিবীণা শুধোল

দীপ্তেন্দু বলল,—'ওর নাম মহাবীরপ্রসাদ আগরওয়াল। হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীটে রেডিমেড গারমেণ্টসের দোকান। মধ্যপ্রদেশ থেকে ফেরার সময় আমরা একই কামরায় এসেছি।'

'তাই বলুন। আমি ভাবলাম এই মাড়োযাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে বুঝি আপনাব অনেকদিনেব পরিচয।'

'না—না। সত্যি বলতে আজই ওব সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা। তবে হ্যাঁ, ভদ্রলোক খুব মিশুকে। চমৎকার কথা বলেন। প্রথম আলাপেই উনি মন জয় করে নিতে পারেন।'

দীপ্তেন্দুর খিদে পেয়েছিল। পরোটা দুটো চটপট গলাধঃকরণ করে শুধোল,—'তারপর তোমার হাউস-স্টাফশিপ কেমন চলছে বলো?'

'প্রায় এক বছর হতে চলল। আর একটা বছর মোটে বাকি। তাব পরেব বছবই তো পরীক্ষা দেব।'

'পরীক্ষা?' দীপ্তেন্দু অন্যমনস্কের মতো শুধোল।

অগ্নিবীণা বলল,—'বারে! পরীক্ষার কথা ভুলে গেলেন নাকি? তাহলে আর হাউসস্টাফশিপ কমপ্লিট করতে এলাম কেন? কমপ্লিট হলেই তো আমি গাইনি অ্যাণ্ড অবস্টেরিকসের পোস্টগ্র্যাজুয়েট পরীক্ষায় বসতে পারব।'

দীপ্তেন্দু হঠাৎ বলল,—'পোস্টগ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা দিয়ে তুমি আবার জলপাইগুড়ি ফিরে যাবে, তাই না বুলু?'

অগ্নিবীণা অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখখানা ঈষৎ গম্ভীর করে বলল,—'হঠাৎ এ প্রশ্ন করলেন কেন?'

দীপ্তেন্দু কোনো জুৎসই উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, —'না মানে এমনি।'

অগ্নিবীণা কেমন রহস্য করে হাসল। বলল,—'পোস্টগ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা দেব বলেই তো কলকাতায় এসেছিলাম দীপ্তেন্দুদা। সে কথা তো আপনি জানেন। পরীক্ষা শেষ হলেই আবার জলপাইগুড়ি ফিরে যাওয়ার কথা।'

তাব প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার কোনো উত্তর না দিয়ে দীপ্তেন্দু নির্বাক বসে রইল।

অগ্নিবীণা বলল,—'আমি জলপাইগুড়ি চলে গেলে আপনার খুব খারাপ লাগবে তাই না দীপ্তেন্দুদা? কিন্তু ভেবে দেখুন এখন এই মুহূর্তে এ ছাড়া আমার আর কি করবার আছে?'

দীপ্তেন্দু হাত বাড়িয়ে তার বাম হাতের নরম আঙ্গুলগুলি চেপে ধরল।

অগ্নিবীণা চাপা গলায় বলল,—'ছেড়ে দিন। কেউ যদি দেখতে পায়। রান্নাঘর থেকে বামুনদিদি হঠাৎ বেরিয়ে আসতে পারে।'

দীপ্তেন্দু দ্বিরুক্তি না করে তার হাতটা ছেড়ে দিল।

অগ্নিবীণা বলল,—'জলপাইগুড়ি ফিরে যেতে আমারই কি ভালো লাগবে ভাবছেন? কিন্তু এখানে মানে বাপের বাড়িতে আর কোন ছুতোয় পড়ে থাকব বলুন? তাহলেই লোকে পাঁচ কথা বলার সুযোগ পাবে। অন্তত জলপাইগুড়িতে বসে আমার শাশুড়ি ঠাকরুণ কি চুপ করে থাকবেন ভেবেছেন? তিনি তো এবার

খোলাখুলি দাদুকে লিখবেন ভালবাসার লোক আছে বলেই তো আমি কলকাতা ছেড়ে যাইনি। নানারকম ওজর আপত্তি করে শ্বশুরবাড়ি ফেরার কথা এড়িয়ে গেছি। এতদিন ডাক্তারির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পড়ার অছিলায় ছলচাতুরী করে কলকাতায় থেকেছি।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'তুমি কি তাহলে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছ?'

'আমি তো সেকথা বলিনি দীপ্তেন্দুদা, আসলে আমি চাকরি থেকে Study leave নিয়ে কলকাতায় পড়তে এসেছিলাম। এখন পরীক্ষার পর Study leave শেষ হয়ে যাবে। তাই আমার কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে চাকরিতে জয়েন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

দীপ্তেন্দু চুপ করে আছে দেখে সে আবার বলল,—'কিন্তু তার তো এখনও অনেক দেরি। আরো এক বছর হাউস-স্টাফশিপ। তারপর পরীক্ষা। আগে তো সেটা দিই। তারপর জলপাইগুড়ি ফিরে যাবার কথা ভাবলেই চলবে।'

অগ্নিবীণা তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেও দীপ্তেন্দুকে কেমন অবসন্ন লাগছিল। দু-এক মিনিট পরে সে বলল,—'এক-বছর হোক, দু-বছর হোক তারপর তো তোমাকে জলপাইগুড়ি ফিরে যেতে হবে বুলু।'

'হয়তো তাই।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অগ্নিবীণা আবার বলল,—'আমার হিসেব-নিকেশ যে কিছুই মিলছে না দীপ্তেন্দুদা। সৌম্যকান্তির চরিত্রের ওই অধঃপতন দেখে একদিন রাগ করে শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। সেদিন মনের কোণে একটা আশার আলো ছিল। আমার শাশুড়ি-ঠাকরুণ নিশ্চয় এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। যে বউ স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে তাকে কখনও খোসামোদ করে ফিরিয়ে আনতে আছে? সেই যে কথায় বলে,

বেঁচে থাক চূড়ো বাঁশী
রাই হেন কত মিলবে দাসী।'

দীপ্তেন্দুর নির্বাক মিইয়ে যাওয়া মুখখানির দিকে তাকিয়ে অগ্নিবীণা বলল,—'দেমাক করে শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম বলে শাশুড়ি নিশ্চয় কোর্টে ডিভোর্সের মামলা রুজু করবে। আর সে মামলায় বিবাদী যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা না করে তাহলে একতরফা ডিক্রি হতেই বা বাধা কোথায়? তখন সৌম্যকান্তির আর একটা বিয়ে দিতে নিশ্চয় তার মায়ের অসুবিধে হবে না।'

দীপ্তেন্দু শুধু বলল,—'হ্যাঁ। বিয়েটা ভেঙে গেলে তুমি আবার কলকাতায় ফিরে আসতে পারতে।'

'শুধু কলকাতায় ফেরার কথা ভাবছেন কেন দীপ্তেন্দুদা?' ডির্ভোস হলে আমার সামনে জীবনের পথটাই প্রশস্ত হয়ে থাকত। তখন নিশ্চয় একবার নতুন করে বাঁচবার কথা মনে হ'ত।' এক মুহূর্ত থামল অগ্নিবীণা। তারপর মুখ নামিয়ে বলল,—

'তখন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব দাদু নিজেই করতেন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কিন্তু তোমার স্বামী মানে সৌম্যকান্তিবাবু ডিভোর্সের মামলা করতে চান বলে তো মনে হয় না।'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন দীপ্তেন্দুদা। আসলে ওর দুরভিসন্ধিটা আমি বুঝতে পারছি না। ও কি এইভাবেই আমাকে ঝুলিয়ে রাখতে চায়? সৌম্যকান্তি ভাবছে স্ত্রী না থাকলেও নিত্যনতুন স্ত্রীলোকের সঙ্গ পেতে তার কোনো অসুবিধে নেই। আর আমাকে জব্দ করবে বলেই ডিভোর্সের মামলাটা এখন আদালতে আনতে চায় না। থাক তুমি একা পড়ে।' এক মুহূর্ত থেমে কী যেন চিন্তা করল অগ্নিবীণা। ফের বলল,—'জানেন দীপ্তেন্দুদা, ছেলেবেলায় একটা কাপালিকের গল্প পড়েছিলাম। সে নানা ছলছুতোয় রাজকন্যাকে তার গুহায় আসতে বলত। নানারকম প্রলোভন দেখালেও রাজকন্যা তার ফাঁদে পা দেয়নি। তারপর একদিন ওর হাতছানিতে রাজকন্যার মন টলল। একা কাপালিকের গুহায় ঢুকতেই সে মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে রাজকন্যাকে সম্পূর্ণ বশ করে তাকে বন্দী করে রাখল। রাজকন্যার ক্ষমতা ছিল না সেই কাপালিকের মন্ত্রের প্রভাব কাটিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'এ তুমি কি বলছ অগ্নিবীণা?'

'ঠিকই বলছি দীপ্তেন্দুদা। আপনাকে একটা খবর দেব বলেই আজ ডেকেছি।'

'কি খবর বুলু?'

'দুদিন আগে সৌম্যকান্তি আবার একটা চিঠি লিখেছে আমাকে।'

'সে কি? তুমি তো ওর চিঠির কোনো জবাব দাও নি।'

'নাই বা দিলাম। তাতে কি আসে যায়? আর আমি না উত্তর দিলেও দাদু তো ওর মায়ের চিঠির একটা জবাব দিয়েছেন। সেই পত্রের জের টেনেই সৌম্যকান্তির চিঠি লিখতে কোনো অসুবিধে হয় নি।'

দীপ্তেন্দু কোনো মন্তব্য করবার আগেই সে বলল,

—দাঁড়ান। চিঠিটা আপনাকে এনে দেখাচ্ছি।'

'সে কি?' দীপ্তেন্দু বাধা দিল। বলল,—'এ আবার কেমন কথা? স্ত্রীকে লেখা তোমার স্বামীর চিঠি আমিই বা বারবার দেখব কেন?'

অগ্নিবীণা বাঁকা হাসল। বলল,—'এ চিঠি আপনাকে স্বচ্ছন্দে পড়তে দেওয়া চলে। অন্তত পড়লে বুঝতে পারবেন কী সুন্দর কথার জাল বিছিয়েছে সৌম্যকান্তি।' বলেই সে আর দাঁড়াল না। চিঠিটা খুঁজে এনে দীপ্তেন্দুর হাতে দিয়ে বলল,—'নিন পড়ে দেখুন।'

অগ্নিবীণা চলে যেতেই সে ভাবছিল সে কী করবে? এ এক ফ্যাসাদ হয়েছে তার। বুলুকে লেখা তার স্বামীর চিঠি এমন লুকিয়ে-চুরিয়ে সেই বা পড়বে কেন? কিন্তু কৌতূহল এক বিষম বস্তু। কয়েক মিনিট বাদেই প্রায় নিজের অজান্তেই সে

দুই আঙ্গুলের সাহায্যে সৌম্যকান্তির লেখা চিঠিখানা টেনে বের করল। চিঠিতে লেখা—

প্রিয়তমাসু,

আমার পত্রের জবাব না পেয়ে তোমাকে আবার চিঠি লিখছি। ভাবছ লোকটা নেহাৎ নাছোড়বান্দা। নয়তো নির্লজ্জ হ্যাংলা অথবা আত্মসম্মানবোধ কম। তাই চিঠির উত্তর না পেয়েও তার আবার কলম ধরতে বাধে নি।

সত্যি কথা বলতে তোমাকে যে এখনও বেশ মনে পড়ে। ভুলতে চেষ্টা করলেও ভুলতে পারলাম কই? নইলে মা তো অনেকবার বলেছে এমন বউকে ঘরে রাখার চেয়ে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা ভালো। তার ইচ্ছে এই বিয়ের হেস্তনেস্ত হবার পর আবার একটা বিবাহের ব্যবস্থা করে। কিন্তু আমার মন তাতে সায় দেয় না।

তোমার দাদু অবশ্য লিখেছেন ডাক্তারির স্নাতকোত্তর পড়া পর্যন্ত তোমাকে কলকাতায় থাকতে দিতে। তার অর্থ এই যে কলকাতায় ডাক্তারির পড়া শেষ হলেই তুমি জলপাইগুড়ি ফিরে আসবে। তাহলে উপায় নেই। আমাকেও সেই আসা-পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

কাজেকর্মে যখন ব্যস্ত থাকি তখন তোমার স্মৃতিটা অনুক্ষণ আমাকে খোঁচা দেয় না। কিন্তু রাত্তিরে বিছানায় একলা শুয়ে বুঝতে পারি বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো তোমার স্মৃতি চেপে বসেছে। তখন তোমাকে বারবার মনে পড়ে। কেবলি ভাবি কেন যে তুমি চলে গেলে। আবার কবেই বা ফিরবে?

তোমার হাউসস্টাফশিপ শেষ হতে আর কতদিন বাকি? পরীক্ষাই বা কখন দিচ্ছ? চা-বাগানের যে সেন্ট্রাল হসপিট্যালে তুমি আছ তার মেডিক্যাল সুপারের সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল। ওর মুখেই শুনলাম তোমার স্টাডি লিভ আরো কিছুদিন বাকি আছে। এখন সেটাই আমার কাছে বড়ো সান্ত্বনা। ছুটি শেষ হলেই তুমি জলপাইগুড়িতে ফিরে আসবে।

ভাল থেক। মিছিমিছি অভিমান করে না থেকে এ চিঠির জবাব দিও। ভালবাসা—।

ইতি
তোমার স্বামী
সৌম্যকান্তি।

খানিকবাদেই ফিরে এলো অগ্নিবীণা। চিঠিখানি টেবিলে রাখা ছিল। সেদিকে ইঙ্গিত করে সে শুধোল,—‘পড়েছেন তো?’

দীপ্তেন্দু কেমন একটা অলস ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে। শান্ত, ঈষৎ নিরুত্তেজিত কণ্ঠে সে জবাব দিল,—‘তোমার স্বামী কিন্তু চমৎকার চিঠি লেখেন বুলু।’

'তাই বুঝি?' অগ্নিবীণা মুচকি হাসল। বলল.—'আপনি তাহলে ওর লেখার প্রশংসা করছেন।'

'অবশ্য চিঠির ভাষা, বাঁধুনী সবই তো মনে রাখার মতো।'

অগ্নিবীণা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল,—'আমি কিন্তু ওর চিঠির একটি কথাও মনে রাখতে চাই না। তার কারণ আমি জানি এ সবই ছল। আপনি কি ভেবেছেন জলপাইগুড়ি থেকে আমি চলে আসার পর ও বিরহে দিন কাটাচ্ছে? আপনি ওই লোকটাকে চেনেন না দীপ্তেন্দুদা। ওরা ভোগবাদী। ব্যঙ্গ করে আমার শাশুড়ি বলতেন তোমার দাদু সারাটা জীবন কী করলেন? দাদুকে বোঝার মতো ক্ষমতা কি ওদের আছে? আমার দাদু ত্যাগী মানুষ। বলতে পারেন সর্বস্ব ত্যাগ-করা এক সন্ন্যাসী। আর ওরা? আমার দাদাশ্বশুর রজতকান্তি, আমার শ্বশুর কণককান্তি এবং আমার স্বামী সৌম্যকান্তি,—এরা সবাই পৃথিবীতে এসেছে শুধু লুটে পুটে নিতে। বিলাসে-ব্যসনে ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ওদের কাছে নারী শুধু ভোগের বস্তু। তার বাছবিচার নেই। চা-বাগানের মদেসিয়া মেয়ে থেকে, নেপালী কাঞ্ছী কারো প্রতি ওদের আসক্তি কম নেই।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'এসব কথা এত জোর গলায় বলতে নেই। রান্নাঘরে বামুনদিদি শুনতে পেলে কী ভাববে?'

'কী আবার ভাববে? ওদের কি জানতে কিছু বাকি আছে? সে যাই হোক এ চিঠির কথা আপনি দাদুকে যেন বলতে যাবেন না। এমনিতেই শরীরটা ভালো নেই। আবার এসব কথা মাথায় ঢুকলে মিছিমিছি কষ্ট পাবেন।'

দুপুরের খাওয়ার পর ব্রজবিলাস বললেন,—'তুমি একটু জিরিয়ে নাও দীপ্তেন্দু। অক্টোবর মাস হলেও রোদের তেজ কমেনি। বেলা পড়লে চা খেয়ে মেসে যাবে।'

তার মুখের দিকে তাকিয়ে দীপ্তেন্দু বলল,—'আপনার শরীরটা তো ভালো নেই দাদু। অগ্নিবীণা বলছিল আপনাকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে মেডিসিনের কোন প্রফেসরকে দেখিয়ে আনবে। তা একবার যান না, দেখিয়ে আসতে তো কোনো দোষ নেই। ওষুধ-টসুধ খেলে অনেক সময় দুর্বলতা কেটে যায়। আজকাল নতুন-নতুন সব চিকিৎসা-পদ্ধতি বেরিয়েছে।'

ব্রজবিলাস ম্লান হাসলেন। শুধোলেন,—'আমার কত বয়স বল দিকি?'

দীপ্তেন্দু চুপ করে আছে দেখে আবার বললেন,—

বিশ্বকবির ভাষায় বলতে গেলে সেটা—

'কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন।
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি একবয়সী জেনো।'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'কত আর বয়স হবে আপনার? ষাট-বাষট্টি। তার বেশি তো নয়।'

ব্রজবিলাস হাসছিলেন। বললেন,—'তার চেয়ে অনেক বেশি। গত বৈশাখে আমি সত্তর পেরিয়ে এসেছি। আর এই শরীরটার ওপর তো কম অত্যাচার করিনি। এখন সেও ছেড়ে কথা কইবে না।'

বিকেল হতেই দীপ্তেন্দু চা খেয়ে ডাফ স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। অন্যদিনের মতো অগ্নিবীণাও এসেছিল তার সঙ্গে। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ক্রশিঙে এসে সে বলল,—'মাঝে মাঝে আসবেন দীপ্তেন্দুদা। আপনি এলে দাদু বড়ো আনন্দ পান।'

'চেষ্টা করব বুলু। আসলে সব রবিবারেই তো ফাঁকা থাকি না।'

অগ্নিবীণার মুখের দিকে তাকিয়ে দীপ্তেন্দু আবার বলল,—'আমার মনে হয় তোমার ওই চিঠিটার কথা দাদু জানেন না।'

'জানবেন কেমন করে? আমি কি বলেছি? তাছাড়া কার চিঠি এলো এসব বিষয়ে দাদুর কৌতূহল প্রায় নেই।'

দীপ্তেন্দু বলল,—''আমি ভেবেছিলাম অন্যদিনের মতো দাদু বোধহয় তোমার শ্বশুরবাড়ির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবেন, কিন্তু এবার আর সে পথেই হাঁটলেন না।'

অগ্নিবীণা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল,—'এর কারণ দাদু বেশ বুঝতে পেরেছেন আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। কারণ জলপাইগুড়ি মানে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে আমি রাজী নই।'

॥ পনেরো ॥

পরদিন অফিসে যেতেই রতিকান্ত বসু তাকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে দীপ্তেন্দু দেখল চিফ রিপোর্টার সুধাময়বাবু সেখানে বসে আছেন।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সম্পাদক বললেন,—'এই মাত্র টেলিফোন পেলাম চীন নাকি একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। তবে নেফা থেকে কবে নাগাদ চীনা সৈন্য সরানো হবে তা এখনও জানায় নি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'It's a good news Sir. অন্তত সীমান্ত সংঘর্ষ বড় যুদ্ধের আকার নিতে যাচ্ছে না।'

চিফ রিপোর্টার সুধাময়বাবু বললেন,—'সমগ্র বিশ্ব চীনের এই মনোভাবকে স্বাগত জানাবে। আর সংঘর্ষ একবার ছড়িয়ে পড়লে দাবানলের মতো তাকে নির্বাপিত করা কঠিন হত।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'আপনি একবাব প্রেস ট্রাস্টের অফিস থেকে ঘুরে আসুন দীপ্তেন্দুবাবু। এখনও টেলিপ্রিন্টারে কোনো খবর আসেনি। অথচ সংবাদটা বিস্তারিতভাবে জানা খুবই প্রয়োজন। যাবাব সময় আপনি বরং নীলিমা দত্তকেও সঙ্গে নিতে পারেন।'

সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের সীটে এসে দীপ্তেন্দু সগর্বে জানাল,—'চীন একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে বলে খবর এসেছে। সেটাই প্রেস ট্রাস্ট থেকে যাচাই করে আসতে বললেন রতিকান্তবাবু। কবে নাগাদ চীনা সৈন্য ভারতের মাটি থেকে অপসারণ শুরু হবে তাও জেনে নিতে বলেছেন।'

তার কথা শেষ হতেই মিলন সান্যাল কাছে এসে বলল,—'প্রেস ট্রাস্ট থেকে ঘুবে আসুন আপনি। তারপর একটু বসবেন আমার সঙ্গে।'

'ব্যাপার কি?' দীপ্তেন্দু জিজ্ঞাসু হ'ল।

বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করে মিলন সান্যাল বলল,—'আরে মশায়, আপনার বন্ধুর বিষয়ে তো আর কান পাতা যাচ্ছে না। একটা সিনেমা ম্যাগাজিনে কী কেচ্ছাটাই না বের করেছে।'

'কেচ্ছা?' দীপ্তেন্দু ভুরু কোঁচকাল।

মিলন সান্যাল বলল,—'একে কেচ্ছা ছাড়া আর কি বলবেন? কোন এক ডাক্তার মহিলার সঙ্গে আপনার বন্ধু প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘোরাফেরা করে। দুজনের একটা ঘনিষ্ঠ ছবিও ছেপে দিয়েছে।'

দীপ্তেন্দু হাসছিল। বলল,—'ঠিক আছে। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে পরে আলোচনা করলেই হবে। আপাতত প্রেস ট্রাস্টের অফিস থেকে একবার ঘুরে আসি।' তারপর নীলিমা দত্তের দিকে তাকিয়ে বলল,—'নীলিমাদি, সম্পাদক আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'আমাকে?' নীলিমা দত্ত পাল্টা প্রশ্ন করলেন। শেষে অনেকটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বললেন,—'যখন যেতে আদেশ করছেন তখন চল ঘুরে আসি।'

অফিস থেকে বেরিয়ে দীপ্তেন্দু বলল,—'এখনই কি টিফিন করবেন নীলিমাদি?'

'আরে না-না। এই তো মোটে সাড়ে এগারোটা বাজল। বরং ফেরার সময় কোথাও বসে চা-টা খেলেই হবে।'

মহাত্মা গান্ধী রোডে এসে দীপ্তেন্দু একটা ট্যাক্সিকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। গাড়িতে উঠতেই মিটার ডাউন করে ড্রাইভার শুধোল,—'কোথায় যাবেন?'

'প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার অফিস।'

নীলিমা দত্ত বললেন,—'খবরটা সত্যি। নইলে মিছিমিছি কেউ টেলিফোন করে জানায় যে চীনারা একতরফাভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছে?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'অবশ্য টেলিফোন করেও খবরটা জেনে নেওয়া যেত।'

'নাহ্। রতিকান্ত বসু তাতে সন্তুষ্ট হতেন না। খোদ প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার অফিস থেকে খবরের সত্যাসত্য যাচাই করে নিলে তবে উনি সেটি গ্রহণ করবেন।'

প্রেস ট্রাস্টের অফিস থেকে জানা গেল খবরটা এক'শ ভাগ সত্যি। এতক্ষণে টেলিপ্রিন্টারে নিউজ হয়তো পৌঁছে গেছে। তবে সৈন্যাপসরণ কবে থেকে শুরু হবে সে বিষয়ে এখনও কোনো ঘোষণা করেনি। সেটা কয়েকদিনের মধ্যেই হতে পারে।

দীপ্তেন্দু বলল,—'ওটা তো এখন রুটিন ব্যাপার। যুদ্ধবিরতি যখন ঘোষণা হয়েছে তখন ভারতের মাটি থেকে চীনা সৈন্যদের সরতেই হবে।'

একটা কাফে গোছের দোকানে ঢুকে দীপ্তেন্দু বলল,—'আজ কি খাবেন বলুন নীলিমাদি? এখানে অবশ্য সাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড পাবেন না।'

'সেটা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কী আছে সেটাও তো জিজ্ঞেস করনি।'

মেনু কার্ডটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দীপ্তেন্দু বলল,—'দু-কাপ চা আর দুটো চিকেন ওমলেটের অর্ডার দিচ্ছি।' চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে দীপ্তেন্দু শুধোল,—'তারপর আপনার কি খবর বলুন নীলিমাদি?'

'কি খবর জানতে চাও?' নীলিমা দত্ত যেন রহস্য করলেন।

'বারে! আপনার বাড়ির খবর, মেয়ে কেমন আছে,—অন্যান্য কুশল-সংবাদ এসবই তো জানতে চাইছি।'

'উহুঁ।' নীলিমা দত্ত মুচকি হাসলেন। বললেন,—'তোমার প্রশ্নটা অত সাদামাটা নয়।'

'তবে?' দীপ্তেন্দু ভুরু কুঁচকে তাকাল।

নীলিমা দত্ত ঈষৎ গম্ভীর মুখে বললেন,—'তোমার প্রশ্নটা সোজা নয় এবং তার উত্তর আরো গভীরে।'

দীপ্তেন্দু কোন মন্তব্য করবার আগেই নীলিমা দত্ত ফের বললেন,—'সেদিন যে কাহিনী তোমাকে বলেছিলাম তুমি তারই পরিণতির কথা জানতে চাইছ।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আপত্তি না থাকলে সেটাই না হয় জানালেন।'

ইতিমধ্যে কাফের বেয়ারা দুটো চিকেন ওমলেট এনে টেবিলে রেখে গেছে। চামচ দিয়ে তারই একটা ছোট অংশ কেটে মুখে ফেললেন নীলিমা দত্ত। ঈষৎ হেসে বললেন,—'পরিণতি এখনও কিছু হয় নি। আর হলে তো জানতেই পারতে। তবে মনে হয় ভদ্রমহিলা শীগগীর ডিভোর্স দিতে পারেন। আসলে প্রফেসরের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এখন বন্ধুমহলে চাউর হয়ে গেছে। দুজনের আত্মীয়-বান্ধবদের কাছেও সেটা আর গোপন নেই। ব্যাপারটা যখন ফাঁস হয়ে গেছে তখন সম্পর্কটা জিইয়ে রেখে যে কোনো লাভ নেই অধ্যাপকের স্ত্রী বোধহয় সেটা বুঝতে পেরেছেন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'তাই হোক নীলিমাদি। আপনি সংসার-জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিন

হন, ঈশ্বরের কাছে এটাই প্রার্থনা করি।' মুখটা ঈষৎ নামিয়ে কী যেন চিন্তা করল দীপ্তেন্দু। তারপর বলল,—'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'কি কথা? নিশ্চয় বলতে পার। আর সব ঘটনাই তোমাকে বিস্তারিত জানিয়েছি দীপ্তেন্দু। প্রায় কিছুই গোপন করিনি।'

একটা ঢোক গিলে জিভটাকে ফের সচল করে নিয়ে দীপ্তেন্দু জানাল,—'না মানে বলছিলাম আপনার মেয়ে তো এখন বড় হয়েছে। বোধহয় ক্লাস নাইনে পড়ে। অধ্যাপকের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা নিশ্চয় তাকে বলেছেন?'

'অবশ্য।' নীলিমা দত্ত স্বীকারোক্তি দেবার ঢঙে কথা কইলেন। 'আমি একটি কথাও ওর কাছে গোপন করিনি। জানো তো ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যায়। বয়স এক হলেও একটি ছেলের চেয়ে একটি মেয়ের জ্ঞান, সাংসারিক বুদ্ধি অনেক পরিণত। তার একটা কারণ জীবনের রহস্যটা একটি ছেলের চেয়ে একটি মেয়ে অনেক আগেই বুঝতে পারে। তাছাড়া আজকালকার ছেলেমেয়েরা খুব intelligent এবং Practical। পরিস্থিতিটা দ্রুত অনুধাবন করতে পারে। আমার মুখে সব কথা শুনে মেয়ে বলল,—'উনি যদি সব জেনে তোমাকে গ্রহণ করতে রাজী থাকেন, তাহলে তোমার পিছিয়ে আসা কখনও উচিত হবে না।' মুচকি হেসে নীলিমা দত্ত আবার বললেন,—'মেয়ে আরো কি বলল জানো দীপ্তেন্দু?'

'কি বলল সে?' দীপ্তেন্দু শুধোল

'মেয়ে বলল, আরো কয়েক বছর বাদে আমারও বিয়ে হয়ে যাবে মা। তখন হয়তো তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারি। আর আজকাল তো বিয়ের পর মেয়েরা হামেশা বিদেশে স্বামীর কাছে গিয়ে থাকে। তখন তোমাকে কলকাতায় একা পড়ে থাকতে হবে। শেষজীবনে নিঃসঙ্গ, একা থাকাটা বড়ো কষ্টের হতে পারে মা। তার চেয়ে এই ভদ্রলোক যদি বিয়ে করে তোমার জীবনসঙ্গী হতে চান তাহলে সেটা পায়ে ঠেলার চেয়ে গ্রহণ করাই তো উচিত হবে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আপনার মেয়ে কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী নীলিমাদি। ওর কথায় অকাট্য যুক্তি আছে।'

'তা আছে।' নীলিমা দত্ত টেবিলে রেখে যাওয়া চায়ের কাপটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। চুমুকে দিয়ে একটু চা পান করে বললেন,—'তুমি নিশ্চয় যুক্তির খাতিরে বলবে এই ব্যাপারটার তো আরো একটা দিক আছে। অধ্যাপক তার স্ত্রীকে যে ছেড়ে আসবেন তার কি হবে? শেষজীবনে নিঃসঙ্গ থাকাটা যখন তার বেলাতেও ঘটবে।' দীপ্তেন্দু কোনো মন্তব্য না করে শুধু মুখ তুলে তাকাল।

নীলিমা দত্ত বললেন,—'আমি হয়তো জবাব দিতে পারি যে সুরকার স্বামী কমবয়সী একটি মেয়ের মোহে পড়ে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তখন কি

আমার ভবিষ্যতের কথা কেউ ভেবেছিল? কিন্তু আমি সে রকম স্বার্থপর মনোবৃত্তি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। আসলে কী জানো দীপ্তেন্দু? আমাদের সমাজব্যবস্থাটাই আগাগোড়া বদলে গেছে। পশ্চিমী হাওয়া আর মার্কিনী কালচার এর খোলনলচে পাল্টে দিচ্ছে। আগে মা-বাবা, পাত্রী পছন্দ করে ছেলের বিয়ে দিতেন। কখনও-সখনও বড়জোর'বধূর একটা ফটো পাত্রকে বিবাহের পূর্বে দেখানো হ'ত। বনিবনা না হলেও সেই স্ত্রীকে নিয়ে সমস্ত জীবন থাকতে হবে এই ছিল সমাজের অমোঘ বিধান। কিন্তু এখন অবস্থাটা কি আর সে রকম আছে? অনেক ক্ষেত্রেই ছেলের পছন্দ-করা মেয়েকেই মা-বাবা পুত্রবধূ করে ঘরে আনতে বাধ্য হন। তা সে মেয়েটি তাদের পছন্দের হোক বা নাই হোক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য মেয়েটির সঙ্গে বনিবনাও হয়। কিংবা পুত্রবধূর সঙ্গে তারা মানিয়ে নিতে বাধ্য হন। আবার অনেক সময় পুত্রবধূ শ্বশুর-শাশুড়ির তোয়াক্কা না করে স্বামীকে নিয়ে অন্য ফ্ল্যাটে কিংবা অন্যত্র গিয়ে বাসা বাঁধে। মা-বাবার সঙ্গে একটা নামমাত্র সম্পর্ক থাকে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'সমাজ তো যুগে যুগে পাল্টায় নীলিমাদি।'

'হ্যাঁ। আর সেটাই তো আমি বলতে চাইছি। জানো দীপ্তেন্দু, একসময় সুরকার স্বামী আমার প্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। একটা দিনও আমাকে চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। তারপর ওই অঞ্জনা নামের মেয়েটি ওর চোখে মোহের অঞ্জন ছড়াল। একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ার পর উনি স্ত্রী আর মেয়েকে ফেলে অন্যত্র গিয়ে উঠলেন। বেহায়ার মতো আমি ওকে আর ফেরাবার চেষ্টা করিনি। ডিভোর্সে সায় দিয়ে ওর সুখী হওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছি। এখন শুনতে পাই সেই অঞ্জনার সঙ্গেই উনি স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করছেন। হয়তো চুপিচুপি রেজেস্ট্রীটাও সেরে ফেলেছেন। আমি তার খবর রাখি না।'

ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই দীপ্তেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলল,—'নীলিমাদি, দুটো বাজতে চলল। আর দেরি নয়। চলুন অফিসে ফিরে যাই।'

নীলিমা দত্ত হেসে বললেন,—'হ্যাঁ। ফিরতেই তো হবে। কিন্তু তার আগে তোমার কাছেও যে কিছু জানবার ছিল দীপ্তেন্দু।'

'বলুন কি জানতে চান?'

নীলিমা দত্ত চোখের কোণে ঈষৎ রহস্য এনে শুধোলেন, —'অগ্নিবীণাকে তুমি বিয়ে করছ না কেন?'

দীপ্তেন্দু হেসে ফেলল। বলল,—'এটা কি রকম কথা হল নীলিমাদি? আপনি তো জানেন অগ্নিবীণার বিয়ে হয়েছে জলপাইগুড়ির এক সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত পরিবারে। ওর হাজব্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়র, কণ্ট্রাক্টরি ব্যবসায় যথেষ্ট আয়।'

'হ্যাঁ, সে কথা জানি বৈ কি। ছাত্র-রাজনীতি করতে গিয়ে তোমার জেল না

হলে অগ্নিবীণার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হতে পারত। সে খবরও আমরা পেয়েছি।'

দীপ্তেন্দু ম্লান হেসে বলল,—'সবই যখন জানেন তখন আর পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে কি লাভ?'

নীলিমা দত্ত বললেন,—'আপত্তি থাকলে আমি নিশ্চয় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না দীপ্তেন্দু। কিন্তু আমি জানি মাঝে মাঝেই এই অফিসে তোমার কাছে অগ্নিবীণার টেলিফোন আসে। ওদের ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। নিশ্চয় অস্বীকার করবে না যে ব্রজবিলাস সরকারের ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে তুমি অগ্নিবীণার সঙ্গে দেখা কর।'

দীপ্তেন্দু চুপ করে রইল। কোনো জবাব দিল না।

নীলিমা দত্ত বললেন,—'অগ্নিবীণাকে তুমি ভালোবাসতে দীপ্তেন্দু এবং আজও তোমাদের মন দেয়া-নেয়ার পালা চলছে। কিন্তু বিয়ের গ্রন্থিটা সম্পূর্ণ খুলে যায় নি বলেই তোমার সঙ্গে ওর একটা স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি হয় নি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'এটা তো সত্যি নীলিমাদি, ডিভোর্স না হলে আমরা আবার বিয়ে করতে পারি না।'

'সেটা তো আইনের কথা দীপ্তেন্দু। আর আইনের চোখে যখন সবাই সমান তখন এটা মেনে চলতে হবে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'তাহলে সত্যি কথাটা আপনাকে বলছি নীলিমাদি। অঢেল পয়সাকড়ি থাকলেও ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তিন পুরুষ ধরে ব্যভিচারী। এবং অগ্নিবীণার স্বামী সৌম্যকান্তিবাবুও তার ব্যতিক্রম নন। মদ এবং আনুষঙ্গিক দোষ বাপ-ঠাকুর্দার সময় থেকেই তার রক্তে বাসা বেঁধে আছে। একদিন গভীর রাত্রে অগ্নিবীণা তার স্বামীকে এক নেপালী কাঞ্চীর সঙ্গে এক ঘরে বিছানায় Compromising অবস্থায় দেখতে পায়। তাই দেখে অগ্নিবীণার শরীরের রক্ত মাথায় চড়ে বসে। সেই রাত্তিরে শাশুড়ির ঘুম ভাঙিয়ে এই বিশ্রী ঘটনার সে প্রতিকার দাবী করে। কিন্তু শাশুড়ি তার কথার তেমন গুরুত্ব দেন নি। তার বক্তব্য ছিল বড়বাড়ির পুরুষেরা এমন এক-আধটু বারমুখো হয়ে থাকে। মেয়েদের তাই নিয়ে সরব হলে চলে না। ববং তা সয়ে নিতে হয়। তাতেই শান্তি। সংসার ভাঙে না। তাছাড়া বংশ-পরম্পরায় যে রক্ত তার স্বামীর শিরায় শিরায় প্রবহমান, তাতে এমন দু-একটা ঘটনা চোখে পড়লেও তাই নিয়ে বিচলিত হবার কিছু নেই।'

দীপ্তেন্দু এক পলক নীলিমা দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে ফের বলল,—'বুঝতেই পারছেন অগ্নিবীণা শাশুড়ির এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেনি। পরদিন চা-বাগানের যে হাসপাতালে সে ডাক্তার ছিল সেখানেই কোয়ার্টার্সে উঠে যায়। তারপর গাইনি আর অবস্টেরিকসের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করবে বলে কলকাতায় এসে হাউসস্টাফশিপের বাকি পর্বটুকু কমপ্লিট করবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে জয়েন করে।'

নীলিমা দত্ত শুধোলেন,—'ওর শাশুড়ি বাড়ির বউয়ের এই বেয়াদপি মুখ বুজে সহ্য করল?'

দীপ্তেন্দু কেমন অদ্ভুত হেসে বলল,—'এখানে এসেই সমস্ত ব্যাপারটা থমকে দাঁড়িয়েছে। শাশুড়ি ভেবেছিল আদালতে বউয়ের বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা রুজু করবে। তারপর আবার ছেলের বিয়ে দেবে। তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উকিল মারফৎ অগ্নিবীণাকে Restitution of Conjugal life এর নোটিশও পাঠায়। কিন্তু অগ্নিবীণাও কম জেদী নয়। সে উকিলের নোটিশকে কোনো গ্রাহ্যই করল না। শেষে অগ্নিবীণা কলকাতায় আসার পর ওর শাশুড়ি এবং ছেলে দুজনেই এ-বাড়িতে চিঠি পাঠাল। শাশুড়ি পত্র লিখলেন ব্রজবিলাস সরকারকে আর তার ছেলে চিঠি দিল অগ্নিবীণাকে। ভদ্রমহিলা চিঠিতে লিখলেন ব্যাপারটা মিটমাট করে নিতে তারা দুজনেই আগ্রহী। এখন ব্রজবিলাস সরকার যদি এগিয়ে আসেন তাহলে সমস্যার জট খুলতে দেরি হবে না। উনি আরো লিখলেন তার নিজস্ব মত যাই থাক অগ্নিবীণার স্বামী অর্থাৎ তার ছেলে সৌম্যকান্তি স্ত্রীকে আবার জলপাইগুড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।'

নীলিমা দত্ত বললেন,—'আর ছেলে? চিঠিতে সে কী লিখল তা নিশ্চয় তুমি জান না।'

'জানি।' দীপ্তেন্দু কেমন রহস্য করে হাসল। বলল,—'শুনলে আশ্চর্য হবেন নীলিমাদি, অগ্নিবীণা তার স্বামীর ওই চিঠিখানা আমাকে প্রায় জোর করেই পড়িয়েছে।'

'বল কি?' নীলিমা দত্ত অবাক হলেন। বললেন,—'তা চিঠিতে ওর স্বামী কি লিখেছিল?'

দীপ্তেন্দু কেমন নির্লিপ্ত হেসে উত্তর দিল,—'সৌম্যকান্তি মানে ওর স্বামীর চিঠি পড়লে আপনার আদৌ মনে হবে না যে অগ্নিবীণার অভিযোগ আংশিকভাবেও সত্যি।'

'কেন? চিঠিতে সে কি লিখেছিল?'

দীপ্তেন্দু বলল,—'চিঠিটা খুব ভদ্র, পরিশীলিত এবং মার্জিত ভাষায় লেখা। তাতে স্ত্রীর প্রতি প্রচ্ছন্ন ভালবাসা রয়েছে। কিন্তু কোথাও তেমন গুরুতর অনুযোগ নেই। ওর স্বামী চিঠিতে লিখেছে যে অগ্নিবীণা তাকে ভুল বুঝে চলে গেছে। যাবার আগে একটা আলোচনায় বসলেই ব্যাপারটা মিটে যেত। এখন যদি সে আবার ফিরে আসে তাহলেই সমস্ত বিষয়টা সহজ হয়ে যায়। তার চিঠি পেলেই সৌম্যকান্তি কলকাতায় গিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে আবার জলপাইগুড়ি ফিরে আসতে পারে।'

'কিন্তু অগ্নিবীণা নিশ্চয় সে চিঠির জবাব দেয় নি।'

'নাহ্। তার এক কথা। মানুষটাকে সে করতলের নানা রেখার মতো

আপাদমস্তক চেনে। সুতরাং চিঠির উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে না। আর শ্বশুরবাড়িতে আবার ফিরে যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারে না।'

দীপ্তেন্দু চুপ করে আছে দেখে নীলিমা দত্ত বললেন,— 'তাহলে তো সত্যিই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল দীপ্তেন্দু। সৌম্যকান্তি মানে অগ্নিবীণার স্বামী ডিভোর্স চায় বলেও তো মনে হয় না। ফলে তোমার এখন ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। ওদের দুজনের আইনমাফিক বিচ্ছেদ হলে অগ্নিবীণা নিশ্চয় তোমার সঙ্গে বিয়েতে রাজী হত। কিন্তু ডিভোর্স না হলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সেটা কোনোদিন বাস্তবায়িত হবে না।'

দীপ্তেন্দু ম্লান হেসে বলল,—'কী হবে এসব ভেবে?' তারপর নিজেই যেন মজা করে শোনাল,—'জানেন নীলিমাদি, আমাদের গ্রামে এবং হয়তো অন্যত্রও একটা প্রথা আছে। দাহ করে শ্মশান থেকে ফেরার সময় পথে কাঁটা দিয়ে আসতে হয়। যাতে প্রয়াত মানুষটির আত্মা কাঁটা ডিঙিয়ে না ঘরে ফিরতে পারে। ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে নিজেই তো সেই ভুল করে বসে আছি। অগ্নিবীণা আর আমার মধ্যে যে একটা কাঁটার বেড়া সৃষ্টি হ'ল সেটা যখন বুঝতে পারলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

নীলিমা দত্ত বললেন,—'মুস্কিলটা কী জানো দীপ্তেন্দু?' মেয়েদের মন ঋতু পরিবর্তনের মতো। এই প্রখর গ্রীষ্ম দেখছ। আবার পরক্ষণেই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি। বর্ষায় মাটি স্নান করে উঠল। তখন আর গ্রীষ্মের দাবদাহের কথা মনে থাকে না। আজ দেখছ শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার নামে অগ্নিবীণার অনীহা। আবার এই মতটাই যে আর একদিন পাল্টে যাবে না তাও জোর করে বলা কঠিন।'

দীপ্তেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল,—'এসব কথা থাক নীলিমাদি। এখন চলুন, আরো দেরি করে অফিসে ফিরলে হয়তো কৈফিয়ত দিতে হতে পারে।'

৷৷ ষোলো ৷৷

মাস দুই পর সে হরিদাসের সঙ্গে দেখা করল। উপর্যুপরি টেলিফোন। শেষপর্যন্ত একদিন বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা ওর ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছল। তাকে দেখে হরিদাস খুশি হয়ে বলল,—'সত্যি, কী চাকরি যে করিস তুই। শুধু কাজ আর কাজ। আচ্ছা, গল্পগুজব কিংবা স্রেফ আড্ডা দেবার জন্যে কি দু-দণ্ড সময় বের করতে নেই?'

দীপ্তেন্দু মুচকি হেসে জানাল,—'তুই বা কম ব্যস্ত কিসে? নিত্য নতুন ছবির হিরো হচ্ছিস। কলকাতার রাস্তায় হাঁটলে হিরোইনের সঙ্গে তোদের দুজনের ছবি

আকছার চোখে পড়ে।' শেষে কটাক্ষ করে বলল,—'তাছাড়া আর এক ভদ্রমহিলার জন্যও তোকে কিছু সময় খরচ করতে হয়।'

দীপ্তেন্দুর বাঁকা হাসিটা কাকে ইঙ্গিত করে হরিদাস তা বুঝতে পারল। জবাবে সে বলল,—'তাই নাকি? তা সেই ভদ্রমহিলার জন্য আমাকে যে কিছুটা সময় দিতে হয় সেটাই বা তুই জানলি কেমন করে? আমার সঙ্গে তাকে যখন অনেকদিন দেখিস নি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আশ্চর্য! এটা আবার একটা কথা হ'ল নাকি? আরে বাবা, আমরা হলাম গিয়ে কাগজের লোক। এসব খবর কি কখনও চাপা থাকে? মিলন সান্যালের কাছে তো মাঝে মাঝেই শুনতে পাই। বাজারের ফিল্ম ম্যাগাজিনে তোকে নিয়ে নানারকম কেচ্ছা বেরিয়েছে।'

'অবাক করলি? আচ্ছা, এটাও কেচ্ছা বলবি? যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে একটু মেলামেশা করলেই তাই নিয়ে স্টোরি বানাতে হবে?' হরিদাস মৃদু হাসল।

বলল,—'সত্যি' তোরা সাংবাদিকরা সব পারিস। তুই অন্তত জানিস আমরা দুজনে একটা mutual understanding-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। শীগগীর বিয়ে করতেও পারি।'

'সে তো এক বছর বাদে। তার তো এখনও ঢের দেরি।'

'নাহ্। এক বছর পর্যন্ত আমরা আর অপেক্ষা করতে চাইছি না। নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। ধর, সামনের অঘ্রাণেই বিয়ে হবে। তার অবশ্য কয়েক মাস দেরি। তুই নিশ্চয় নিমন্ত্রিত। যথাসময়ে বিয়ের কার্ড পৌঁছে যাবে তোর কাছে। তবে কাগজের চাকরির দোহাই দিয়ে যেন আবার রিসেপশনটা avoid করিস নে।'

দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল। 'আরে না-না। পুরানো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে একমাত্র তোর বিয়েতেই নিমন্ত্রণ পাচ্ছি। আর শুধু তুই ন'স। তোর হবু-স্ত্রী মানে কণা দত্ত তো আমার সহপাঠিনী। এমন একটা রাজজোটক বিয়েতে নিমন্ত্রণের সুযোগ খুব কমই আসে।'

হরিদাস বলল,—'ডিসেম্বর পর্যন্ত হাতে অনেক ছবি। তা প্রায় সাতটা। সামনের বছর থেকেই রিলিজ করতে শুরু করবে। অঘ্রাণে বিয়ে করব বলে স্টুডিও থেকে পনের-কুড়ি দিন ছুটি নিচ্ছি। কণার ইচ্ছে বিয়ের পর আমরা কাঠমাণ্ডু ঘুরে আসি।'

'হনিমুনে?' দীপ্তেন্দু মুচকি হাসল।

'তুই যা বলিস। তবে জানুয়ারীর শেষ থেকে আবার শুটিঙ চলবে। তখন আর ফুরসৎ পাব না।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কাঠমাণ্ডু তুই নিশ্চয় আগেও গিয়েছিস?'

'হ্যাঁ, দু-তিনবার। অবশ্যই শুটিঙ করতে। কী দারুণ সব স্পট নেপালে। একবার পোখরায় ফেউয়া লেকে বোটিং করবার দৃশ্যে নৌকো উল্টে যাবার জোগাড়

হয়েছিল। নায়িকা আর আমি দুজনেরই সলিল সমাধি হতে পারত। নেহাৎ কপাল জোর। তাই বিপত্তি থেকে মুক্তি।'

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে টেবিলে কফি আর গোয়ানীজ কাজু এনে রেখে গেছে। এক চুমুক কফি পান করে দীপ্তেন্দু শুধোল,—'কণা দত্ত আজ এখানে আসবে না?'

'নারে। হসপিট্যালে ওর নাইট-ডিউটি আছে। রিলিভার এলে তবে ছুটি। সকাল নটার আগে বাড়ি পৌঁছতে পারে না। মেডিক্যাল অফিসারের কাজে নানা রকমের hazards. সুচিকিৎসা হয়নি বলে কখনও রোগীর লোকেরা শাসিয়ে যায়। এ সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে তবে তো আসবে।'

কফির কাপ নিঃশেষ কবে দীপ্তেন্দু বলল,—'আজ তাহলে উঠি। আবার একদিন আসব।'

'সে কি?' হরিদাস ভুরু তুলে তাকাল। বলল,—'এখনই যাবি কেন? চল, গুরুসদয় রোডে একটা নতুন রেস্তোরাঁ হয়েছে। শুনেছি খুব ভালো ফুড সার্ভ করে। সেখানে ডিনার সেবে নিই। তারপর তোকে মেসের দরজায় পৌঁছে দেব।'

ওর আগ্রহ দেখে দীপ্তেন্দুর নেতিবাচক জবাব দিতে খারাপ লাগছিল। তবু সে মাথা নেড়ে মৃদু হেসে জানাল,—'নারে, আজ থাক। বরং আর একদিন আসছি। সেদিন তুই আমি আর তোর হবু-স্ত্রী তিনজনে বেশ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। তারপর সবাই মিলে সেই গুরুসদয় রোডের রেস্তোরাঁয় ডিনার। কেমন?'

হরিদাস সংশয় প্রকাশ করে বলল,—'কথাটা মনে থাকবে তো? না টেবিলের কাচের নীচে অপ্রয়োজনীয় কাগজ গুঁজে রাখার মতো সেটা মগজের তলায চাপা পড়ে থাকবে?'

'ধুর!' দীপ্তেন্দু প্রায় প্রতিবাদ জানাল। শুধোল,—'তোর কোন কথাটা ভুলে গেছি বলতে পারিস? তবে কিনা কাজেকর্মে সময় পাই না, বুঝলি? তা সেটা তোকে ক্ষমা করে নিতে হবে।'

অঘ্রাণের মাঝামাঝি হরিদাসের সঙ্গে কণা দত্তের বিয়ে হযে গেল। ছোট্ট একটু আনুষ্ঠানিক বিয়ে, তারপর রেজেস্ট্রী ম্যাবেজ। দীপ্তেন্দু অবশ্য বিয়েতে হাজির হতে পারে নি। যদিও তাকে একাধিকবার নিমন্ত্রণ জানাতে হরিদাসের ক্রটি ছিল না। এমন কী কণা দত্ত মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে অগ্নিবীণাকে আলাদা বিয়ের নেমন্তন্ন কার্ড পর্যন্ত দিয়ে এসেছিল। কিন্তু হসপিট্যালে ডিউটি ছিল বলে সেও যায় নি। তবে বিয়েতে উপস্থিত হতে না পারলেও ফুলের তোড়া হাতে রিসেপশনে যেতে দীপ্তেন্দু ভুল করে নি। সে অবশ্য একাই গিয়েছিল। কলকাতার এক ফাইভ-স্টার হোটেলের হলঘরে এলাহি আয়োজন। ফিল্ম জগতের নানা কেষ্ট-বিষ্টু, মান্যগন্য লোকের আসা যাওয়ার মাঝে দীপ্তেন্দু এক ফাঁকে হরিদাসের সঙ্গে দেখা করল।

কণা দত্ত বসেছিল প্রায় সিংহাসনের মতো নানা কারুকার্যখচিত এক আসনে। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল কণাকে। বিয়ের রাত্তিরে সব মেয়েই তো রানী। সুসজ্জিতা, সালঙ্কারা রমণীকে সম্রাজ্ঞীর মতো লাগে। দীপ্তেন্দুকে দেখে কণা দত্ত শুধু হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। আর হরিদাস? তার যা স্বভাব। দীপ্তেন্দুকে হাত ধরে টানতে টানতে একটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলল,—'ভালো করে খেয়ে যাবি কিন্তু। নইলে দুঃখ পাব।' তারপর মুখখানা ঈষৎ করুণ করে বলল,—'আমার সময় নেই রে। নইলে সামনে দাঁড়িয়ে তোকে যত্ন করে খাওয়াতাম।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'এই নিয়ে ভাবতে হবে না। যা এক এলাহি কাণ্ড করে বসে আছিস। আর একা মানুষ তুই। কত দিক সামলাবি?'

হরিদাস বলল,—'তোর সেই বান্ধবী কিন্তু এলো না। বিয়েতেও আসে নি। আর আজ রিসেপশনেও গরহাজির।'

অগ্নিবীণার সপক্ষে দীপ্তেন্দু বলল,—'আমার কি মনে হয় জানিস? এই বিয়েবাড়ি, উৎসব, আলোর রোশনাই,—তারপর মহাভোজ, এসব কিছুই এখন আর ওকে আকর্ষণ করে না। জীবনের বাতিটাই যে ওর ফিউজ হয়ে গেছে। চোখের সামনে এখন শুধু একটা অন্ধকার পর্দা। শুধু চাকরি নিয়ে একটা মেয়েমানুষ কি বাঁচতে পারে? শেষপর্যন্ত যে কি হবে তা কে জানে?'

মেসবাড়িতে নিজের ঘরে ঢুকে দীপ্তেন্দু দেখল তিনকড়ি হাজরা একটা রেসের বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বিছানায় শুয়ে। তাকে দেখেই আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল,—'কি দাদা? ভুরিভোজ কেমন হ'ল?'

জবাবে দীপ্তেন্দু শুধু একটু হাসল। কোনো কথা বলল না।

তিনকড়ি আবার বলল,—'তমালকুমারের সঙ্গে যার বিয়ে হ'ল উনি কিন্তু গ্র্যাণ্ড দেখতে দাদা। কী ফিগার। হাইট্ কত হবে বলুন তো? সাড়ে পাঁচের কম নিশ্চয় নয়? বাঙালী মেয়েরা সচরাচর এত লম্বা হয় না।'

দীপ্তেন্দু মৃদু হেসে শুধোল,—'আপনি ওকে দেখলেন কোথায়?'

'চোখে দেখিনি।' তিনকড়ি অনায়াস জবাব দিল।

'তাহলে?'

'দেখলাম একটা ফিল্ম ম্যাগাজিনের পাতায়। আমাদের অফিসের নিতাই সরখেল কাগজটা এনেছিল। তারই একটা পাতায় দুজনের full-size ছবি ছাপা হয়েছে। ম্যাডামের কী চাউনি দাদা। ম্যাগাজিনে লিখেছে লেডি ডাক্তার। তা চাকরি ছেড়ে তমালকুমারের জুড়ি হয়ে ফিল্মে নামলে আমাদের মতো বহু দর্শকের মাথা ঘুরে যেত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

দীপ্তেন্দু ঢোক গিলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। আর এক পা এগোন

মানেই বিপদ। তিনকড়ি হাজরার মুখের আগল নেই। এরপর যদি কণা দত্তের স্ট্যাটিসটিক্স জানতে চেয়ে বসে তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বাঁ চোখটা ঈষৎ নামিয়ে একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করে বলতে পারে, ম্যাডামের কোমরটা যেমন সরু, পেছনটা তেমনি ভারী,—তাই না দাদা?'

দীপ্তেন্দু তাড়াতাড়ি বলল—'আপনি আবার রেসের বই নিয়ে বসেছেন কেন? শনিবার ফের মাঠে যাওয়া ধরলেন নাকি?'

'আজ্ঞে না। সব শনিবার যেতে পারি কই? পয়সা কোথায় দাদা? ওই ঘোড়াগুলোর নাম পড়ে যা আনন্দ পাই। এই যে দেখুন না সামনের শনিবার এই ঘোড়াটা, ইয়ে যার নাম মোনালিসা দেখবেন ওই বাজীমাৎ করবে।'

'তাহলে মোনালিসার ওপর বাজী ধরছেন?'

'ভাবছি একটা উইন খেলব। তবে রেস্তো কোথায়? গোটা কুড়ি টাকা এক কাব্‌লের কাছ থেকে ধার নিয়েছি।'

'কাবলে? মানে কাবুলিওয়ালা? ওদের তো হানড্রেড পারসেন্ট ইনটারেস্ট শুনেছি। রেসের মাঠে হেরে গেলে কাবুলির টাকা শোধ দেবেন কেমন করে?'

তিনকড়ি হাজরা মুচকি হাসল। বলল,—'কপাল মন্দ হলে যা হয় তাই হবে। মাস গেলে যা মাইনে পাই তাতে আর চলে না দাদা। বাড়তি কিছু রোজগার করতে গেলে এছাড়া পথ নেই।' রেসের বইটার দিকে এক পলক তাকিয়ে তিনকড়ি হাজরা আবার বলল,—'তবে এই শনিবার হারছি না, এ আপনি দেখে নেবেন। মোনালিসা ঠিক বাজী জিতবে।'

নদীর স্রোতের মতো দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। একরঙা জীবন,—অফিসে রিপোর্টারের কাজ। সারাদিনের খাটুনির শেষে মেসে ঠাকুরের রান্নার সেই এক স্বাদ। ডাল-ভাত, একটা তরকারি। দু-বেলা দু-টুকরো মাছ। সকালে চা আর আধখানা পাউরুটি ব্রেকফাস্ট। বিকেলে অফিসের বেয়ারা যা পারে জলখাবার নিয়ে আসে। কোনোদিন বাদামভাজা, নারকোলকুচি সহযোগে মুড়ি। কোনোদিন দুখানা রুটি, সঙ্গে ডাল কিংবা তরকারি। পাথুরিয়াঘাটার মেসে ফিরতে আটটা-নটা, কখনও দশটাও বেজে যায়।

ঋতুচক্র যথানিয়মে আবর্তিত হয়। বর্ষায় মেঘ ঝরঝর জল ঢালে, শরতে খাল-বিল, নদীনালা, পরিপূর্ণ পুষ্করিণীর পাশে কাশ ফোটে। হেমন্তে পক্বশস্যভরা মাঠ। পৌষে কনকনে ঠাণ্ডা। ফাল্গুনে দখিনা হাওয়া বয়। আর চৈত্র থেকেই গ্রীষ্মের শুরু। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে পশ্চিম-ঘেঁষা বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার মাটি চৌচির হয়ে ফেটে যায়।

উনিশ'শ চৌষট্টি সাল।

বৈশাখের প্রথমেই একদিন কলেজ স্ট্রীটে সন্দীপের সঙ্গে দেখা।

দীপ্তেন্দু হাত বাড়িয়ে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল,—'উঃ! কতদিন পরে আপনার সাক্ষাৎ পেলাম। ফের অনুযোগ করে বলল,—'মাঝেমধ্যে একদিন টেলিফোন করলেও তো পারতেন।'

তাকে নিয়ে সন্দীপ কফিহাউসে ঢুকল। বলল,—'দারুণ একটা খবর আছে। আপনি কাগজের লোক। ইতিমধ্যে নিশ্চয় সব জেনেছেন?'

'কী খবর?' দীপ্তেন্দু জিজ্ঞাসু হ'ল।

সন্দীপ ঈষৎ গম্ভীরমুখে জানাল,—'পার্টি নিশ্চিত ভাঙনের মুখে। দলের একটা বড়সড় অংশ কম্যুনিস্ট জাতীয় পরিষদ অর্থাৎ National Council-এর অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসেছে।'

॥ সতেরো ॥

কফির পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে দীপ্তেন্দু বলল,—'ভাঙনের ব্যাপারটা যে শুনিনি তা নয়। তবে আমাদের কাগজে কোনো রাজনৈতিক দলের অর্ন্তদ্বন্দ্ব বা সেই বিষয়ে উদ্ভুত সমস্যা নিয়ে আলোকপাত একমাত্র সম্পাদক বা চিফ রিপোর্টারই করেন। আমি যতদূর জানি অভিযোগের তিরটা শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের বিরুদ্ধে।'

সন্দীপ বলল,—'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। পার্টির বামপন্থী সদস্যদের ধারণা ডাঙ্গে বিভেদকামী, এবং দলকে শ্রেণী-সংঘর্ষের পরিবর্তে শ্রেণী-মৈত্রীর পথে তিনি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কারো কারো মতে সংশোধনবাদ বা শোধনবাদই প্রধান বিপদ এবং যে সমস্ত নেতা শোধনবাদে বিশ্বাসী এবং সে পথেই দলকে পরিচালনা করতে চান তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া পথ নেই।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'শুনেছিলাম ১৯২৪ সনে ডাঙ্গের লেখা একটি চিঠি নিয়েও নাকি জল ঘোলা হয়েছে।'

'ঠিকই শুনেছেন', সন্দীপ জবাব দিল। বলল,—'১৯২৪ সনের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশে লেখা এক পত্রে ডাঙ্গে তার কারামুক্তির বিনিময়ে সরকারকে এক নিরাপদ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব দেন। পরে ডাঙ্গে অবশ্য বলেন মহাফেজখানায় রাখা ওই পত্র আসলে জাল। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির ডাঙ্গে -বিরোধী সদস্যদের কেউ কেউ চিঠিগুলি পরীক্ষা করে অভিমত দেন যে সেগুলি জাল বলে তাদের আদৌ মনে হয় নি।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আপনার কি মনে হয় পার্টিতে ভাঙন অনিবার্য?'

'হ্যাঁ। সে বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া পার্টির মধ্যে ডাঙ্গে

-বিরোধী অংশের শক্তিও নেহাৎ তুচ্ছ বলা চলে না। সত্যি বলতে পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, পশ্চিম বাংলা, জম্মু-কাশ্মীর, কেরল, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্র,—সর্বত্রই বিরোধীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।'

কফিহাউস থেকে বেরিয়ে সন্দীপ শুধোল,—'আপনাদের কাগজের অবস্থা এখন কেমন?'

'অবস্থা মানে?' দীপ্তেন্দু প্রশ্নটা শুনে যেন হকচকিয়ে গেল।

সন্দীপ বলল,—'অবস্থা মানে Financial Position বা আর্থিক সঙ্গতি। আপনি কোম্পানীর লাস্ট ইয়ারের প্রফিট অ্যাণ্ড লস অ্যাকাউন্ট আর ব্যালান্স সীটটা দেখেন নি?'

'নাহ্'। দীপ্তেন্দু মাথা নাড়ল। বলল,—'আমরা হলাম কাগজের রিপোর্টার। বলতে পারেন দিন আনি দিন খাই। কোম্পানীর ব্যালান্স সীটের খোঁজে আমার কি দরকার? আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর না রাখাই ভালো।'

সন্দীপ বলল,—'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আমার কাছে খবর আছে যে বঙ্গভূমি কাগজের আর্থিক অবস্থা আদৌ ভালো নয়। গত দু-বছর কোম্পানীকে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। আর এমনিভাবে চলতে থাকলে দু-এক বছর পরে কাগজ চালানোই দুষ্কর হবে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'শুনেছি এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরই এতদিন এর আর্থিক দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন।'

'ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু এখন আর্থিক ঘাটতিটা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে ওঁর একার পক্ষে আর এটা টানা সম্ভব নয়।'

'তার মানে?' দীপ্তেন্দু ভুরু কুঁচকে তাকাল। শুধোল,—'আপনি কি বলতে চান যে কাগজটা শীগগীর বন্ধ হয়ে যাবে?'

'এই অবস্থায় সেটা আদৌ অসম্ভব নয়, Receipt আর Expenditure এর মধ্যে যদি একটা সমতা না যাকে তাহলে এই হাতির খোরাক নিত্যি কে জোগাবে?'

দীপ্তেন্দু চুপ করে রইল। কোনো মন্তব্য করল না।

সন্দীপ বলল, — 'তাই বলে এখনই এত ভয় পাবেন না। আমার বিশ্বাস সামনের ইলেকশন পর্যন্ত কাগজটা loss run করলেও উঠে যাবে না। তারপর কী হবে সে কথা বলা শক্ত।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কিন্তু General Election এর তো এখনও ঢের দেরি।'

'দেরি কোথায়?' সন্দীপ হাসল। বলল,—'চৌষট্টি সাল তো ফুরিয়ে এলো বলে। তারপর আর দুটো বছর। আবার সাতষট্টি সালের শুরুতেই নির্বাচন।' সন্দীপ মাথার চুলে হাত বুলিয়ে জানাল,—'আমরা ভেবেছিলাম সাতষট্টির ইলেকশনেই কংগ্রেসকে পাততাড়ি গুটিয়ে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু এখন

পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে তাতে তেমন আশা করতে ভরসা হয় না।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আপনি কি পার্টির ভাঙনের কথা ভেবেই এত চিন্তিত হচ্ছেন?'

'ঠিক তাই। তবে শুনেছি সাউথ ইন্ডিয়া থেকে গোবিন্দন নায়ার আসছেন। ওঁকে বলা হয় কেরালার ক্রুশ্চেভ। উনি যদি এসে জাতীয় পরিষদ থেকে বহিষ্কৃত বত্রিশ জন সদস্যের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারেন তাহলে হয়তো বা এই বিভাজন বন্ধ হতে পারে।'

প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটে এসে দীপ্তেন্দু বলল,—'আমি যাব শ্যামবাজার। আপনি?'

'ঠিক উল্টো।' সন্দীপ মুচকি হাসল। বলল,—'আমাকে একবার প্রিন্সেপ স্ট্রীটে যেতে হবে। তারপর কী মনে হতে শুধোল,—'রঞ্জনের কোনো চিঠিপত্র পেয়েছেন?'

'নাহ্। কেন বলুন তো?'

'শীগগীর পাবেন।' সন্দীপ রহস্য করে তাকাল।

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'রঞ্জন বিয়ে করছে।' সন্দীপ মুচকি হাসল।

'তাই নাকি?' দীপ্তেন্দু মুখ উজ্জ্বল করে তাকাল।

সন্দীপ বলল,—'মেয়েটির নাম অনুরাধা। মেদিনীপুরের অলিগঞ্জ গার্লস স্কুলের টিচার। আমাদের পার্টির একজন কর্মী।'

দীপ্তেন্দু হেসে শুধোল,—'তা রঞ্জনের সঙ্গে ভদ্রমহিলার কতদিনের পরিচয়?'

'তা বলতে পারব না। তবে দু-তিন বছর নিশ্চয় হবে।' সন্দীপ মৃদু হেসে জানাল,—'রঞ্জন এলে বরং ওকেই কথাটা জিজ্ঞেস করবেন।'

দীপ্তেন্দু আর অপেক্ষা করল না। একটা ট্রাম আসছে দেখে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাদানীতে উঠে পড়ল। তার গন্তব্যস্থল শ্যাম বাজার নয়। বিবেকানন্দ রোড স্টপেজে সে নামবে। বিবেকানন্দ রোড কটাই বা স্টপ। তাছাড়া এই অবেলায় ট্রামে ভিড়ভাড় নেই। মিছিমিছি ফার্স্ট ক্লাসে ওঠার বিলাসিতা তার শোভা পায় না। বিবেকানন্দ রোড স্টপে নেমে সে একবার পিছন ফিরে তাকাল। ডাফ স্ট্রীট দূরে নয়। মিনিট তিন-চার বড় জোর যেতে লাগবে। কিন্তু নাহ্। সন্ধ্যের মুখে আর ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। আর গরমে-ঘামে তার শরীরও জেরবার। বরং পাথুরিয়াঘাটার মেসে ফিরে গায়ে দু-মগ জল ঢাললে দেহ শীতল হবে।

দিন কয়েক বাদেই কম্যুনিস্ট পার্টির বিভাজনের সংবাদ খবরের কাগজের পাতায় প্রকাশিত হ'ল। পার্টির বাম উপদল আহুত এক সভায় প্রায় ষাট জন উপস্থিত

থেকে ডাঙ্গের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পরিষদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। গোবিন্দন নায়ার এই সভাকে বে-আইনী ঘোষণা করলেও এরই ফলশ্রুতি হিসেবে লোকসভায় দলের নেতৃত্ব বদল হতেও দেরি হ'ল না। লোকসভায় ডাঙ্গেপন্থী সদস্যদের নেতা হলেন অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়। আর জাতীয় পরিষদের নেতৃত্বকে যারা অস্বীকার করলেন লোকসভায় সেই এম. পি. দের নেতৃত্ব দেবেন এ. কে. গোপালন। আর এতদিন যারা মধ্যপন্থী বলে চিহ্নিত ছিলেন তারা প্রায় সকলেই নতুন দল কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তে যোগ দিলেন।

পরের রবিবার সে ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে যেতেই ব্রজবিলাস তাকে সাদর আহ্বান জানালেন, —'এসো এসো দীপ্তেন্দু। প্রায় মাসখানেক হ'ল তুমি এ পথ মাড়াও নি।'

দীপ্তেন্দু লক্ষ করল ব্রজবিলাস সরকারের বৈঠকখানায় আজ প্রায় ছ-সাত জন বসে। তার মধ্যে পরাশরও আছেন। বাকিরা মফস্বলের লোক বলেই মনে হ'ল তার। হয়তো কোনো প্রয়োজনে ব্রজবিলাস সরকারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

তাকে লক্ষ করেই পরাশর প্রথম বললেন,—'বামপন্থীরা তো এবার দু-ভাগ হয়ে গেল দীপ্তেন্দু।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', দীপ্তেন্দু সায় দিল।

পরাশর বললেন,—'যারা শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের সমর্থক তারা পুরানো কম্যুনিস্ট পার্টিতেই রয়ে গেলেন। তাদের নির্বাচনী প্রতীক হবে কাস্তে ধানের শীষ। আর যারা ডাঙ্গে নেতৃত্বাধীন জাতীয় পরিষদকে অগ্রাহ্য করে পৃথক দল গড়লেন সেই দলের নাম হবে কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী) বা সি. পি. আই (মার্ক্সিস্ট)।'

দীপ্তেন্দু জবাব দিল,—'এ সবই তো কাগজে বেরিয়েছে।'

পরাশরের সঙ্গে আরো যারা এখানে বসে তাদের মধ্যে একজন দীপ্তেন্দুকে লক্ষ করে বলল,—'আপনার পরিচয় অবশ্য আমরা জানি না। তবে পরাশরদার কথা শুনে মনে হ'ল এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে আপনার একটা যোগযোগ আছে।'

ব্রজবিলাস বাধা দিয়ে বললেন,—'হ্যাঁ-হ্যাঁ। ওর পরিচয়টা আমার আগেই দেওয়া উচিত ছিল। এ হ'ল দীপ্তেন্দু,—দীপ্তেন্দু চট্টোপাধ্যায়। আমাদের গ্রামের ছেলে। খুব মেধাবী ছাত্র। এখন বঙ্গভূমি কাগজের রিপোর্টার। সেজন্য দেশের রাজনৈতিক দলগুলির উত্থান-বিভাজন এ সবের খোঁজখবর রাখে।'

সেই ভদ্রলোক এবার দীপ্তেন্দুকে লক্ষ করে বলল,—'কম্যুনিস্ট পার্টির বিভাজন মানেই কিন্তু বামপন্থী আন্দোলন অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে।'

ব্রজবিলাস শুনে বললেন,—'এ রকম একটা ধারণা করা ঠিক নয় অমৃতনারায়ণ। মতের পার্থক্য কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হলে একটা রাজনৈতিক দল দুটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে বৈকি। তুমি কংগ্রেসের ইতিহাসটাই দেখ না। একদা চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মতিলাল নেহরু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে দুজনে মিলে স্বরাজ্য দল গঠন করেছিলেন। আবার সুভাষ চন্দ্র বসুও কংগ্রেস ছেড়ে এসে ফরোয়ার্ড ব্লক দলের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তাই বলে কি স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল?'

একটা কাঠের ট্রেতে ছ-সাত কাপ চা সাজিয়ে পরিচারিকা গোছের এখটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। তার পিছনে অগ্নিবীণা। দীপ্তেন্দু চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে। আজ সে একটা সবুজ রঙের শাড়ি পরেছে। পিঠের ওপর এক ঢাল চুল ছড়ানো। একটু আগেই স্নান করে মুখে সামান্য প্রসাধন সেরে নিয়েছে। তারই একটা মিষ্টি সৌরভ দীপ্তেন্দুর নাকে এসে লাগল।

চোখাচোখি হতেই অগ্নিবীণা বলল,—'ভেতরে চলুন দীপ্তেন্দুদা। আপনাকে জলখাবার দেওয়া হয়েছে।'

অতিথিদের হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে অগ্নিবীণা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার পিছনে দীপ্তেন্দু। ইঙ্গিতে তাকে খাবার টেবিলে বসতে বলে অগ্নিবীণা প্রায় ধমকের সুরে কথা কইল,—'আচ্ছা, রোজ রোজ কেন আপনাকে বৈঠকখানায় গিয়ে ডেকে আনতে হয় বলুন তো?'

'বারে! আমি কি করব?' দীপ্তেন্দু আমতা আমতা করল। কৈফিয়তের সুরে জানাল,—'আমি ঘরে ঢুকতেই পরাশর দাদু যে কম্যুনিস্ট পার্টির দু-ভাগ হওয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন শুরু করলেন।'

'ওসব প্রশ্নের জবাব দিয়ে আপনার কী লাভ? আপনি কি রাজনীতি করেন? না কোনো পার্টিতে যোগ দেবার ইচ্ছে আছে?' কেমন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে আবার বলল,—'একবার রাজনীতি করতে গিয়ে অনেক খেসারত তো দিয়েছেন। আর ন্যাড়া কবার বেলতলায় যায় মশায়?' ওর কথার খোঁচাটা দীপ্তেন্দুকে মর্মে বিঁধল। কিন্তু সে কোনো মন্তব্য করল না।

দীপ্তেন্দু চেয়ারে বসতেই পরিচারিকা তার জন্য দুখানা গরম পরোটা আর আলুভাজা নিয়ে এলো। সেই সঙ্গে খানিকটা আখের গুড়।

অগ্নিবীণা বলল,—'নিন, আজ সামান্য জলখাবার দিয়েছি। বেলা একটায় ভাত খেতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

দীপ্তেন্দু দুঃখের সঙ্গে হাসল। বলল,—'যা দিয়েছ তাই যথেষ্ট বুলু। আর এই কি আমার ভাগ্যে রোজ জোটে? সকালে মুখ হাত ধুয়ে এক গ্লাস চায়ের সঙ্গে আধখানা রুটি ব্রেকফাস্ট। আর বিকেলে কাগজের অফিসের পিওন দোকান থেকে যা হোক কিছু কিনে আনে। তাই দিয়ে টিফিন সারি।'

পরোটা ছিঁড়ে খানিকটা মুখে দিয়ে দীপ্তেন্দু প্রসঙ্গ পাল্টাতে চেষ্টা করল। শুধোল,—'তারপর তোমার কি খবর বলো?'

'খবর একটা আছে।' অগ্নিবীণা কেমন যেন রহস্য করে তাকাল।

দীপ্তেন্দু চমকে উঠল। সে ভাবছিল তবে কি সৌম্যকান্তি ইতিমধ্যে বউকে ফের চিঠি লিখেছিল? আর সেই পত্র পেয়ে অগ্নিবীণা তার জবাবও দিয়েছে। হয়তো বা জলপাইগুড়িতে ফিরে যাবার সম্মতি জানাতেও আপত্তি করেনি। আর সেই সংবাদটা তাকে বলার আগে অগ্নিবীণা এমন ইতস্তত করছে।

দীপ্তেন্দুর মুখের অবস্থা দেখে অগ্নিবীণা মুচকি হাসল। বলল,—'আপনি বোধহয়, কোনো খারাপ খবরের আশংকা করছেন, তাই না? তারপর অপাঙ্গে তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল,—'জলপাইগুড়ির চা-বাগানের হাসপাতাল থেকে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে।'

—'চা-বাগানের হাসপাতাল থেকে? যেখানে তুমি মেডিক্যাল অফিসার।' দীপ্তেন্দু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কথা কইল।

'হ্যাঁ। সেটাই আমার কর্মস্থল।'

'তা কি লিখেছে ওরা?'

অগ্নিবীণা ঈষৎ হেসে জানাল,—'কী আবার? স্টাডি লিভ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি নিশ্চয় নভেম্বরের শুরুতেই চাকরিতে জয়েন করতে পারব।'

দীপ্তেন্দু আড়চোখে ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল,—'তুমি তাহলে পুজোর পরই জলপাইগুড়ি ফিরে যাচ্ছ বুলু?'

অগ্নিবীণা কেমন ম্লান হেসে জানাল,—'কি করব বলুন দীপ্তেন্দু দা? আমাকে তো একদিন জলপাইগুড়ি ফিরে যেতেই হবে। তাছাড়া মেডিক্যাল কলেজের হাউস-স্টাফশিপও যখন অক্টোবর মাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'এরই মধ্যে দু-বছর complete হয়ে গেল বুলু?'

'প্রায়।' অগ্নিবীণা ভুরু তুলে তাকাল। বলল,—'দু-বছর মানে পুরো দু—বছরও নয়। তার কারণ এর আগে আমি এক বছর তিন মাসের মতো হাউস-স্টাফ ছিলাম।'

'কিন্তু পরীক্ষা? সেটা দেবার পরই তো তোমার চাকরিতে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল।'

অগ্নিবীণা বলল,—'পরীক্ষার এখনও ঢের দেরি। সামনের বছর মে মাসে হবার কথা। ততদিন পর্যন্ত আমাকে ছুটি দিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী রাজী হবে?'

প্রসঙ্গটা চাপা দিতে দীপ্তেন্দু শুধোল,—'দাদু নিশ্চয় এ খবর শুনেছেন?'

'নাহ্। এখনও বলিনি। তবে একদিন খাবার টেবিলে বসে জানিয়েছিলাম যে আমার হাউস-স্টাফশিপ শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই দাদু।'

দীপ্তেন্দু দুঃখ করে বলল,—'তাহলে পুজোর পরই তুমি জলপাইগুড়ি রওনা

'এখনই তা বলা যাবে না। কারণ স্টাডি-লিভ আরো কিছুদিন বাড়ানোর জন্য আমি একটা দরখাস্ত পাঠাব ভেবেছি। অন্তত আরো ছ-মাস যদি ওরা ছুটিটা extend করতে রাজী থাকে।'

দীপ্তেন্দু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল,—'তোমার স্বামী মানে সৌম্যকান্তিবাবু ইতিমধ্যে বোধহয় আর চিঠি লেখেন নি?'

'নাহ্।' অগ্নিবীণা কেমন নিরাসক্ত চোখে তার দিকে তাকাল। বলল,—'ওর চিঠি এলে নিশ্চয় আপনাকে সেটা দেখাতাম। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একটি কথাও তো গোপন করিনি।'

পুজোর পর নয়। নতুন বছরের প্রথমেই অগ্নিবীণা তার কর্মস্থলে ফিরে গেল। হাসপাতাল কতৃপক্ষ এর বেশি ছুটি দিতে রাজী হয় নি। বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে অগ্নিবীণা একদিন স্টেশনে ট্রেন ধরতে রওনা হ'ল। জানুয়ারি মাসের ওই কনকনে ঠান্ডায় দীপ্তেন্দু ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে সাতসকালে এসে হাজির। সাড়ে ছটায় ট্রেন। ট্যাক্সি ডেকে মালপত্র গাড়িতে তুলে অগ্নিবীণাকে স্টেশনে সী-অফ করতে যাবে বলেই সে এসেছে।

অবিনাশ বাড়িতে ছিলেন। ঠান্ডা লেগে কদিন থেকেই প্রচন্ড কাশি হচ্ছে তার। রাত্তিরে এবং ভোরের দিকে সেটা আরো বাড়ে। দীপ্তেন্দুকে দেখে অবিনাশ খুশি হয়ে বললেন,—'তুমি না এলে মেয়েটাকে গাড়িতে তুলে দিতে আমাকেই যেতে হত, বুঝলে?'

দীপ্তেন্দু বাধা দিয়ে বলল,—'না-না। এই শরীর নিয়ে আপনাকে যেতে হবে কেন? আমি যখন আছি। বরং কটা দিন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করুন কাকু।'

বাড়ি থেকে বেরোবার আগে অগ্নিবীণা তার বাবাকে উদ্দেশ করে বলল,—'ওষুধটা নিয়মিত খেও কিন্তু। আর অন্তত তিনবার গরম জলে নুন, মিশিয়ে গার্গল করবে। তাহলেই কাশিটা কমে যাবে।'

ব্রজবিলাস এগিয়ে এসে সখেদে বললেন, —'মহারানী চলে যাচ্ছে দীপ্তেন্দু, এ-বাড়িতে এবার টেকাই দায় হবে। অন্তত দুটো বছর বেশ ছিলাম। মহারানী না এলে আমার শরীরটা আগেই ভেঙে যেত।'

অগ্নিবীণা চোখ পাকিয়ে বলল,—'যা-যা বলে গেছি সব মনে থাকবে তো? ঠিক সেইরকমভাবে চলবে। আর মাসের প্রথমেই আমার বন্ধু সুরমা এসে তোমার ব্লাড-প্রেশার, পালস্ বীট্, সব চেক করে যাবে। দরকার মনে করলে ব্লাড-সুগার পরীক্ষা করবে। তারপর তো ওর কাছ থেকেই আমি সব খবর পাচ্ছি।'

গাড়ি ছাড়ার আরো মিনিট দশ দেরি ছিল। সীটে বসে অগ্নিবীণা বলল,—'আপনার নিশ্চয় খুব খারাপ লাগছে দীপ্তেন্দুদা, এই ভাবে সকলকে রেখে চলে যাচ্ছি। কিন্তু এ ছাড়া আর তো কোনো উপায়ও ছিল না।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'মে-মাসে তোমার পরীক্ষা বলেছিলে। তার আগে নিশ্চয় আর কলকাতায় আসছ না।'

'বোধহয় না। এতদিন ছুটিতে থাকার পর আবার ছুটির কথা বলব কোন মুখে?'

ট্রেন ছাড়বার আগে অগ্নিবীণা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—'আপনাকে দেখলে আমার খুব কষ্ট হয় দীপ্তেন্দুদা। সর্বদা মনে হয় আপনার এই অবস্থার জন্য আমি দায়ী। তখন যদি মায়ের কথামতো বিয়ে করতে রাজী না হতাম, তাহলে জীবনের মোড়টাই অন্যদিকে ঘুরে যেত। কিন্তু মা এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করল যে আমার সামনে আর অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না।'

দীপ্তেন্দু হাত বাড়িয়ে তার বাম হাতের আঙুলগুলি চেপে ধরে বলল,—'কি হবে এসব কথা চিন্তা করে? আর মানুষ যা চায় তাই কি সবসময় পায়? মাথার ওপর একজন সর্বনিয়ন্তা রয়েছেন না? তিনি যা ইচ্ছা করবেন তাই ঘটবে বুলু।'

ট্রেন ছাড়ল। সাপের মতো আঁকাবাঁকা গতিতে গাড়িটা তার সামনে দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। দু-এক মিনিট জানালার ধারে-বসা অগ্নিবীণার অপসৃয়মান মুখখানার দিকে সে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখের সামনে সব কিছু মিলিয়ে যেতেই ভগ্নহৃদয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলো।

মার্চ মাসের প্রথমে দীপ্তেন্দু ফের ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে এলো। ব্রজবিলাস সরকার বৈঠকখানায় একা বসেছিলেন। চৌকাঠ ডিঙিয়ে দীপ্তেন্দু ঘরে পা দিতেই তিনি উল্লসিত হয়ে বললেন,—'আরে দীপ্তেন্দু যে। কতদিন তোমার দেখা নেই। একটা টেলিফোন করেও তো বুড়োটার খোঁজ নিতে পারতে।'

দীপ্তেন্দু লক্ষ করল,—'এই ক'মাসেই ব্রজবিলাসের চেহারাটা আরো ভেঙে গেছে। শীর্ণ মুখ। দৃষ্টি শান্ত, ভাবলেশহীন। গলার কাছে মাসলগুলো ঢিলে হয়ে শিরাগুলি দড়ির মতো লাগছে।'

কৈফিয়ত দেবার ঢঙে দীপ্তেন্দু বলল,—'সময় করতে পারিনি দাদু। সেজন্য ক্ষমা করবেন।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'বড্ড একা লাগে ভাই। ইদানীং পরাশরও তেমন আসে না। বেশির ভাগ সময় বাঁকুড়াতেই পড়ে থাকে। আর আমিও তো জেলা কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট নই। শরীর যখন বইছে না তখন মিছিমিছি পদ আঁকড়ে থেকে লাভ কি? তবু মাঝে মাঝে কংগ্রেস অফিসে যাই। সম্পর্ক এই পর্যন্ত।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'আপনার মহারাণীর কোনো খবর পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। গতমাসেও চিঠি লিখেছিল। কখনও টেলিফোন করে, তা তোমার সঙ্গে সে কোনো যোগাযোগ করে নি?'

দীপ্তেন্দু জবাব দিল,—'মাসখানেক আগে একবার টেলিফোন করেছিল। তারপর বোঝেনই তো, টেলিফোন করলেই যে আমাকে পাবে তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? রিপোর্টারের কাজ,—কখন কোথায় থাকি তার কি ঠিক আছে?'

ব্রজবিলাস বললেন,—'একটা চিন্তা আমার মাথায় চেপে বসে আছে দীপ্তেন্দু।'

'কি চিন্তা দাদু?'

'আমি কেবলি ভাবি শেষপর্যন্ত মহারানীর কি হাল হবে?

বাকি জীবনটা ওর এই ভাবেই নিঃসঙ্গ কাটবে? সৌম্যকান্তির সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলেও না হয় একটা উপায় ছিল। কিন্তু ওর শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে তেমন সাড়াশব্দ নেই।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমার মনে হয় সৌম্যকান্তিবাবু মানে ওর স্বামী ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফের বাড়ি নিয়ে যেতে চান। সেজন্যই বোধহয় আদালতে ডিভোর্সের মামলা রুজু হয় নি।'

'কিন্তু মহারানী যে আর শ্বশুরবাড়ি যেতে রাজী নয়।

জলপাইগুড়ি যাবার আগের দিন রাত্তিরে এই কথাটা ওকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। স্বামী নিয়ে যেতে চাইলে সে কি ফের শ্বশুরবাড়িতে যেতে রাজী?'

দীপ্তেন্দু আগ্রহসহকারে শুধোল,—'শুনে অগ্নিবীণা কি জবাব দিল দাদু?'

ব্রজবিলাস কেমন ম্লান হাসলেন। বললেন,—'ওর সেই এক কথা। সৌম্যকান্তিকে সে আর বিশ্বাস করে না। একবার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তার কাছে ধরা দিলে দুদিন বাদেই স্বামীর সেই কুৎসিৎ রূপটা আবার বেরিয়ে আসবে। তখন তার কী উপায় হবে?'

মে মাসে নয়। জুলাইমাসের মাঝামাঝি অগ্নিবীণার গাইনি অ্যান্ড অবস্টেরিকসের এম. এস পরীক্ষা শেষ হ'ল। দশ দিনের ছুটি নিয়ে আসা। পড়াশোনার যা চাপ। তাই দীপ্তেন্দু ইচ্ছে করেই আর ডাফ স্ট্রীটের পথ মাড়ায় নি। পরীক্ষা শেষ হবার পরদিনই সে অগ্নিবীণার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

তাকে দেখেই অগ্নিবীণা আপ্যায়ন করে বলল,—'আসুন দীপ্তেন্দুদা। আমার খুব ইচ্ছে করছিল আপনাকে একদিন আসতে বলি। কিন্তু হাসপাতালের চাকরি বজায় রেখে পরীক্ষার প্রিপারেশান করা যে কী শক্ত তা আপনি নিশ্চয় বুঝবেন। তাই কলকাতায় ফিরে রোজ অন্তত আঠারো ঘন্টা বই মুখে বসে থেকেছি।'

দীপ্তেন্দু হেসে শুধোল,—'কিন্তু তোমার পরীক্ষা কেমন হ'ল সেটা তো বলবে?'

অগ্নিবীণা চোখ নাচিয়ে ঈষৎ রহস্য করে জানাল,—'মনে হচ্ছে উতরে যেতেও পারি।'

'পারি কেন বলছ? নিশ্চয় উতরে যাবে। আমি জোর গলায় তা ঘোষণা করছি।'

অগ্নিবীণা ঈষৎ হাসল। বলল,—'আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। দেখুন কী ফল হয়। শুনেছি মাসখানেক বাদেই নাকি রেজাল্ট জানা যাবে।'

বিকেলে ডাফ স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে দীপ্তেন্দু পাথুরিয়াঘাটার মেসে যাবার পথ ধরল। তাকে কিছুটা রাস্তা এগিয়ে দেবার জন্য অগ্নিবীণাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'তুমি তাহলে কবে জলপাইগুড়ি যাচ্ছ?'

'পরশু মানে শনিবারই রওনা হবার কথা। কিন্তু আমি ভাবছি রবিবারটা পর্যন্ত এখানে থেকে যাব।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'এবার আর তোমাকে সী-অফ করতে যেতে পারছি না বুলু। সোমবার সকালের ট্রেন ধরেই আমাকে একবার আসানসোল যেতে হতে পারে।'

'আসানসোলে কেন?'

'ওখানকার কোলফিল্ড থেকে নিয়মবহির্ভূত ভাবে তোলা কয়লা নানা জায়গায় পাচার হচ্ছে বলে খবর আছে। ভারত সরকারের কয়লামন্ত্রক এই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। সেই ব্যাপারেই খোঁজখবর নিতে পত্রিকার সম্পাদক আমাকে আসানসোল পাঠাচ্ছেন।'

অগ্নিবীণা বলল,—'তাহলে আপনার সঙ্গে আর দেখা হচ্ছে না দীপ্তেন্দুদা। আবার যখন কলকাতায় আসব ততদিন পর্যন্ত আমাদের দুজনকেই অপেক্ষা করতে হবে।'

তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দীপ্তেন্দু শুধোল—'তোমার শ্বশুরবাড়ির খবর কি বুলু?'

মানুষটা কী জানতে চায় তা বুঝতে একটুও বিলম্ব হ'ল না অগ্নিবীণার। ম্লান হেসে সে জবাব দিল,—'নতুন খবর কিছু নেই। সেই এক কথা। হাসপাতালে জয়েন করবার পর সৌম্যকান্তি অন্তত দুবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। কিন্তু ওর প্রস্তাব আমি নাকচ করে দিয়েছি। উল্টে বলেছি বরং তার চেয়ে কোর্টে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার নোটিশ পেলেই আমি অনেক বেশি খুশি হবো। আর আদালত ডির্ভোসের ডিক্রি দিলে বরং স্বচ্ছন্দে সে আবার বিয়ে করতে পারে। স্ত্রীর প্রয়োজন থাকলে সেটা করাই উচিত হবে।'

॥ আঠারো ॥

একটা বছর তরতর করে কেটে গেল। ইতিমধ্যে অগ্নিবীণা তাকে দু-তিনবার টেলিফোন করেছে। প্রথমবার তার পাশের আনন্দ-সংবাদ দিয়ে। অন্য দুবার এমনি তার কুশল শুধোতে।

একদিন অফিসে যেতেই রতিকান্ত বসু তাকে তলব করলেন। সে ঘরে ঢুকতেই তাকে বসতে ইঙ্গিতে করে বললেন,—'ইলেকশন তো আবার দোরগোড়ায় চলে এলো দীপ্তেন্দুবাবু।'

'দোরগোড়ায় কেন বলছেন স্যর? এখনও তো উনিশ'শ ছেষট্টি সাল শেষ হয় নি। অন্তত নতুন বছর না শুরু হলে নির্বাচনের ঢেউ উঠবে বলে তো আমার মনে হয় না। তাছাড়া যতদুর জানি ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে পশ্চিম বাংলায় ভোট হতে পারে।'

রতিকান্তবাবু ঈষৎ গম্ভীর মুখে বললেন,—'কিন্তু কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই তাদের প্রার্থীর নামের তালিকা প্রকাশ করে বসে আছে। তবে এবারকার নির্বাচনী পরিস্থিতিটা একটু ভিন্ন। কম্যুনিস্ট পার্টি যেমন দুই ভাগে বিভক্ত, কংগ্রেসও তেমনি দুই শিবিরে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একদিকে যেমন অতুল্য ঘোষ এবং প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস, অন্যদিকে অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস এই নির্বাচনে একটা নতুন factor হয়ে দাঁড়িয়েছে। অজয়বাবুর ত্যাগ, সততা, এবং দেশের প্রতি গভীর আনুগত্য পশ্চিম বাংলার মানুষকে প্রভাবিত করবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কংগ্রেসীরা কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের শক্তি সামর্থ্যকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। অতুল্য ঘোষ একটি মিটিঙে বলেছেন বাংলা কংগ্রেস কাঠঠোকরার মতো। ঠুকে ঠুকে একটা গাছকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু কোনোদিনই তাতে সফল হয় না।'

রতিকান্তবাবু বললেন,—'বাংলা কংগ্রেসের শক্তিকে অতটা হাল্কাভাবে নেওয়া বোধহয় উচিত হবে না। কারণ অজয়বাবু ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন দু'শ আশিটি আসনের মধ্যে অন্তত এক'শ ছাপান্নটি আসনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং ভালো ফল করবার আশাও রাখেন।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'গতবারের মতো এবারেও নিশ্চয় আমাদের কাগজে নির্বাচনী সমীক্ষা প্রকাশ করবেন?'

'নাহ্। ঠিক নির্বাচনী প্রতিবেদন বের করবার ইচ্ছে আমার নেই। কোন আসনে কোন দলের শক্তি বেশি, অথবা কার জেতার সম্ভাবনা রয়েছে এ রকম একটা ভবিষ্যদ্বানী করা বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ এই নির্বাচনে সমস্ত ব্যাপারটা যেন

তরল। কোথায় কোনখানে যে ভোট দানা বাঁধবে তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন তো নিশ্চয় বরং ভুল প্রমাণিত হতে পারে। কিছু আসনের মোটামুটি একটা চিত্র আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করব। কিন্তু আগ বাড়িয়ে তার বেশি কিছু বলতে যাব না।'

জানুয়ারীর শুরুতেই ময়দানে একটা বিশ্রী কলঙ্কজনক অধ্যায় ঘটে গেল। আগের দিন রাত্তিরে পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের মেসে সেক্রেটারী রতন দত্তের সঙ্গে এই নিয়ে তার রীতিমত একটা আলোচনা হয়েছিল। এবার কলকাতা টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের জেতার সম্ভাবনা আছে? ক্রিকেট বিষয়ে দীপ্তেন্দুর বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় বেশি নয়। তবু সে বলেছিল শক্তিমান ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে লয়েড, সোবার্স কানহাই, নার্স এর মতো ব্যাটস্‌ম্যানের বিরুদ্ধে ভারত কি দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারবে? কিন্তু হঠাৎ খেলার মাঠে তুচ্ছ একটা ঘটনা নিয়ে পুলিশের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। মাথার ওপর চটের আচ্ছাদনে কারা যেন আগুন ধরিয়ে দিল। লেলিহান অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে গ্যালারির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ভীত, এস্ত, ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়েরা প্রাণভয়ে ছুটে দর্শকদের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করে জীবন বাঁচাতে প্রয়াসী হ'ল।

কাগজটার অবস্থা যে ভালো নয় অফিসে নীলিমা দত্তের মুখেও দীপ্তেন্দু তাই শুনল। খবরটা এক ফাঁকে নীলিমা দত্ত তাকে জানিয়ে দিলেন। বললেন, —'যতদূর বুঝতে পারছি মার্চ মাসের পর কোম্পানী লক-আউট ঘোষণা করে কাগজটার প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে পারে।'

দীপ্তেন্দু সভয়ে শুধোল,—'তাহলে আমাদের কি উপায় হবে নীলিমাদি?'

নীলিমা দত্ত হেসে বললেন,—'তোমার জন্য আমার চিন্তা নেই। চেষ্টা করলে অন্য একটা ভালো কাগজে নিশ্চয় চাকরি পাবে।'

'কিন্তু চাকরি কি চাইলেই পাওয়া যায়?'

নীলিমা দত্ত বললেন,—'ইংরাজী খবরের কাগজের পাতায় একটু নজর রাখ। দেখবে নর্থ ইন্ডিয়ার অনেক কাগজ থেকে মাঝে মাঝেই জার্নালিস্ট চেয়ে বিজ্ঞাপন দেয়। তুমি যখন বাংলা আর ইংরাজী, দুই ভালো লিখতে পার, তখন তোমার কাজের অভাব হবে না।'

'আর আপনি?' দীপ্তেন্দু শুধোল। 'আমার মতো খবরের কাগজের পাতায় আপনিও কি চাকরি খুঁজবেন নীলিমাদি?'

'নাহ্।' নীলিমা দত্ত আকর্ন বিস্তৃত হাসি উপহার দিলেন। সলজ্জ হেসে বললেন,—'আমার আর চাকরি করবার ইচ্ছে নেই দীপ্তেন্দু।'

'তার মানে? বাড়িতে বসে থাকবেন?'

নীলিমা দত্ত মুচকি হেসে জানালেন,—'তোমাকে একটা কথা বলার সুযোগ

হয়নি। অধ্যাপকের বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালত মঞ্জুর করেছে। তাই আর দেরি না করে আগামী সপ্তাহেই আমরা রেজেস্ট্রী করছি। ইতিমধ্যে একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সঙ্গে উনি কথা বলেছেন। নোটিশ ইত্যাদি যা দেওয়া প্রয়োজন সে সব ব্যবস্থা তিনি করে রাখবেন।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কনগ্র্যাচুলেশনস্ নীলিমাদি। আপনাদের দুজনের বিবাহিত জীবন সার্থক হোক। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরছে।'

'কি প্রশ্ন বলো?'

'এতদিন দায়িত্ব নিয়ে অফিসের কাজকর্ম করবার পর বাড়িতে বসে থাকতে আপনার ভালো লাগবে?'

'ধুর বোকা ছেলে।' নীলিমা দত্ত সস্নেহে তাকে একটা ছোট্ট ধমক দিলেন। বললেন,—'বসে থাকতে হবে কেন? বাড়িতে আমার কাজ নেই?' নীলিমা দত্ত মুচকি হাসলেন।

ফের বললেন,—'অনেকদিন তো ঘর-সংসার করিনি ভাই। ভাবছি এখন সেটাই করব। আর মেয়েদের যখন সংসারের হাল ধরা প্রধান কাজ। তবে কাগজটা যতদিন না বন্ধ হয় ততদিন অবশ্য এই অফিসে আছি। তারপর আর কিছু নয়। স্রেফ সংসারধর্ম। ঘর সাজাব, রান্না করব। বিকেল হলে আর একজনের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকব। সে বাড়ি এলে তাকে নিজের হাতে খেতে দেব। ছুটিছাটার দিনে দুজনে বেরিয়ে পড়ব। যেখানে খুশি, যেদিকে দু-চোখ যায়। এতদিন এসব স্বপ্নের মতো মনে হ'ত দীপ্তেন্দু। এখন ঈশ্বরের কৃপায় স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে।' অপাঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে নীলিমা দত্ত আমার বললেন,—'আমার মুখে এসব কথা শুনে তুমি বুড়োবয়সের আদিখ্যেতা বলে ভাববে। কিন্তু যা বলেছি সেটাই আমার মনের কথা। আমার বিশ্বাস বাকি দিনগুলো এভাবে কাটাতে পারলেই সমস্ত জীবন আমি ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

ইংরাজী বছরের শুরুতেই দীপ্তেন্দু একদিন ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে ব্রজবিলাস সরকারের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বৈঠকখানায় ঢুকতেই সে দেখল জমজমাট আসর। অন্তত সাত-আটজন ঘরের মধ্যে বসে। তার মধ্যে পরাশরও আছেন। কিন্তু ব্রজবিলাস সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে দীপ্তেন্দু চমকে উঠল। শরীরটা আরো ভেঙে গেছে দাদুর। চোখের নীচে কালি। গাল দুটো ভেতরে ঢুকেছে। তবু তাকে দেখেই ব্রজবিলাস সহর্ষে জানালেন, —'এসো দীপ্তেন্দু, ইলেকশনের বাজনা তো আবার বেজে উঠেছে।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে বসতেই পরাশর বললেন,—'শুনেছ নিশ্চয় আঠারোই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বাংলায় ভোট শুরু হচ্ছে। আর বাইশ থেকে পঁচিশে

ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গণনাও শেষ হবে বলে নির্বাচন কমিশন মনে করে।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'এবার বিধানসভায় আরো আঠাশটি আসন বেড়েছে দীপ্তেন্দু। দু'শ বাহান্ন থেকে বেড়ে আসন সংখ্যা এখন দু'শ আশিতে পৌঁছেচে।'

উপবিষ্ট এক ভদ্রলোক বললেন,—'এবার নতুন বাইশ লক্ষ ভোটার। নির্বাচনে তারাও একটা মস্ত বড় ফ্যাক্টর। এই ইয়ংম্যানরা যার দিকে ঝুঁকবে তার জেতার সম্ভাবনা বেশি।

পরাশর বললেন,—'চিন্তার কারণ নেই। কংগ্রেস এবারও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে শাসন-ক্ষমতায় আসবে।'

ব্রজবিলাস বললেন,—'অত আত্মসন্তুষ্টি বোধহয় ভালো নয় পরাশর। এবার কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে অজয়বাবু বাংলা কংগ্রেস গঠন করেছেন। বেশ কিছু আসনে বাংলা কংগ্রেস নিশ্চয় আমাদের একটা বড়সড় ধাক্কা দিতে পারে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কিছুদিন আগে হুমায়ুন কবীর বাংলা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে এই কথাই ঘোষণা করেছেন। আগামী নিবার্চনে, মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগণা, কলকাতা, বাঁকুড়া, নদীয়া, কুচবিহার এবং মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের ভরাডুবি হবে।'

আগন্তুক এক ভদ্রলোক বললেন,—'কংগ্রেসের নির্বাচন প্রার্থীদের নামের তালিকায় দেখবেন অন্তত পঁয়ত্রিশ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। বত্রিশজন আইনজীবী, তেইশজন চিকিৎসক, পঁয়তাল্লিশ জন শিক্ষক এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীনও আছেন। এর থেকেই বোঝা যায় কংগ্রেস একটি broad-based রাজনৈতিক দল, যা দেশের সব ধরনের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। এ ছাড়াও নামের তালিকায় অন্তত পনের জন মহিলা প্রার্থী আছেন।'

পরাশর বললেন,—'কংগ্রেসই একমাত্র দল যারা নাকি দু'শ আশিটি আসনেই প্রার্থী দিতে পারে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'অকংগ্রেসীরা এতদিন মোটামুটি দুটি শিবিরে বিভক্ত ছিলেন। একটিতে সি. পি. আই (মার্ক্সিস্ট), আর এস. পি, আর সি. পি. আই, এস ইউ. সি আই. ইত্যাদি। অন্যটিতে ফরোয়ার্ড ব্লক, পি. এস. পি., এল. এস. এস., বাংলা কংগ্রেস এবং অন্যান্য সমমনোভাবাপন্ন দল। সি. পি. আই দ্বিতীয় শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। এখন নির্বাচন নিকটে আসতেই এই দুই শিবির আরো কাছাকাছি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এককাট্টা হবে বলেই আশা করা যাচ্ছে।'

পরাশর বললেন,—'একমাত্র দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনেই বিরোধীরা সব চেয়ে ভালো ফল করেছিল। মোট আসনের এক'শটি আসন তাদের দখলে যায়। এবারও তার চেয়ে বেশি আসন বিরোধীদের দখলে যাবে বলে আমরা মনে করি না।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'পশ্চিম বাংলায় লোকসভা আর বিধানসভা মিলিয়ে মোট

তিন'শ কুড়িটি আসনে ষোল'শ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বাঁকুড়া আসনে এবার সত্যনারায়ণ মিত্র কংগ্রেসের মনোনয়ন পেয়েছেন। দেখুন শেষপর্যন্ত ফলাফল কী দাঁড়ায়।'

দলবল নিয়ে পরাশর চলে যেতেই দীপ্তেন্দু বলল,—'আপনার শরীর কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে দাদু। একজন ভালো ডাক্তারকে দেখালে হয় না?'

'কী হবে ডাক্তার দেখিয়ে?' ব্রজবিলাস চোখ তুলে তাকালেন। বললেন—'এই পৃথিবীতে তো অনেকদিন পড়ে আছি ভাই। ওপর থেকে ডাক এলেই রওনা হবার জন্য তৈবি।' ফের সহাস্যে মন্তব্য করলেন,—'শুধু বলে যাব, কোনো খেদ নাই। Good-bye to you all'?

'উহুঁ। ওসব কথা শুনতে চাই না। অগ্নিবীণাকে আজই চিঠি লিখছি আমি। ওর কোনো বন্ধুকে বলে আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক। দরকার হলে একজন স্পেশ্যালিস্টকে দেখানো প্রয়োজন।'

ব্রজবিলাস ম্লান হেসে বললেন,—'না-না। ওকে আর বিরক্ত ক'র না। মেয়েটা জীবনে কী পেয়েছে বলতে পার? ঘর-সংসার, স্বামী-পুত্র কিছুই ওর সইল না। মহারানীর কথা ভেবেই তো আমার শরীরটা এত তাড়াতাড়ি ভাঙতে শুরু করেছে দীপ্তেন্দু। ওর মুখখানা মনে পড়লে রাত্তিরে আমার চোখে ঘুম আসে না ভাই।'

ব্রজবিলাস আবার বললেন,—'পরাশর যাই মতামত দিক কংগ্রেসের অবস্থা এবার ভালো নয় দীপ্তেন্দু। অন্তত পার্টি থেকে অজয়বাবুর মতো একজন ব্যক্তিত্বকে বহিঃষ্কার করা খুব ভুল হয়েছে। এর জন্য চরম মূল্য দিতে হতে পারে। তাছাড়া এই কুড়ি বছরে মানুষকে আমরা কী দিতে পেরেছি বলতে পার? বেকারী বাড়ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল অবস্থা, অগুনতি মানুষ বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে, তারা দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। শিক্ষার মান নিম্নমুখী বললেও অত্যুক্তি হয় না। লেখাপড়া, খেলাধূলো কোন জায়গাটায় আমরা বিশ্বমানের ধারে কাছে পৌছুতে পেরেছি?'

দীপ্তেন্দু চুপ করে শুনছিল।

ব্রজবিলাস সখেদে বললেন,—'আমাদের অবস্থাটা সেই কবিতায় বর্ণিত লাইনগুলির মতো,—

Far from the madding crowd's ignoble strife,
Their wishes never learned to stray,
Along the cool sequestered way of life,
They led their noiseless tenor of their way.

ফের ঈষৎ হেসে শুধোলেন,—'কার কবিতা জানো?'

'জানি,' দীপ্তেন্দু মৃদু হেসে জবাব দিল,—'Thomas Gray-র Elegy written in a Country Churchyard.'

ব্রজবিলাস বললেন,—'তবে অকংগ্রেসী সবকার পশ্চিম বাংলার শাসনভাব পেলেও তারা যে বিশেষ কিছু দিতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। এদেশে এখন এত সমস্যা যে তাব সুষ্ঠু সমাধান ঈশ্বরের নাগালের বাইরে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—আজ তাহলে উঠি দাদু। কিন্তু আমি যাবার আগে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'কী কথা?'

'আপনার মহারানীকে না জানান, অন্তত অবিনাশ কাকাকে বলে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।'

'বেশ। তোমাকে কথা দিলাম। আমাদের যিনি ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান তাকে একবার কল দিয়ে এই খাঁচাখানা পরীক্ষা করিয়ে নেব। তাহলেই তো খুশি?'

দিন কয়েক বাদেই রতিকান্ত বসু তাকে বললেন,—'তীব্র শ্রেণী সংগ্রামে চীন এখন উত্তাল। আমাদের কাগজেও এই বিষয়ে কিছু কিছু খবর আমরা ছেপেছি। আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন?'

'হ্যাঁ।' দীপ্তেন্দু বলল,—'মাও সে তুং এর সঙ্গে লিউ শাও চিঁ'র একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী লিউ ইতিমধ্যে বেশ বড় রকমের এক বাহিনী গঠন করেছেন।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'শুধু তাই নয়। চীনে ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে। আর এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পাঁচ হাজার লোক ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন। এদিকে মাও-বিরোধী এক সেনানায়ক হুঁশিয়ারী দিয়েছেন সিনকিয়াং দখলের চেষ্টা হ'লে পরমাণু অস্ত্র ভাণ্ডার তারা দখল করবে।'

দীপ্তেন্দুকে লক্ষ করে সম্পাদক আবার বললেন,—'কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার একটা অন্য কথাও আছে। আর সেটা জানাব বলেই আপনাকে ডেকেছি।'

দীপ্তেন্দু শঙ্কিত হ'ল। রতিকান্ত বসু সাধারণত কিছু বলার আগে এই ধরনের ভনিতা করেন না। সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল,—'কী কথা স্যর? আমি জানার জন্য ব্যস্ত হয়েছি।'

রতিকান্ত বসু বললেন,—'শুনেছেন নিশ্চয়, এই কাগজের অবস্থা আর তেমন ভালো নয়। বিজ্ঞাপনও কম। বুঝতেই পারছেন আমরা ব্যয়সঙ্কোচ শুরু করে দিয়েছি। রিপোর্টারদের আজকাল কলকাতার বাইরে পাঠাচ্ছি না। এইভাবে কি কাগজ চলে? এদিকে সৌমিত্রশঙ্কর বাবু এই কাগজের পিছনে আর টাকা ঢালতে রাজী নন। তলে তলে কাগজটা বিক্রি করে দেবার চেষ্টা চলছে। আর খরিদ্দার না জুটলে এপ্রিল মাসের প্রথম থেকেই বঙ্গভূমির প্রকাশন বন্ধ হয়ে যাবে।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'তাহলে আমি তো এক গভীর সমস্যায় পড়ে গেলাম স্যর।'

'নাহ্, অত হতাশ হবার মতো কিছু নয়। সেজন্যই আপনাকে ডেকেছি। দিল্লীর

একটা কাগজের জন্য ইংরাজী আর বাংলা দুই ভাষাতেই দক্ষ এমন একজন ইয়ং জার্নালিস্ট চেয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। ওদের মাইনেপত্রও ভালো, মানে এখান থেকে অনেক বেশি। ইচ্ছে করলে আপনি এখানে একটা দরখাস্ত করতে পারেন।'

'কিন্তু সে চাকরি কি হবে আমার? তাছাড়া দিল্লী মানে অতদূর যাওয়া—।'

রতিকান্ত বসু হাসলেন। বললেন,—'চাকরিটা যাতে হয় সেজন্য আমি একটু চেষ্টা করব। এক সময় কাগজের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য ছিল। আপনার চাকরির জন্য তাকে অনুরোধ করব। মনে হয় আমার কথা ঠেলতে পারবে না। তাছাড়া you were a brilliant student. Academic carrer ভালো। জার্নালিস্ট হিসেবে আপনার ইতিমধ্যে বেশ নাম হয়েছে। আর অতদূর যাওয়ার কথা কেন বলছেন? তাছাড়া কলকাতায় পড়ে থেকেই বা কী লাভ? আপনার তো family মানে বউ-বাচ্চা নেই। আর রাজধানীতে বসে সাংবাদিকতা করা মানে অন্য ব্যাপার। কত বড়-বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে। খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে ইন্টারভ্যু নিতে যেতে হতে পারে। আর জার্নালিস্ট হিসেবে সরকারী টিমের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মান্ড ঘুরে আসাও কিছু অসম্ভব নয়।' মুচকি হেসে সম্পাদক শেষে বললেন, —'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না মশায়। চাকরিটা হ'লে অবশ্যই দিল্লী যাবেন।'

ড্রয়ার থেকে একটা ইংরাজী কাগজ বের করলেন রতিকান্ত বসু। বললেন— 'Fifth Page-এ বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। লাল পেন্সিল দিয়ে আমি ওটা মার্ক করে দিয়েছি।'

কাগজটা হাতে নিয়ে দীপ্তেন্দু উঠল। বলল,—'আপনার কাছে অনেক ঋণ স্যর। তার কণামাত্রও শোধ করবার ক্ষমতা নেই আমার।'

'থাক ওসব কথা। আগে চাকরিটা হোক। তখন আমাদের সকলকে মিষ্টি খাওয়াবেন, তাহলেই সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে।'

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি অফিসের টেলিফোন অপারেটর তাকে বলল,—'এক ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজছেন। নাম বলছেন ব্রজবিলাস সরকার।'

'তাই নাকি? দিন লাইনটা।' দীপ্তেন্দু ব্যস্ত হয়ে উঠল। তারের অন্যপ্রান্তে ব্রজবিলাসের কণ্ঠস্বর। শুনেই দীপ্তেন্দু বলল,—'দাদু আপনি?'

'হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল আমার। পারলে আজই একবার এসো।'

এই ধরনের অনুরোধ ব্রজবিলাস আগে কোনোদিন করেন নি। তাই সে বলল,— 'নিশ্চয় যাব। কিন্তু আপনার শরীর কেমন আছে দাদু?'

'ভালো নেই ভাই। তবে এখনও বেঁচে আছি।'

'সে তো বুঝলাম কিন্তু আপনি ডাক্তার দেখিয়েছিলেন তো?'

'নিশ্চয়। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম। আর সে কথা রাখব না?'

'তা ডাক্তার কী বলল?'

'কি আবার বলবে? ডায়াস্টলিক না কী যেন বলে নীচেরটাকে। সেটা অনেক বেশি। এক'শ পাঁচের মতো। তাই হাঁটাহাঁটি, বেরুনো সব বারণ করে দিয়েছে।'

'ঠিক আছে দাদু, আজ সন্ধ্যের পরই আপনার সঙ্গে দেখা করছি।'

অন্যদিনের মতো বৈঠকখানা ঘরে ব্রজবিলাস সরকারের দেখা মিলল না। তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। একজন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দীপ্তেন্দুকে ভিতরে নিয়ে গেল। তাকে দেখেই ব্রজবিলাস উঠে বসলেন। বললেন,—'ওই চেয়ারটায় ব'স।'

সমস্ত ঘরে একটা করুণ নিঃস্তব্ধতা। এমন কিছু ঘটে গেছে যার জন্য গোটা বাড়িটাই যেন চুপচাপ শব্দহীন। বোধহয় ঘরের ভিতর স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে একটু হাওয়া ঢুকলেও তার শব্দ শোনা যাবে।

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'শরীর কি খুবই অসুস্থ দাদু?'

ব্রজবিলাস নিমীলিত নেত্রে জবাব দিলেন,—'তার চেয়েও খারাপ একটা সংবাদ আছে।'

'কি সংবাদ দাদু?' দীপ্তেন্দু শুধোল।

ব্রজবিলাস বললেন,—'মহারানীর স্বামী সৌম্যকান্তি সিকিমে একটা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে।'

'কবে? কতদিন আগে?'

ব্রজবিলাস বললেন—'মাত্র তিন দিন আগে। খবর পেয়ে অবিনাশ কালই জলপাইগুড়ি রওনা হয়ে গেছে। এই অবস্থায় মেয়েটার পাশে অন্তত একজনের গিয়ে দাঁড়ানো দরকার। তাছাড়া এই ঘটনার পর কিছুদিনের জন্য ওকে কলকাতায় নিয়ে আসতে বলেছি।'

'অ্যাকসিডেন্টটা কোথায় হয়েছিল?'

'সবটা ভালো করে জানতে পারিনি। তবে যেটুকু শোনা গেছে তাই বলছি। কন্ট্রাক্টরির কাজে সৌম্যকান্তি সিকিম রওনা হয়েছিল। ওর গন্তব্যস্থল ছিল গ্যাংটক। তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ি যখন ওপরে উঠছিল তখন সামনের দিক থেকে আসা একটা জিপকে পাশ দিতে গিয়ে সৌম্যকান্তির গাড়িটা প্রায় হাজার ফুট নীচু একটা খাদে পড়ে যায়। ব্যস! তাতেই যা হবার তা হয়ে গেছে।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'অগ্নিবীণাকে নিয়ে অবিনাশকাকু কবে ফিরবেন কিছু বলেছেন?'

'হ্যাঁ, আজ দুপুরেই ওর টেলিফোন এসেছিল। অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু। ছেলেপুলে নেই। তবু স্ত্রী হিসেবে ওর পারলৌকিক কাজকর্ম না শেষ হওয়া পর্যন্ত মহারানী আর কেমন করে আসবে? আমি আশা করছি দিন সাত-আট পরেই দুজনে জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হতে পারবে।'

দীপ্তেন্দু মন্তব্য করল,—'খুব দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু সেই যে বলে নিয়তি কেন বাধ্যতে?'

ব্রজবিলাস বললেন,—'তুমি যা বলছ তাই হয়তো ঠিক, কিন্তু স্বার্থপরের মতো আমিও একটা কথা না বলে পারছি না। মহারানী বোধহয় এবার ওর শ্বশুরবাড়ির হাত থেকে মুক্তি পেল। এতদিন ওর ভবিষ্যত কী হবে তাই নিয়ে আমি ভেবেচিন্তে কোনো কূল পেতাম না। কিন্তু এখন মনে হয় সামনে যেন একটা আলোর রেখা ফুটে উঠেছে। শুধু একটা ব্যাপারে আমার মনে খটকা রয়ে গেছে দীপ্তেন্দু। এমন কী মহারানীও আমাকে সে কথা জানায় নি।'

'খটকাটা কি দাদু? আর কোন কথাই বা মহারানী আপনাকে বলে নি?'

ব্রজবিলাস বিছানায় শুয়ে বললেন,—'গতকাল টেলিফোনে অবিনাশ জানাল মাস দুই আগে মহারানী নাকি মাত্র সাতদিনের জন্য তার শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর ঘরে ফিরে গিয়েছিল।'

'বলেন কি?' দীপ্তেন্দু ভুরু কুঁচকে তাকাল। বলল,—'অথচ এখানে থাকতে শুধু বলত শ্বশুরবাড়িতে তার ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর যদি বা ফিরে গিয়েছিল, তাও মাত্র সাত দিনের জন্য কেন? তারপর কি আবার ওর কোয়ার্টাসে গিয়ে উঠেছিল?'

'বোধহয় তাই। তবে এর কোনো সদুত্তর তুমি এখনই পাবে না। অন্তত মহারানী কলকাতায় না আসা পর্যন্ত এর ব্যাখ্যা কে দিতে পারবে?'

আরো কিছুক্ষণ ব্রজবিলাসের সঙ্গে কাটিয়ে দীপ্তেন্দু তার পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের মেসে ফিরে গেল। ইলেকশনের আর এক সপ্তাহও দেরি নেই। প্রচারের মাত্রাও এখন তুঙ্গে। কয়েকদিন আগে এক নির্বাচনী সভায় কুম্যনিস্ট নেতা ভূপেশ গুপ্ত মন্তব্য করেন যে আগে মাথা পিছু ষোল আউন্স খাদ্য বরাদ্দ ছিল। এখন তা কমে নয় আউন্সে দাঁড়িয়েছে। সরকার গঠনের জন্য সব দলই এখন তাদের নির্বাচনী সভায় নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে জ্যোতি বসু এক সভায় বলেন সপ্তবাম সরকার গঠিত হলে তা কখনও পুলিশ ও আমলা-নির্ভর হবে না।'

মেসে তার ঘরে ঢুকতেই তিনকড়ি হাজরা বলল,

'আপনার এক বন্ধু দেখা করতে এসেছিলেন। ফিরতে দেরি হচ্ছে তাই একটু আগেই উনি চলে গেলেন। যাবার আগে এই চিঠিটা রেখে গেছেন।'

খামের মুখটা ছিঁড়ে দীপ্তেন্দু চিঠিটা বের করল। রঞ্জনের পত্র। কাগজের অফিসে তাকে না পেয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে পাথুরিয়াঘাটার মেসে হাজির হয়েছিল। ছোট্ট চিঠি। রঞ্জন লিখেছে—

ভাই দীপ্তেন্দু,

সন্দীপের মুখে নিশ্চয় শুনেছিস আমি বিয়ে করছি। ফাল্গুনের আঠাশে দিন। তোকে কিন্তু মেদিনীপুরে আসতেই হবে। আরো দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে সন্দীপও আসবে। বিয়ের কার্ড যথাসময়ে পেয়ে যাবি। কিন্তু তোর আসা চাই। ভালবাসা নিবি।

ইতি
রঞ্জন

চিঠিটা একপাশে সরিয়ে রেখে দীপ্তেন্দু একটা হাই তুলল।

তিনকড়ি হাজরা বলল,—'খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে আপনাকে। যান, মুখহাত ধুয়ে চটপট খেয়ে আসুন। তারপর বিছানায় শুলেই দেখবেন গাঢ় ঘুম।'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'এর মধ্যে রেসের মাঠে যান নি তো?'

'ক্ষেপেছেন? পয়সা কোথায়?' মুচকি হেসে বলল,—'সেবার মোনালিসা বাজীমাত করল বলেই কাবুলের টাকাটা শোধ দিতে পেরেছি। তবে মশায় ইচ্ছে আছে আগামী শনিবারেও একটা উইন খেলব। বালিশের নীচে থেকে রেসের বইটা বের করে তিনকড়ি হাজরা বলল, —'এই যে ঘোড়াটা ফোর্থ ইভেন্টে দৌড়ুবে ওর নাম ব্ল্যাক প্রিন্স। ঘোড়াটাব জন্ম ইতিহাসটা শুনলে তাজ্জব হয়ে যাবেন। আরবী বাপ আর আফ্রিকান মা। কী রকম তেজ বুঝতেই পারছেন। রেসের জকির মতো ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে ফের বলল,—'দেখবেন সকলের আগে তিরের মতো বেরিয়ে যাবে।'

দীপ্তেন্দু হাসছিল। রেসের মাঠ বলতে লোকটা সত্যি পাগল। কিন্তু এই সর্বনাশা নেশা ছাড়তে না পারলে ওর যে কী দুরবস্থা হবে তা কি লোকটা বুঝতে পারছে?

পরদিন অফিসে যেতেই হরিদাসের টেলিফোন পেল সে। অপারেটর তাকে লাইন দিতেই হরিদাসের গলা। সে বলল,—'কালও অন্তত দুবার ফোন করেছি তোকে। কিন্তু পাই নি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'পাবি কেমন করে? অনেক কাজ ছিল যে, তাই বেরুতে হয়েছে।' শেষে অনেক মজা করে সে বলল,—'তারপর বিবাহিত জীবন কেমন কাটছে তোর?'

'মোস্ট চার্মিং।' হরিদাস একমুহূর্ত থামল। ফের বলল, —'হ্যাঁ শোন। একটা খবর দিচ্ছি তোকে।'

'কী খবর?'

হরিদাস বলল,—'আমরা কুড়ি-বাইশ দিনের জন্য কন্টিনেন্ট ট্যুরে যাচ্ছি। আমি আর কণা, আই মিন মিসেস কণা পাল।'

'খুব exciting news। তা কন্টিনেন্টের কোন কোন দেশ ঘুরবি? পাসপোর্ট,

ভিসা এসব হয়ে গেছে?'

হরিদাস অর্থাৎ তমালকুমার বলল, —'পাশপোর্ট তো আগেই ছিল। এখন ভিসার জন্য দরবার। মোটামুটি ধরে রাখ সুইটজারল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী আর সুইডেন, তার সঙ্গে ইংল্যান্ড। এর মধ্যে ভিসা না পেলে একটু অদলবদলও হতে পারে।'

দীপ্তেন্দু মজা করে বলল,—'তাহলে তুই Leaning Tower of Pisa স্বচক্ষে দেখে আসবি। অথচ মনে আছে তোর, বাঁকুড়া কলেজে পড়ার সময় Laws of falling bodies কিছুতেই তোর মাথায় ঢুকত না।' মুচকি হেসে সে আবার যোগ করল, 'আমি ভাবছি বাঁকুড়া কলেজের সেই প্রিন্সিপ্যালের কথা। যিনি তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলেছিলেন। এখন খোঁজখবর করে তোর এই কন্টিনেন্ট ট্যুরের কথা তাকে জানিয়ে দিলে কেমন হয়?'

শুনে হরিদাস শব্দ করে হেসে উঠল। বলল,—'তুই একদিন আয় না। আমরা বোধহয় মার্চের মাঝামাঝি রওনা হতে পারি।'

'চেষ্টা করব। তবে কথা দিতে পারছি না। বুঝতেই পারিস এখন কাগজের অফিসে অনেক কাজ। ইলেকশনের রেজাল্ট। তারপর মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। আর এসব খবর দেবার জন্যই তো news paper। নইলে আমরা কী জন্য আছি?'

অগ্নিবীণা কলকাতায় এসে পৌঁছল নির্বাচনের শেষ ফলাফল বেরুবার ঠিক আগের দিন। প্রথম দিনের পঞ্চাশটি কেন্দ্রের ঘোষিত ফলে কংগ্রেস তেইশটি আর অকংগ্রেসীরা সাতাশটি আসনে জয়ী হয়। দুপুরে অবিনাশ তাকে টেলিফোন করে জানালেন,—'আমরা আজ সকালেই ফিরেছি দীপ্তেন্দু। কিন্তু বাবার শরীর খুব খারাপ। কাজের মেয়েটি বলছিল, বাথরুমে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার দেখে শুনে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলে গেছেন। তবে এখনও ঠিক স্বাভাবিক জ্ঞান ফেরেনি।'

সন্ধ্যেবেলা দীপ্তেন্দু যেতেই অগ্নিবীণা বলল,—'ডাক্তার আজ আবার দেখে গেছেন। উনি বলছেন এটা একটা mild stroke. ফের অ্যাটাক হলে শরীরের একটা দিক সম্পূর্ণ প্যারালাইজড্ হয়ে যেতে পারে।'

দীপ্তেন্দু চুপ করে শুনছিল। অনেক কথা তার মনের মধ্যে জমা হয়ে আছে। এই অবস্থায় সে সব কথা অগ্নিবীণাকে বলাও চলে না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রথমেই চমকে উঠেছিল। বৈধব্যের বেশ বুলুর। ফিতে পাড় একটা সাদা শাড়ি ওর পরনে। গায়ের ব্লাউজটার রঙও সাদা।'

দীপ্তেন্দু একটু চিন্তা করে বলল,—'দাদুকে মেডিক্যাল কলেজ কিংবা কোনো নার্সিং হোমে ট্রান্সফার করলে হ'ত না?'

'নাহ্‌। তার প্রয়োজন নেই। বড় ডাক্তারই তো আজ দেখে গেছেন। উনি সে রকম পরামর্শ দেন নি। কাল সকালেই আর একজন কার্ডিয়োলজিস্ট এসে দেখে যাবেন। রাত্তিরে একজন নার্সকেও থাকতে বলেছি। তারপর তো আমি আছি।'

পরদিন সকাল থেকেই দীপ্তেন্দু খবু ব্যস্ত ছিল। টেলিপ্রিণ্টারে ঘন ঘন ফলাফল আসছিল। সমস্ত কলকাতা জুড়ে সে এক উত্তাল অবস্থা। কংগ্রেসের দুর্গে ভাঙন ধরেছে। প্রফুল্ল সেন এবং অতুল্য ঘোষ দুজনেই পরাজিত। বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখার্জী তমলুক এবং আরামবাগ দুই কেন্দ্রেই জয়ী। ঢাকুরিয়ায় সোমনাথ লাহিড়ী এবং পাঁশকুড়া (পশ্চিম) কেন্দ্রে রজনীকান্ত দলুই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। ইতিমধ্যে সম্মিলিত সরকার গঠনের জন্য অকংগ্রেসী দলগুলি উদ্যোগ নিয়েছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান না জানাতে তারা যৌথভাবে রাজ্যপালের কাছে আবেদন করেছে।

সন্ধ্যের একটু আগে দীপ্তেন্দু ডাফ স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে পৌছল। ব্রজবিলাস তখনও অচৈতন্য প্রায়। তার Sense ফেরেনি। তাকে দেখেই অগ্নিবীণা ফিসফিস করে বলল,—'দাদুর Condition ভালো নয় দীপ্তেন্দুদা। আমার ভয় করছে আজ রাত্তিরেই একটা কিছু ঘটে যেতে পারে।'

অগ্নিবীণা তাকে ব্রজবিলাসের ঘরে নিয়ে গেল। দীপ্তেন্দু চাপা গলায় বলল,—'দাদু, কংগ্রেস নির্বাচনে হেরে গেছে। মাত্র এক'শ সাতাশটি আসন তাদের দখলে। পরাশর দাদুও তার কনস্টিটুয়েন্সি থেকে জিততে পারেন নি। কম্যুনিস্ট পার্টির ছেলেরা লাল কাগজ দিয়ে ল্যাম্প পোস্টের আলোগুলো মুড়ে দিয়েছে। ওরা বলছে পশ্চিম বাংলা লাল,—লাল হয়ে গেছে।'

অগ্নিবীণা বাধা দিয়ে বলল,—'আপনার একটি কথাও কিন্তু দাদুর কানে যাচ্ছে না দীপ্তেন্দুদা। He is in a state of Coma. দেখছেন না কী রকম আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। প্রেসার অনেক নেমে গেছে। রাত্তিরেই আবার একটা Stroke হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।'

ব্রজবিলাস তখন কলকাতা থেকে বহুদূরে সুদূর অতীতের আর একটি দিনে পৌঁছে গেছেন। মেদিনীপুরে গলির ভেতর প্রায়ান্ধকার ঘরে শীর্ণ একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তাদের সভা বসেছে। বিপ্লবী দল। অত্যাচারী ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করাই তাদের ধ্যান-জ্ঞান। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেল। পরদিন খেলার মাঠে রিভলবারে গুলিতে প্রাণ দিতে হ'ল ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে। আর ব্রজবিলাস ধরা পড়লেন মেদিনীপুর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে সাইকেলে করে শালবনী যাওয়ার পথে। বিচারে সাজা,—দ্বীপান্তর। শেষপর্যন্ত সেটা অবশ্য কার্যকর হয় নি।

অগ্নিবীণা যা আশঙ্কা করেছিল সেই রাত্তিরেই তাই ঘটল। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ আর একটা স্ট্রোক। মায়োকার্ডিয়াক অ্যাটাক। আজীবন কংগ্রেসী,—সৎ, নির্লোভ এবং প্রায় সর্বত্যাগী ব্রজবিলাস সরকারকে মৃত্যু এবার ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

॥ উনিশ ॥

শ্রাদ্ধশান্তি চুকবার পর দীপ্তেন্দু একদিন অফিসে টেলিফোন পেল। অপারেটার বলল,—'সেই ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

রিসিভার তুলতেই অন্যপ্রান্ত থেকে অগ্নিবীণার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। বলল,—'সামনের রবিবার সকালে কি একবার আসতে পারবেন দীপ্তেন্দুদা? অনেক কথা ছিল, এই কদিন তো নানা ঝামেলায় কাটল। কথা বলার কোনো সুযোগ হয় নি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'জানি। আর আমারও তো অনেক কথা বলার ছিল বুলু। সে সব কথা বলতে সময় পেলাম কই?'

অগ্নিবীণা কেমন অদ্ভুত হাসল। বলল,—'আসুন তাহলে। তার আরো একটা কারণ সোমবার সন্ধ্যের দার্জিলিং মেল ধরে আমি রওনা হবো ভেবেছি। হাতে কিন্তু আর সময় নেই।'

রবিবার সকালে সে ডাফ স্ট্রীটে পৌঁছতেই অগ্নিবীণা বলল,—'চা আর জলখাবার খেয়ে নিন। আমি এখুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

'তার মানে? তোমাকে কি কোথাও যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, মেডিক্যাল কলেজে একবার দেখা করা দরকার। আপনি কিন্তু সঙ্গে যাবেন।'

দীপ্তেন্দু কিছুই বুঝতে পারছিল না। তার সঙ্গে অনেক কথা আছে বলেই তো বুলু তাকে এখানে আসতে বলেছে। মেডিক্যাল কলেজে গেলে সেসব কথা হবে কেমন করে?'

মিনিট দশ বাদেই অগ্নিবীণা জামাকাপড় পাল্টে তৈরি হয়ে এলো। অপাঙ্গে দীপ্তেন্দু তাকিয়ে দেখল ওর সেই এক বেশ। ফিতে পাড় সাদা শাড়ি পরনে। সাদা ব্লাউজ গায়ে। নিরাভরণ দুই হাত। শুকনো সিঁথি। পায়ে চটি।

দীপ্তেন্দুর খাওয়া শেষ হয়েছিল। অগ্নিবীণা সামনে এসে দাঁড়াতেই দুজনে বেরিয়ে পড়ল। হাতিবাগানের দিক থেকে একটা ট্যাক্সি আসছিল। হাত বাড়িয়ে অগ্নিবীণা সেটাকে থামাল। দুজনে গাড়িতে উঠে বসতেই সে চালককে নির্দেশ দিল বৌবাজার।

দীপ্তেন্দু খুব অবাক হয়ে শুধোল,—'বৌবাজার কেন? তুমি তো মেডিক্যাল কলেজে যাবে বলছিলে।'

অগ্নিবীণা কোনো জবাব দিল না।

গাড়ি বৌবাজারে এসে দাঁড়াতেই সে বলল,—'মেডিক্যাল কলেজ তো একটা বাহানা। নইলে সাতসকালে আপনার সঙ্গে বেরুতাম কেমন করে? বামুনদিদি কাজের মেয়েটা কি ভাবত?'

সেই পুরাতন ইন্দো-বার্মা রেস্টুরেন্টের এক কোণে দুজনে একটা টেবিলে মুখোমুখি বসল।

দীপ্তেন্দু প্রথমেই বলল,—'এখন তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত বুলু। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আর তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

অগ্নিবীণা ঈষৎ হাসল। বলল,—'অ্যাকসিডেন্টে সৌম্যকান্তি মারা যাবার পর আমিও প্রথমে সে কথা ভেবেছিলাম। কলকাতায় ফিরে দাদুকে আমাদের বিয়ের কথা বলব। কিন্তু—' অগ্নিবীণা একটা ঢোক গিলল।

'কিন্তু কিসের বুলু? এখন তো আর কোনো সমস্যাই নেই। মিছিমিছি আর দেরি করবার প্রয়োজন কি? তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ হঠাৎ একটা ঝামেলায় পড়ে বিনা দোষে আমার সাজা না হলে এ বিয়ে তো কবেই হতে পারত।'

অগ্নিবীণা নীরবে শুনছিল। একটি কথারও জবাব দেয় নি।

দীপ্তেন্দু আবার বলল,—'কতদিন ধরে আমি শুধু এই দিনটির অপেক্ষায় আছি বুলু।'

অগ্নিবীণা বলল,—'সব কথা খুলে জানাব বলেই আপনাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছি দীপ্তেন্দুদা। বাড়িতে বসে এসব কথা বলা যায় না।' এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করে অগ্নিবীণা শুরু করল,—'তাহলে শুনুন, আমি জলপাইগুড়ি ফিরে যাবার পর সৌম্যকান্তি মাঝে মাঝেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। তার একটাই কথা। অন্তত আর একবার পুরানো ঘটনা ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করি। তাই জলপাইগুড়ির শ্বশুরবাড়িতে ফেরার জন্য সে বারবার অনুরোধ করেছিল। তার প্রস্তাবে রাজী না হলেও সে ক্ষান্ত হয় নি। নাছোড়বান্দা মানুষটা একদিন সন্ধ্যেয় হঠাৎ এসে বলল,—অন্তত সাতটা দিন জলপাইগুড়ির বাড়িতে গিয়ে তার স্বভাব-চরিত্র, সুরায় আসক্তি, এসব সম্পূর্ণ বদলে গেছে কিনা তা যাচাই করে নিতে। ওর এই কথাটা আমার মনে ধরল। অন্তত ওকে ফের হাতেনাতে অন্য অবস্থায় দেখতে পেলে চিরকাল ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করবার একটা সুযোগ হতে পারে। জলপাইগুড়ির উকিলবাবুও বলেছিলেন দ্বিতীয়বার যদি এরকম একটা অবস্থা আপনার চোখে পড়ে তাহলে আপনি নিজেও দুশ্চরিত্র স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা আনতে পারবেন। সেই আশায় ভর করে আমি সাতদিনের জন্য শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গেলাম।'

বাধা দিয়ে দীপ্তেন্দু বলল,—'সে কথা আমি শুনেছি। মাত্র সাতদিনের জন্য তুমি কেন শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গেলে তা বুঝে উঠতে পারিনি।'

বেয়ারা ইতিমধ্যে চা আর টোস্ট টেবিলে রেখে গিয়েছিল। পেয়ালায় চুমুক

দিয়ে অগ্নিবীণা বলল,—'ওর বাড়িতে গিয়ে কিন্তু আমার সন্দেহের কোনো প্রমাণ পেলাম না। দেরাজের মধ্যে যেখানে ওর দামী মদের বোতল থাকত, সেখানে মদ দূরে থাক একটা ওয়াইন গ্লাসও নেই। কাজের যে মেয়েরা রয়েছে তাদের মধ্যে একজনও কমবয়সী যুবতীর সাক্ষাৎ পেলাম না। ভাবলাম এসব বোধহয় পরিকল্পিত। আমি আসব বলেই এভাবে সব কিছু সাজানো হয়েছে।'

অগ্নিবীণা ফের শুরু করল,—'সাতদিন শেষ হবার ঠিক আগের রাত্তিরে সৌম্যকান্তি আমার কাছে এলো। এই কটা দিন দুজনে আলাদা ঘরে থেকেছি। আমার সঙ্গে সেরকমই কথা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন রাত্তিরে কাছে এসে সৌম্যকান্তি বলল— আমার একটি কথাও কি এখনও তোমার বিশ্বাস হয় নি? কোনো জবাব দিতে না পেরে শুধু ওর মুখের দিকে আমি মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি। আর কোনো কথা না বলে আমার হাত দুটো সে চেপে ধরল। অনুনয় করে বলল,—আমাকে অন্তত একটিবার ক্ষমা করতে পারবে না তুমি? তখন আমার মনের কী অবস্থা তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। পা দুটো কাঁপছিল। মনে হ'ল একটা মানুষ ভিখারির মতো আমার দুটি হাত ধরে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। দিনের সঙ্গে রাতের একটা মস্ত ফারাক দীপ্তেন্দুদা। রাতে যা ঘটে দিনে তা কল্পনাও করা যায় না। সৌম্যকান্তি এবার হাত দুটো ছেড়ে আমাকে ওর বুকের মধ্যে টেনে নিল। ওর স্পর্শে আমার শরীরে যেন আগুন জ্বলছিল। মেয়েদের কাছে পুরুষ আসে বন্যার মতো। তার আদরে-সোহাগে মেয়েরা নিজেকে হারিয়ে ফেলে। প্রতিরোধের কোনো ক্ষমতাই থাকে না। ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওর কামনার জোয়ারে আমি ভেসে গেলাম। শ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষটা যখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন আমি প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় অশক্ত দেহে বিছানায় পড়ে আছি।'

দীপ্তেন্দু কোনো মন্তব্য করবার আগেই অগ্নিবীণা বলল,—'পরদিন সকালেই আমি হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে ফিরে গেলাম। দু'দিন বাদেই সৌম্যকান্তি আবার এসেছিল। আমাকে পাকাপাকিভাবে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ জানাতে। কিন্তু সেই যে বলেছিলাম রাতে যা ঘটে দিনের আলোয় তার কোনো চিহ্ন থাকে না। উল্টে সেই রাত্তিরের আচরণের জন্য আমার মনে একটা ঘৃণা, বিরক্তির সৃষ্টি হ'ল। তাই ওকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম ওর প্রস্তাবে আমি রাজী নই। কোনোদিন রাজী হবো না। সমস্ত ঘটনাটা যে সাজানো, সুপরিকল্পিত নয় তাই বা বিশ্বাস করব কেমন করে? চোখের সামনে যা দেখেছি পাকাপাকি শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গেলে তার উল্টোটা যে আর ঘটবে না, তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? সৌম্যকান্তি যে মদ ছেড়েছে, অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত হবে না ওটাই কি তার একমাত্র প্রমাণ?'

দীপ্তেন্দু শুধোল,—'তোমার সঙ্গে সৌম্যকান্তিবাবুর আর দেখা হয় নি?'

'হ্যাঁ। আর একবার হয়েছিল এবং সেটাই শেষ দেখা। দুর্ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যের পর সে আবার এসেছিল। দু-চার কথার পর বলল,—'তাহলে জলপাইগুড়ির শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর কাছে গিয়ে থাকতে তুমি রাজী আছ তো?'

'নাহ্।' আমি স্পষ্ট জবাব দিলাম। বললাম,—'তোমাকে এখনও ঠিক আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার স্বভাব-চরিত্র, মদে আসক্তি সব যে পাল্টে গেছে আমার তা মনে হয় না। আর মাত্র সাতদিনে একটা মানুষকে কতটুকু চেনা যায়? তার চেয়ে বরং তুমি আদালতে ডিভোর্সের আর্জি কর। ডিক্রি পেলে স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারবে।'

অগ্নিবীণা বলল,— 'শুনে সে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, বুঝতে পারছি কোনোদিনই আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। তারপর পিছন ফিরে আগের মতো মাথা নীচু করে চলে গেল।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'আমি বুঝতে পারছি না সৌম্যকান্তিবাবু কেন তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য এত জিদ করছিলেন।'

'তার উত্তর আমার জানা নেই। তবে আমার ধারণা সেই বৃষ্টিভেজা রাত্তিরের ঘটনার পর আমি যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসব সৌম্যকান্তি সেটা ভাবতে পারেনি। তারপর থেকে লোকটা হয়তো আমাকে স্ত্রীর মতো ভালবাসতে শুরু করেছিল। আসলে প্রথমে দত্তবাড়ির অন্য বউদের মতো আমাকেও সে একটা ভোগের সামগ্রী মনে করত। পরে আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবার জন্যই শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে নিতে সাধাসাধি শুরু করেছিল।'

একমুহূর্ত থেমে অগ্নিবীণা আবার বলল,—'সেদিন গ্যাংটক যাবার পথে ওর এই দুর্ঘটনা শোনার পর আমার কী মনে হ'ল জানেন?'

'কি?' দীপ্তেন্দু জিজ্ঞাসু হ'ল।

'আমার মনে হয়েছিল স্ত্রীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সৌম্যকান্তি পাহাড়ী পথে ইচ্ছে করেই গাড়িটাকে খাদে ফেলে দিয়ে সুইসাইড করেছে। নইলে অন্য গাড়িকে সাইড্ দিতে ওর মতো পাকা ড্রাইভার রাস্তার কিনারে যাবার মতো ভুল করবে এমন কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় নি। আরো একটা কথা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কিন্তু ওর পেটে এক ফোঁটা অ্যালকোহল পাওয়া গেছে এমন কথা লেখেনি।'

দীপ্তেন্দু বলল,—'কিন্তু এরজন্য তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে বাধা কোথায় বুলু?'

অগ্নিবীণা কেমন রহস্য করে তাকাল। বলল,—'একটা মস্ত বাধা যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দীপ্তেন্দুদা।'

'কি বাধা?' দীপ্তেন্দু চঞ্চল হয়ে শুধোল।

অগ্নিবীণা বলল,—'সেই রাত্তিরে ওর সঙ্গে সংসর্গের ফলে সৌম্যকান্তির সন্তান আমার পেটে এসেছে।'

'কী বলছ তুমি?' দীপ্তেন্দু ভুরু তুলে শুধোল। 'তোমার কোনো ভুল হয় নি তো?'

'নাহ্'। অগ্নিবীণা মাথা নাড়ল। বলল—'আমি একটা গাইনির ডাক্তার দীপ্তেন্দুদা। এসব সামান্য ব্যাপারে ভুল হওয়ার কথা নয়।'

'তাহলে?' দীপ্তেন্দু কী একটা কথা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

অগ্নিবীণা বলল,—'এখন অন্য কোনো উপায় নেই। আমি ডাক্তার। প্রাণরক্ষা করতে জানি, কিন্তু প্রাণ নিতে শিখিনি। তাই এখন আমার একমাত্র কর্তব্য সৌম্যকান্তির সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করা, তাকে মানুষ করে তোলা। তবে তার প্রপিতামহ রজতকান্তি, পিতামহ কনককান্তি, কিংবা তার পিতা সৌম্যকান্তির মতো তাকে লম্পট, পানাসক্ত হতে দেব না। তাকে আমি গড়ে তুলব আপনার মতো একজন মানুষ করে। যদি ছেলে হয় তাহলে ওর কি নাম রাখব জানেন? নাম রাখব দীপ্তিময় আর মেয়ে হলে নাম থাকবে দীপ্তিময়ী।'

দীপ্তেন্দুর নিজেকে খুব অবসন্ন লাগছিল।

অগ্নিবীণা বলল,—'এই মুহূর্তে এ ছাড়া আমার আর কি উপায় আছে বলে দিন।'

দীপ্তেন্দু ম্লান হাসল। জানাল, 'যা বলেছ সেটাই তোমার এখন কর্তব্য বুলু। চল এবার। অনেকক্ষণ রেস্তোরাঁর চেয়ার-টেবিল দখল করে আমরা বসে আছি।'

উঠে দাঁড়াল অগ্নিবীণা। বলল,—'আর একটা কথা। কাল হাওড়া স্টেশনে দার্জিলিং মেলে আমাকে তুলে দিয়ে যাবেন। আমি কোনো আপত্তি শুনব না।'

'বেশ তো। এতে আপত্তি কেন? এর আগেও তো কতবার তোমাকে স্টেশনে সী-অফ করে এসেছি।'

সোমবার বিকেলে দীপ্তেন্দু ট্যাক্সি নিয়ে ডাফ স্ট্রীটে হাজির। তখনও অবশ্য সময় ছিল। তবু অগ্নিবীণার প্রস্তুত হতে দেরি হ'ল না।

অবিনাশ বললেন,—'বাবা নেই। তুমিই বা আর কার সঙ্গে এ বাড়িতে দেখা করতে আসবে?'

দীপ্তেন্দু হেসে বলল,—'আমিও বোধহয় কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি অবিনাশ কাকা।'

'কলকাতা ছেড়ে মানে কোথায়?'

'দিল্লীতে আমি একটা বড় কাগজে চাকরি পেয়েছি। তাছাড়া আমাদের বঙ্গভূমি কাগজের অবস্থা ভালো নয়। এপ্রিল মাসে হাতবদল হতে পারে কিংবা কাগজটাই উঠে যাবে।'

'তাই নাকি?' অগ্নিবীণা তার মুখের দিকে তাকাল। বলল,—'দিল্লী চলে যাবেন

সে কথা তো আগে জানান নি।'

'কেমন করে জানাব? রতিকান্ত বসু মানে আমাদের সম্পাদক আজই খবর দিলেন। কবে নাগাদ আমাকে ছাড়া যাবে দিল্লী থেকে সে কথা ওরা জানতে চেয়েছে।'

'বাঃ!' অবিনাশ প্রশংসা করে বললেন,—'একেবারে খোদ রাজধানীতে যাচ্ছ। তোমার ভবিষ্যত উজ্জ্বল দীপ্তেন্দু।'

'কী জানি।' দীপ্তেন্দু সংশয়ের সুরে বলল,—'ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে অবিনাশ কাকা। আমার কিংবা আপনার কিছু করবার নেই।'

দার্জিলিং মেল হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। একটা উইণ্ডো সীটে বসে অগ্নিবীণা শুধোল,—'আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে দীপ্তেন্দুদা?'

'কি করে বলব?' দীপ্তেন্দু কেমন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাল। শেষে বলল,—'মধ্যপ্রদেশ থেকে ফিরে প্রথম যেদিন ডাফ স্ট্রীটে গেলাম সেদিন কি ভেবেছিলাম যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'

অগ্নিবীণা বলল,—'আপনি হয়তো ভেবেছেন সৌম্যকান্তির সন্তানকে নিয়েও তো আমরা একসঙ্গে থাকতে পারতাম। কিন্তু জানেন নিশ্চয়, এক গাছের ছাল আর এক গাছে জোড়া লাগে না। তাছাড়া পৃথিবীতে যে আসছে জলপাইগুড়িতে তার পৈতৃক সম্পত্তি, অর্থ-বিত্ত কম নয়। তাকেই বা তার অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা কি উচিত হবে?' এক মুহূর্ত থেমে অগ্নিবীণা আবার বলল,—'আর একটা কথা, এরপর বিয়ে করে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকলে লোকে সৌম্যকান্তির সন্তানকে আপনার ছেলে বলেও সন্দেহ করতে পারে। সেটা আমার, আপনার এবং ওই ছেলে বা মেয়ের পক্ষে নিদারুণ কলঙ্কের হবে।'

ট্রেন ছাড়ল। চিত্রার্পিতের মতো দীপ্তেন্দু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল প্ল্যাটফর্মে। অপসৃয়মান ট্রেনটা দূরে লাইনের বাঁকে মিলিয়ে যেতেই সে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো। হাঁটতে হাঁটতে হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে অনেকদূর এগিয়ে গেল। তারপর কী মনে হতে বাঁ দিকে ঘুরে গঙ্গার তীরে এসে দাঁড়াল।

ফিনফিনে জ্যোৎস্না। সম্ভবত পূর্ণিমা তিথি। গঙ্গার জলে জ্যোৎস্নার আলো চিকচিক করছে। দীপ্তেন্দু ভাবছিল দার্জিলিং মেল এতক্ষণ বর্ধমান, খানা জংশন ছাড়িয়ে ঝাপটের ঢাল স্টেশনের দিকে ছুটে চলেছে।

মুখ তুলে তাকিয়ে সে চর্তুদিকে লক্ষ করছিল। জীবনের দেবতা যে তার সঙ্গে এমন বিরস পরিহাস করবেন তা কি সে কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল?

দীপ্তেন্দুর মনে হ'ল আকাশের গায়ে হাওড়ার পোলটা যেন পরিহাসপ্রিয় সেই জীবনদেবতার ভ্রূকুটির মতো বাঁকা।

———